আধুনিক ছোটগল্পের তিন শিল্পী ঃ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯১০—১৯৮৩

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, (কলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা পত্র

১৯৯৭

North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur

রত্না জোয়ারদার, এম. এ.

STOCKTAKING-2011

Ref.
80.33
রবী/অর্দ্ধ-

ST - YEAR

120846
3 JUL 1998

ভূমিকা

১৯১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচিত্র ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই সময় কালের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে যা বাঙালীর জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে মানুষের যে মূল্যবোধ ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, উদ্বাস্তুস্রোতের ফলে বাঙালীর সমাজ জীবন নতুন গতিপথে চলতে থাকে। এই সময়ের প্রভাব বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্থায়ী মূল্যবোধের ভাঙন, অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি করে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্পের মোটামুটি সমকালীন তিনশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প গুলিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্বন্ধে কোন গবেষণার খবর আমাদের জানা নেই। কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের 'কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার', রফিক কায়সারের 'কমলপুরান' এবং সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছে। কমলকুমার মজুমদার ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে, পৃথক পৃথকভাবে দুটি গবেষণা সন্দর্ভ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তবে এই তিনজন গল্পকার সম্পর্কে কোন তুলনামূলক আলোচনা এখনো হয়নি। সেই তুলনামূলক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। সেই তুলনাত্মক আলোচনার প্রয়োজনেই বর্তমান গবেষণা পত্র প্রস্তুত করেছি।

এই গবেষণা সন্দর্ভে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক শিল্পীর এক একটা পর্যায়ে কীভাবে রচনার পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সে দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এই তিন শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে কী ধরনের রচনাগত ভিন্নতা রয়েছে সে বিষয়ে খোলামনে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য-ই বা কোথায় রয়েছে সে বিষয়েও বিশ্লেষণ করেছি। আমার দিক থেকে আমি যত্ন সহকারে সাধ্যমত এ কাজটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

আমার এই গবেষণা কর্মের উপদেষ্টা ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অশুকুমার সিকদার মহাশয়। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও যাঁরা আমাকে একাজে তাঁদের অমূল্য সময় ব্যয় করে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন - বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী, কবি সুব্রত রুদ্র, লেখক সমালোচক সরোজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কর্মকর্তা সন্দীপ দত্ত। এঁদের আমি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

যে সব বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছি, সেগুলি হল ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ব্যাঁটরা লাইব্রেরী, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি জেলা লাইব্রেরী, আজাদ্ হিন্দ্ পাঠাগার ইত্যাদি। এইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	:	ক. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	১ - ১০
		খ. অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট	১১ - ১২
		গ. সামাজিক প্রেক্ষাপট	১২ - ২৩
		তথ্যপঞ্জী	২৪
		ঘ. তিন শিল্পীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী গল্পকারেরা	২৫ - ৪২
		তথ্যপঞ্জী	৪৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - জীবন ও গল্প	
		ক. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন	৪৪ - ৫৫
		খ. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নানা পর্ব	৫৬ - ৭৭
		প্রথম পর্ব (১৯৩০ - ১৯৪৮)	
		দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫০ - ১৯৭১)	
		তৃতীয় পর্ব (১৯৭২ - ১৯৮২)	
		তথ্যপঞ্জী -	৭৮ - ৮১
		জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগ্রন্থপঞ্জী ও কিছু রচনার সময়কাল	৮২ - ৮৬
তৃতীয় অধ্যায়	:	কমলকুমার মজুমদারের জীবন ও সাহিত্য	
		ক. কমলকুমারের জীবন	৮৭ - ৯৯
		খ. কমলকুমারের ছোট গল্প	৯৯ - ১২৬
		তথ্যপঞ্জী	১২৭ - ১৩১
		কমলকুমারের রচনাপঞ্জী	১৩২ - ১৪৩

			পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়	:	ক. ভূমিকা	১৪৪
		খ. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন	১৪৪ - ১৫৫
		গ. পূর্ববর্তীদের প্রভাব	১৫৫ - ১৫৯
		ঘ. নরেন্দ্রনাথের গল্পের নানা পর্ব	১৬০ - ১৭৫
		আদিপর্ব (১৩৪৬ - ৫০)	
		দ্বিতীয় পর্যায় (১৩৫১ - ১৩৬০)	
		তৃতীয় পর্যায় (১৩৬১ - ৭০)	
		চতুর্থ পর্যায় (১৩৭০ - ৮২)	
		ঙ. নরেন্দ্রনাথের-রচনা বৈশিষ্ট্য	১৭৫ - ১৭৭
		তথ্যপঞ্জী -	১৭৮ - ১৮০
		নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গ্রন্থপঞ্জী, যে সব	
		পত্র পত্রিকায় পাওয়া গেছে।	১৮১ - ১৯৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	ক. ভূমিকা	১৯৭
		খ. তিন শিল্পীর তুলনা	১৯৭ - ২৩১
		তথ্যপঞ্জী	২৩২ - ২৩৫
পরিশিষ্ট		গ্রন্থপঞ্জি	২৩৬ - ২৪৩
		ক. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ	
		খ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ	
		গ. সহায়ক পত্র-পত্রিকা	

প্রথম অধ্যায়

১৯১০- ৭০ সাল মধ্যবর্তী সময়ে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ॥

যে কোন কালে যে কোন যুদ্ধের অবসানে যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো ধ্বংসাবশেষ, আর কিছু ভগ্নমানুষ। নূতন কোন মূল্যবোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের দীর্ঘদিনের ধরে রাখা মূল্যবোধ, নীতিবোধ গুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পৃথিবীর অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধ দুটি রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্যে প্রবলভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধ দুটির প্রক্রিয়ার মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের চক্র গভীর ভাবে মিশে ছিল। বাঙালী সমাজ থেকে সাহিত্যে এই যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর সে কারণেই প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। আলোচ্য তিন শিল্পী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার, এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই সময় কালেই বর্তমান ছিলেন এবং সাহিত্য রচনা করেছেন। এই জটিল সংকটকালের দ্বারা তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই সময়।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পরাধীন ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল, যদিও তা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার দাবী জানাতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। একদিকে তখন ঔপনিবেশিক সরকারের সক্রিয় বিরোধীদের ওপর নির্যাতন চলছিল, ব্রিটিশ বিরোধী গুপ্ত সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার্য ১৯০৮-১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত আইনগুলির দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত নতুন ভারতীয় সংবাদপত্র আইনের আওতায় ঔপনিবেশিক শাসকরা জাতীয় সংবাদপত্র

গুলিকে নির্যাতন করার ব্যাপক ক্ষমতা পায় এবং দেশে পুলিশী সন্ত্রাসের বন্যা দেখা দেয়। এই শতকের গোড়ার দিকে গুপ্তসমিতি গুলি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কৌশল গ্রহণ করে। বাংলার গুপ্তসমিতির মধ্যে ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' ও কলকাতার 'যুগান্তর পার্টি'-ই প্রধান ছিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের গৃহীত সংবিধানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে সংবিধানিক উপায়ে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন লাভকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ঘোষনা করা হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা গান্ধীর আগমন তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ভারতবর্ষে ফিরে ছিলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই জাতীয় ভিত্তিতে গণ আন্দোলন সংগঠনে গান্ধীর প্রথম প্রধান উদ্যোগ হল 'রাওলাট আইন'-এর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ খ্রীঃ সারা দেশে এক সাধারণ হরতাল আহ্বান করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রীঃ ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জন সাধারণ জালিয়ান-ওয়ালাবাগে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভায় যোগ দেয়। এখানে সেনাপতি ডায়ারের আদেশে নিরস্ত্র মানুষের ওপর ইংরেজ সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। এই বীভৎস হত্যাকান্ড এবং সরকারের দমননীতি সমগ্র ভারতে বিস্ফোরণ ঘটায়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসহযোগিতার ক্ষেত্রে দুটি অপরিহার্য অহিংস পর্যায়ের কথা গান্ধী ভেবে ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ সরকারের প্রতি বর্জননীতি গ্রহন অর্থাৎ বর্জিত হবে সম্মানসূচক নিয়োগ ও উপাধি, সরকারী সম্বর্ধনা ইত্যাদি। ব্রিটিশ স্কুল কলেজ আদালত - আইনসভার নির্বাচন, আমদানি পণ্য বর্জন, এবং আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হবে সরকারী করদান বন্ধ। ১৯২০ খ্রীঃ ১ আগষ্ট আন্দোলন শুরুর দিন ধার্য হয়েছিল। একই দিনে খিলাফত আন্দোলনও সূচিত হয়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় ভারতীয় মুসলমান সহ সকল সুন্নি মুসলমানের অন্যতম খলিফা, তুরস্কের সুলতানের অধিকার রক্ষার জন্য

মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্যোগে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনটি ভারতের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানের কাছে আন্দোলনের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে এর ঔপনিবেশিক চরিত্রই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সমান্তরাল বিকাশের ফলে ভারতের দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় - হিন্দু ও মুসলমানের জন্য যুক্তি সংগ্রামে সহযোগিতা ও যৌথ কার্য পরিচালনার অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিলো। সমাবেশ, বিক্ষোভ ও নানা ধরনের হরতালের আকারে অসহযোগ আন্দোলনটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণীভিত্তিক কার্যকলাপের পরিসরও ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধর্মঘট আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গড় পড়তা ৪ থেকে ৬ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। এর মাধ্যমে শ্রমিকের শ্রেণী ঐক্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তারা ক্রমাগত অধিক পরিমানে সংহতি মূলক ধর্মঘটে শরিক হচ্ছিল। ১৯২১ খ্রী: আসামে চা-বাগিচাগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দেয়। ধর্মঘট, আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম থেকেই দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের একটি নবপর্যায় শুরু হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের পর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সুদৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৭ সালে বাংলার পাট শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে শ্রমিক আন্দোলন জঙ্গী চরিত্র ধারণ করে। এবং ২৯শে জুলাই ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আর একটি গণ সমাবেশ দেখা দেয় তা হল কৃষক আন্দোলন। ১৯২১-২২ খ্রীঃ ব্যাপকতম কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ ফৈজাবাদ ও রায়বেরিলীতে এই আন্দোলন দেখা দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থানীয় চরিত্র, বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অনুপস্থিতি ইত্যাদি দুর্বলতা সত্ত্বেও যুক্ত প্রদেশের কৃষক আন্দোলন অবশ্যই জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। বাংলার তেভাগা আন্দোলন ছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষনের বিরুদ্ধে বর্গাদারদের সংগ্রাম। ১৯৪৬ খ্রীঃ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সভাগুলি উত্তরবঙ্গে, যশোহর, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুরে তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলন এক সর্বাত্মক কৃষক বিদ্রোহের সময় কিষাণ সভার আকারে কৃষক সংগঠনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়। তরুণ জহরলাল নেহেরু কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহনের জন্যই প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার পর বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সবচেয়ে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটল চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মাধ্যমে। অন্যদিকে ১৯৩০ সালে ৮ই নভেম্বর বিনয়, বাদল, দীনেশ কলকাতার মহাকরণে এক দুঃসাহসিক অভিযানে কারা বিভাগের প্রধান সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করে। এই সময় বাংলার নারীরা রাজনীতিতে অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহন করে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার যে বৈপ্লবিক চেতনা তা পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলন ও অগাষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং জাতীয় সংগ্রামকে গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হয়। স্বরাজ লাভের সংগ্রামের সম্ভাব্য ধরণ বদল ও গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীন মতানৈক্যের ফলে পার্টির মধ্যে দুটি প্রধান দল সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রথমটিতে ছিল তথাকথিত সাবেকী দল গান্ধীপন্থীরা। জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় উপদলটি ছিল তথা-কথিত 'পরিবর্তনপন্থী'। এতে ছিলেন মতিলাল নেহেরু, বাংলার চিত্তরঞ্জন দাস। দলের মধ্যে নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের ফলজাত ব্যাপক অসন্তোষ থেকেই কংগ্রেসে বামপন্থী

উপদলের উদ্ভব ঘটে। এই দলের নেতা ছিলেন জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র যুব সংগঠনে, সর্বোপরি ছাত্র সংগঠনেও কংগ্রেসে নিজের প্রভাব মজবুত করেন। ১৯৩৭ সালের পর কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র বসুর পুনর্নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীন অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। তি জাতীয় সংগ্রামকে গতিশীল ও সংগ্রামমুখী করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং অবিলম্বে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার দাবী রাখেন। তাঁর কর্মসূচী গান্ধী এবং তার গোষ্ঠীর মনঃপুত না হবার জন্য, শুধুমাত্র তাদের অনুগত সভাপতি রূপে তিনি কাজ করতে রাজী হলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিতে কংগ্রেসকে একটি সংগ্রামমুখী সংগঠনে পরিণত করা প্রয়োজন। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সহায়তায় ভারতের মুক্তি- সাধন করতে চেয়েছিলেন।

বোম্বাইয়ে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট ভারতছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই ব্রিটিশ সরকারী প্রশাসন দমননীতি অনুসরণে অগ্রসর হল। নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। এর ফলে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং ভারতের সর্বত্র ভারত ছাড়ো বা আগষ্ট আন্দোলনের সূচনা হল। প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলন ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। কলকাতায় ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং ট্রামের তার কেটে ও রাস্তা অবরোধ সৃষ্টি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে তোলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই আন্দোলনের চরম ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখা যায়। এই পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক কাঁথি-মহকুমায় গণবিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল, কিন্তু বাংলার সব অঞ্চলেই এই আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল, এবং সর্বত্রই সাধারণ কৃষক, নিম্ন-বর্গের মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় আন্দোলন সর্বাপেক্ষা জঙ্গী

আকার ধারন করেছিল। ঢাকায় আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হল শিল্প শ্রমিকের আন্দোলনমুখী ভূমিকা। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বীরভূম, দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল ও উপজাতিদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। উত্তর বাংলায় বালুরঘাট মহকুমায় সাঁওতাল ও রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ পুলিশের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই আগষ্ট আন্দোলন চলাকালীন দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সরকারী দমন নীতির ফলে এই আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে গণ আন্দোলনের ব্যাপ্তি হ্রাস পায় এবং বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হবার পর ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কমিউনিষ্টদের প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির কার্যকলাপ শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের শক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করেছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত পার্টি সম্মেলনে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এবং কমিউনিষ্ট পার্টি দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। এই সময় ভারতের বিভিন্ন সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিষ্টরা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কিন্তু বামপন্থী রাজনীতি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মূল পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। কারণ জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দু ছিল। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম ত্রুটি ছিল দলগুলির আদর্শগত কর্মপন্থা সংক্রান্ত মত বিরোধ। এই মতবিরোধের ফলে বামপন্থী দলগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক মঞ্চ গড়ে তুলতে পারেনি। আগষ্ট আন্দোলনের সময়ও বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থাটি গ্রহণ করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতের বামপন্থী রাজনীতিতে কমিউনিষ্টদের প্রভাব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ, শহরকেন্দ্রিক শ্রমিক আন্দোলন, তেলেঙ্গানার ঐতিহাসিক সশস্ত্র বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এবং ত্রিবাঙ্কুরে প্রজা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অবদান প্রশংসার দাবী রাখে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও কমিউনিস্ট পার্টি গণ আন্দোলনের সংগ্রামী ধারা অব্যাহত রাখে। 'দেশব্যাপী ভাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে পার্টির চোখে মুসলিম লীগের প্রকৃত চেহারা ধরা পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ১৯৪৬ সালে মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভূমিকা সম্পর্কে জনসমক্ষে নিন্দা করা হয়। এই বিবৃতিতে বলা হয় - মুসলিম লীগ এ পর্যন্ত কোন প্রকৃত গণ সংগ্রামে অংশগ্রহন করেনি এবং লীগের সংগ্রাম কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে। 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত ইস্তাহারটির পূর্ণবয়ান নিম্নরূপ -

> শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর মিলিত সংগ্রাম ভাঙিয়া ফেলিতে দিও না - কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান। কলিকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হইতে দূরে থাকিবার জন্য শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন।[১]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়। ১৯৪৯ সালে নেহেরু সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সংঘাত ঘটে, উপলক্ষ্য ছিল সারা ভারত রেল ধর্মঘট। ১৯৫০ সাল জুড়ে সঠিক রাজনীতির সন্ধানে পার্টিতে তীব্র বিতর্ক চলতে থাকে। নৃপেন ব্যানার্জির ভাষায় তখন 'পার্টি র‍্যাঙ্কে-এ হতাশা দেখা দেয় ব্যাপক ও চরম আকারে। তার পাশাপাশি নতুন উপসর্গ দেখা দিল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সিনিসিজম।' অর্থাৎ আস্থার সংকটে কবলিত গোটা পার্টি। ১৯৫১ সালে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহন করার অনুমতি লাভ করে।

১৯৪৫ সালের শেষদিকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠল। ১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবীতে কলকাতায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও গণ-আন্দোলন শুরু হয়। দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঢেউ - সামরিক বাহিনীর মধ্যেও প্রসারিত হল যা নৌ-বিদ্রোহের আকার নিল। নৌ-বিদ্রোহ শুধু-মাত্র ধর্মঘটী নাবিক ও নৌ-কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বেসামরিক কর্মচারী ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য জনগণ এই বিদ্রোহ অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে মুসলীম লীগের নেতা জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উপস্থিত করতে প্রস্তুত হলেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাকিস্তান প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করার প্রস্তাব নেয়। ঐতিহাসিক আর, জি.মুর তাঁর লেখা Escape from Empire গ্রন্থে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে 'Jinnah's Rubican বলেছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন কলকাতায় শোচনীয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে তাকে "The Great Calcutta Killing' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কংগ্রেসের আপোষমুখী মনোভাব জিন্নাকে সকল মুসলিম জনগণের একমাত্র মুখপাত্র রূপে তুলে ধরেছিল, আর সেই কারণে কংগ্রেসের পক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এবং ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠল। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারত ও বিশ্ব রাজনীতির পট পরিবর্তনের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। অবশেষে ভারত স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ সালে। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা লাভ ভারতের দীর্ঘ মুক্তি-সংগ্রামের চরম পরিণতি। কিন্তু ভারতবাসী মুক্তিলাভের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হল। দেশ বিভাগের ফলে সমস্ত পরিবেশ যন্ত্রণা ও বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল, এবং

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশ বিভাগ সত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ ঘৃনা ও বিদ্বেষের প্রাচীর গড়ে তুলেছে।

স্বাধীনতা উত্তর কালে পঞ্চাশের দশকে রাজ্য বিধান সভাগুলিতে জমিদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন ও জমিদারি উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তনের দাবিকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছিল। ১৯৫৫ খ্রীঃ এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে 'গ্রামদান' শুরু হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণীর প্রবল শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত বৈষম্যজাতি সংঘাত, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক, সংগঠনগুলির অধিকতর সক্রিয়তা, স্বতন্ত্র পার্টি গঠন ইত্যাদি ছিল দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দল তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ১৯৬২ খ্রীঃ ভারত-চীন সীমান্তে যুদ্ধ বাধলে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এই সীমান্ত সংঘর্ষ বৃহৎ সামরিক সংঘর্ষে পরিণত হয়। এর পর পরই দেশে সমাজতন্ত্র বিরোধী, কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তিগুলির কার্যকলাপ তুঙ্গে পৌঁছেছিল। এ ছাড়া চীনগণপ্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সংঘাতের সময় চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ফলতঃ ভারত পাকিস্তান চুক্তি, বিশেষতঃ কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে ১৯৬৩ খ্রীঃ শেষ নাগাদ চীন ভারত সংঘর্ষের উত্তেজনা, কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর কমিউনিষ্ট পার্টি পুনরায় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গণ-আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ এই সময়ে কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকায়

সংঘর্ষ বাধে, ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এবং শেষে পাঞ্জাব সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য পর্যায়ে অনেকগুলি কংগ্রেস সংগঠনেই ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কিছু কিছু রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধীদের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে কংগ্রেস সরকারই অনুসৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তি স্থিতিতে বামমুখিনতার লক্ষন দেখা গিয়েছিল। এর মূলে ছিল প্রধানতঃ সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সপক্ষে মেহনতিদের ব্যাপক গণ আন্দোলন।

ভারতে স্বাধীনতার কিছুকাল পরেই দেশের বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং গণ আন্দোলনের চাপে ১৯৫৪ খ্রীঃ রায়ত উচ্ছেদ নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৫৭ - ৫৮ খ্রীঃ জমিদারি উচ্ছেদ আইনের প্রয়োগের ফলে জমিদার রায়তের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রন হয়েছিল এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পুঁজিতান্ত্রিক সমবায় গঠিত হওয়ায় গ্রাম সমাজের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। এই আন্দোলনকে সফল করার মূলে ছিল প্রধানত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতের গণ-আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হিসাবে বিবেচ্য। পঞ্চাশের দশকে ধর্মঘটগুলি দেশব্যাপী পরিসর লাভ করেছিল। যেমন কলকাতায় ট্রাম-শ্রমিক ধর্মঘট, স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট, ১৯৬০ খ্রীঃ বস্ত্রকল, নারকেল শিল্প কারখানায় ধর্মঘট, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির বাবু-কর্মী ও মেহেনতীরা পাঁচদিনের ধর্মঘট পালন করে। এর পরবর্তী সত্তরের দশকে শুরু হয়েছিল নকশাল আন্দোলন। তবে এ আন্দোলনের প্রভাব আলোচ্য তিন গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্রনন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে সে ভাবে দেখা যায় না।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে এক সূত্রে বেঁধে ফেলা হয় এবং ঔপনিবেশিক শোষনের একটি প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়, এবং দেশের অর্থনীতিতে ক্রমিক অনগ্রসরতার চিত্র সুস্পষ্ট হতে থাকে। দেশের কৃষি অর্থনীতির আর একটি অশুভ নেতিবাচক দিক হল মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব ও শোষণ। ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষকগণ জমির ওপর স্বত্ব হারাতে লাগলো, এবং কৃষকেরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হল। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতির ফলে ত্রিশের দশকে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে সঙকট নেমে এলো। ঋণাভাবে জর্জরিত কৃষকগণ জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৪৩ সালের বাংলার মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষে। খাদ্যের অভাবে যে সকল বুভুক্ষু মানুষ কলকাতায় চলে আসে তাদের মধ্যে শতকরা ৪৭ ভাগ ছিল ভূমিহীন কৃষক। বাংলার কৃষক শ্রেণীর শতকরা ৭৫ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র চাষী, তারাই অধিকাংশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ছিল। ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মেদিনীপুরে তেভাগা আন্দোলন, শুরু হয় এবং উত্তর বঙ্গে এই আন্দোলন এক সর্বাত্মক রূপ নেয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে বাংলায় সর্বাত্ম কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের ভারী শিল্পের অগ্রগতি ছিল অভাবনীয়। তুলনামূলকভাবে সূতীবস্ত্র ও পাট শিল্পে অগ্রগতি তত্টা সন্তোষজনক ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা শোচণীয় হয়ে ওঠে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজুরি বৃদ্ধি না হওয়ায় তারা ক্রমশ ঋনভারে জর্জরিত হয়ে উঠতে লাগলো। পঞ্চাশের দশকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য জমিদারদের অধিকাংশ জমিই হস্তান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু ওই জমিতে চাষবাসরত কৃষকদের অবস্থার প্রায় কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেশের পুরো অর্থনীতি বড় ধরনের অসুবিধার

সম্মুখিন হয়েছিল। খাদ্যাভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমান কর, মূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে মেহনতিদের জীবন যাত্রার মান যথেষ্ট নেমে গিয়েছিল। ১৯৭১-এ ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের ফলে উদ্বাস্তুর আশ্রয় ও খাদ্য সংস্থান ভারতের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছিল।

সামাজিক প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার গ্রামগুলি ছিল জমিদারী প্রথার সামন্ততান্ত্রিক গঠনকে ভিত্তি করে। হিন্দু জাতিভিত্তিক কাঠামোতে সম্মান পেতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। সমাজে ধনী ব্যক্তি সম্মান পেতো অর্থের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলা দেশে কলকাতাকে কেন্দ্র করে গ্রামীন মানুষের নগর মানসিকতা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়কার প্রায় লেখকের লেখাতেই অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে গ্রাম জীবন থেকে নগরজীবনে চলে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ সরকারী চাকুরীকেই অবলম্বন করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত চাকুরীজীবী বাঙালীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করে। কারণ চাকুরীই ছিল তাদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র উপায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবের সময় সমস্ত প্রকার বাধাকে অতিক্রম করে, সামাজিক জড়তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচীতে ব্যাপক ভাবে নারী সমাজের অংশ গ্রহণ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । ১৯২১ সালে এক প্রবন্ধ লিখে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে মহিলাদের অংশ নিতে আহ্বান জানান । অন্য দিকে বিভিন্ন

বিপ্লবী গোষ্ঠীর কাজে বাংলার মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গুনগত পরিবর্তন ঘটায় ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'উইমেনস্ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'[৩] এবং এক দশক পরে গঠিত 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স' নারী সমাজের বিভিন্ন দাবী দাওয়া এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা পালন করতে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখায়, মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি তোলা হয়। অনেক আন্দোলনের পর ১৯২১ সালে নারীদের ভোটাধিকার দিতে আইন পাশ হয়। দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার বুকে সার্থক করে তুলতে 'লেডিস পিকেটিং বোর্ড'[৪] নামে সংস্থা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচার, কুটির শিল্প ইত্যাদি এই সমিতি চালনা করে। এই সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারা নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা গড়ে তোলে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তার কু-সংস্কার বিরোধী প্রচার প্রভৃতিও চলতে থাকে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বাংলার নারীরা এই দুঃসাহশিক কাজে যে ভাবে অংশ নিয়েছে, তা আজকের নারীদের কাছেও বিস্ময় জাগায়। ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনেও নারীরা দৃপ্ত বলিষ্ঠতা নিয়ে এগিয়ে আসে। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে কলকাতায় এবং বোম্বাই-এ এক বিশাল মহিলা শোভাযাত্রা বের হয়। বাংলার তেভাগা আন্দোলনেও নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২-এ আন্দোলনে বাংলার মেদিনীপুরের মহিলাদের বীরত্ব ছিল অসাধারণ। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে জনজীবনের অর্ধাংশ নারী সমাজ একের পর এক আইনগত অধিকার অর্জন করেছে কিন্তু এই আইনী অধিকার তাদের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করতে পারে নি।

সংবিধানের ১৫ ধারা অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমান। রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে ৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই স্ত্রী পুরুষ সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত। এছাড়া নারী আন্দোলনের দাবিগুলিকে স্বীকৃতি

দিয়েই হিন্দু বিবাহ আইনের মাধ্যমে এক বিবাহ প্রথা চালু করা হয় ১৯৫৫ সালে। এরই সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের সম অধিকার আইনে মেনে নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। একই সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে দত্তক নেবার অধিকার এবং নাবালক সন্তানদের অভিভাবকত্বের দাবি ও স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৬ সালে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ খোরপোষ ইত্যাদি বিষয়গুলি সংশোধন করা হয়, যা মেয়েদের পক্ষে সুযোগ প্রসারিত করেছে।

নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ সালে নারী শিক্ষার জন্য ন্যাশনাল কমিটি দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে গঠন করে। তার সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চার দশকে নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশের উপর। তবে তুলনামূলকভাবে ২৫-এর উর্ধ্বে নারীরাই নিরক্ষরতার সিংহভাগ জুড়ে আছে। কর্মসংস্থান বা জীবিকার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে উৎপাদনের কাজে যুক্ত হন দারিদ্র সীমার নিচে বাস করা নারীরা। অপেক্ষাকৃত সুচ্ছল পরিবারের নারীদের এখনও উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার রেওয়াজ আমাদের সমাজে হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাঙালী সমাজে মেয়েরা গুরুত্ব পেতে লাগল। অন্যদিকে বিভিন্ন পরিবারে পরিস্থিতির চাপে মেয়েদের চাকরী গ্রহণ অথবা অন্য কোন ভাবে অর্থ উপার্জন করা, - এই ঘটনা বৃদ্ধি পেতে লাগল। গৃহকর্তাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজে এই ঘটনা চরম আঘাত হানলো, যা বাংলা সমাজ জীবনে একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। পঞ্চাশের দশকে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন -

এখন তোমরা শুনি জঙ্গী / কেবল গৃহিনী নয়/
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা / আমাদের
পাশাপাশি, সহকর্মী / কিংবা বলো প্রতিযোগী।

- সংগঠিত ক্ষেত্রে সার্বিক সংখ্যার মাত্র ১৩ ভাগ হচ্ছে নারী কর্মচারী। প্রকৃত পক্ষে মজুরিভিত্তিক কাজে শ্রমে অংশ গ্রহনে সংখ্যা দাঁড়ায় পুরুষ ৬৪ শতাংশ এবং নারী ৭৫ শতাংশ। জমি ভিত্তিক নিরাপত্তার অভাব এবং চাকুরীর দ্বারা অর্জিত অর্থে ক্রম-বর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাল দেওয়া কঠিন হয়েছিল। মূলতঃ এই সংকটের মুখে পড়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালী মেয়েরা অন্তঃপুর থেকে বাইরের জগতে চাকুরীর সন্ধানে বেড়িয়ে পরে। এছাড়া লক্ষ্যণীয় বিষয় হল নারীদের নিজস্ব মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করা নিয়ে পরিবার গুলোতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের খরচ সংগ্রহ করতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসক দল ভারতবর্ষের খাদ্য-বস্ত্র অর্থসম্বল যেটুকু ছিল তার ওপরেও রাহাজানি শুরু করে। ফলে একদিকে সাধারণ মানুষের অভাবের সংসারে অনটন শ্বাসরোধকর আকার ধারণ করল, আর এক দল তথাকথিত ধনী শ্রেণী আগ্রাসী শাসক দলের সহযোগিতায় জাতব শোষকবৃত্তি গ্রহণ করে লুণ্ঠন মদমত্ত হয়ে উঠল। অন্নবস্ত্র তথা সব রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোলের দুর্নৈতিক নারকীয়তায় ছেয়ে গেল গোটা দেশ এবং সমাজ। পঞ্চাশের মন্বন্তর তথা ১৯৪৩-এর মানুষের তৈরি বাংলা জোড়া ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তারই পরিণতি - লাখ লাখ মানুষ - যেখানে অসহায় জন্তুর মতো মৃত্যু বরণে বাধ্য হয়েছে, অনাহার অপুষ্টিতে। অগণন প্রান সংহারক পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কারণ কোন ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। এর প্রধানতম কারণ, ঘটনার পটভূমি তৈরির একমাত্র ক্রিয়াশীল নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটিশ সরকার এবং স্বদেশের সুযোগ সন্ধানী ব্যবসাদার দালাল শ্রেণীর মিলিত উদ্যম। বাংলার সার্বিক জীবন যাপনে সেদিনের ক্ষতচিহ্ন আজও আমরা বয়ে চলেছি প্রতিক্ষণে, আমাদের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি এবং ব্যক্তিক জীবন যাপনের প্রাত্যহিকতায়।

North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur

120846
- 3 JUL 1998

'একান্নর হিসাব' শীর্ষক রচনায় গোপাল হালদার বিশ্লেষণ করেছিলেন তৎকালীন প্রেক্ষিত যা সেই সময়কে জানতে খুবই জরুরি। তিনি বলেছেন -

> ১৩৫০-এ মন্বন্তর গিয়েছিল, ১৩৫১-তে মহামারী এল, ১৩৫০-এ চাল ও খাদ্য-দ্রব্যই বেশি করে চোরা বাজারে গিয়েছিল, ১৩৫১ তে সমস্ত দ্রব্যই চোরাবাজারে গিয়েছে। চোরা বাজারই এখন সদর বাজার হয়েছে ...[৫]

তিনি আরও জানিয়েছেন, সময় প্রেক্ষিতের অনুভব, অভিজ্ঞতার কথা -

> এছাড়াও দেখছি - তাঁতী ও জেলেরা সুতা পায়না, কামারেরা লোহা পায়না, কুমারেরা মাটি পর্যন্ত পায়না - বাঙলার গ্রাম্যজীবন ১৩৫০-এর পর ১৩৫১ তে প্রতিষ্ঠিত হবার মত কোন অবলম্বনই পায়নি।[৬]

'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও নানাবর্তীর অপ্রকাশিত দলিল' শিরোনাম রচনায় লেখক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত যে বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন সেই উপাদান সূত্র থেকে সামান্য উদাহরণ তুলে দেওয়া হল। বাংলা সরকারের স্পেশাল অফিসার এল.জি.পিনেল এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় 'সে সময় সমস্যাটা ছিল এই ধরণের হয় কলকাতা এবং কলকাতাকে ঘিরে 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস'-এর জন্য প্রচুর খাদ্য মজুত রাখো, অথবা খাদ্য গ্রামাঞ্চলে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। কলকাতাতে আমরা প্রচুর খাদ্য মজুত করে ছিলাম। স্বভাবতঃই এর অর্থ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য লোকের অনাহারে মৃত্যু। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতেই গ্রাম বাংলায় গরিবরা অনাহারের মুখোমুখি হচ্ছে, চুরি ডাকাতি বাড়ছে। কাম্যুর 'প্লেগ' উপন্যাসে যেভাবে মহামারী শুরু হয় সেভাবেই বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। " ... অধ্যাপক হিল দেখেছেন বটানিকাল গার্ডেনস'-এ চালের বস্তার পাহাড় খোলা আকাশের নিচে জলে ভিজে পচছে। শালকিয়ায় মন্ত্রী বরদাপ্রসন্ন পাইন এর পতিত জমিতে লরি বোঝাই করে ১২ হাজার মন পচা আটা ও চাল ফেলে দেওয়া হয়েছে।" [৭]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের আরো এক মর্মন্তুদ চিত্রও পাওয়া যায় টমাস গ্লানমোর ডেভিসের সাক্ষ্য থেকে। ফ্রেন্ডস্ অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট-এর ভারতীয় শাখার পক্ষ থেকে ডেভিস মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার ত্রাণের কাজে গিয়েছিলেন তদন্ত কমিশনের সামনে তিনি বলেন -

> কাঁথি মহকুমার সাধারণ অবস্থার দিনে দিনে ঘটছে। কাঁথি শহরে তার আশে পাশে বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী রামনগর থেকে খাজুরি পর্যন্ত অনাহার ও রোগের প্রকোপ বাড়ছে। একদিন যারা 'কৃষক' নামে পরিচিত ছিল তাদের বর্তমান পরিচয় 'ভিক্ষুক'। এই ভিক্ষুকেরা সপরিবারে কাঁথি মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই কঙ্কালসার। কাঁথি যাবার আশে পাশে খালগুলিতে পচা, গলা মৃতদেহ ভেসে চলেছে। পথের ধারে কুঁড়ে ঘর - সেখানেও পচছে মৃতদেহ। সৎকারের কোন ব্যবস্থা নেই।[৮]

সরকারি রিলিফ ব্যবস্থার অসঙ্গতির প্রতিও ডেভিস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সাক্ষ্যে -

> খিচুড়ির মধ্যে থাকত অধিক পরিমানে জোয়ার এবং শাক পাতা যা সেই অবস্থায় অনাহার ক্লিষ্ট লোকদের পক্ষে খাওয়াও ছিল বিপদজনক।[৯]

১৯৪৩ সালের ১৭ই মার্চ কমিউনিস্ট মহিলা ফ্রন্টের উদ্যোগে প্রায় ৫০০০ মহিলার এক প্রতিবাদী 'ভুখ-মিছিল' বিধান সভার দিকে হেঁটে গিয়েছিল। ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি পরা হাড়ডিসার মায়ের দল এই মিছিল দিয়ে কশাঘাত করেছিলেন

সভ্যতার বিবেক। - ফসল উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও মূলত যুদ্ধের কারণেই গ্রামের মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির কারণে গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সামর্থের বাইরে চলে যায়। এই সংকটময় অবস্থায় গ্রামের মানুষ গ্রামেই বাঁচার চেষ্টা চালায়, পরবর্তীতে তারা দলে দলে ভিড় জমাতে থাকে শহরে, নগরের পথে পথে। ক্ষুধা আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার আশায়। নিশ্চিত বিশ্বাসে তারা হাত বাড়িয়ে দেয় একটু ফ্যান, প্রাণ ধারনের সামান্য সম্বল প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। যুদ্ধতাড়িত উত্তাল সময়, —এই অবস্থায় নিরন্ন মুমূর্ষুদের বেঁচে থাকার পূর্ণ আশ্বাস নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এই সময় শুধু খাদ্যই নয় 'বস্ত্রসংকট' এমন চরমে উঠেছিল যে ১৯৪৪ সালে ১০ই মার্চ 'বস্ত্র সংকট দিন' [১০] প্রতি পালিত হয়।

যুদ্ধ, মন্বন্তর সেই সময়ে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি প্রাণে গভীর নাড়া দিয়েছিল, আর তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল অসাধারণ সব শিল্পকর্ম। মন্বন্তরের আঘাতে বাংলার সাহিত্য, চিত্রকলা, নাটক, অভিনয় গান - এ সবেতেই ছিল 'নতুন জীবন-চেতনা, ঐক্যের বিস্তৃত সম্ভাবনা।'[১১] এই মন্বন্তরের চরিত্র ও চিত্র পাওয়া যায় গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' 'উনপঞ্চাশ'-এ। মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'র সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের আঘাত জর্জর সময় প্রেক্ষনে সৃজনশীল মানসে বিচিত্রমুখী অনুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায় তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায়, আর বাংলা ছোট গল্পের আখ্যান পটে। ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক বিশিষ্ট দলিল। কবিতার মধ্যে ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্মাফর' ইত্যাদি। এই সব রচনা আজ আর শুধু শিল্প নন্দনের বিচারে নয়, সমাজ সংকটের অন্যতম দলিল হিসেবেও তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যবান।

ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে দুই বাংলারই মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ভয়াল রূপকে। যে হিন্দু মুসলমান পরস্পর ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে তারাই পরস্পর চরম শত্রুতে পরিণত হল। সমাজ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকর হয়েছিল। যার জের আজও আমাদের বহন করতে হচ্ছে। এই সময়কার সাহিত্যে এই সমস্যাটি একটি প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৬ই অগাস্ট কলকাতায় চারদিন ধরে যে নরমেধ যজ্ঞ হয় তাতে ৫ হাজার নর-নারী বৃদ্ধ শিশু নিষ্ঠুর ভাবে নিহত ১৫ হাজারের মত আহত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট এবং নারীর অমর্যাদার বহু ঘটনা ঘটে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের সুধর্মীয়দের এবং মুসলমানদের ও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তকরণ করে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়। বলা বাহুল্য চারদিনের প্রাথমিক মারণ যজ্ঞে হিন্দু ও মুসলমান এক সঙ্গে থাকতে পারেনা এবং সে কারণেই দেশ বিভাগ অপরিহার্য - এই মানসিকতারও বীজ বপন হয়। এই অভূতপূর্ব ভাতৃহত্যার দায়িত্ব সম্বন্ধে কলকাতার স্টেট্‌সম্যান, পত্রিকার সেই সময়কার একটি সম্পাদকীয়র উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে -

> এক মহৎ প্রদেশের রাজধানীতে যে আতঙ্কজনক নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতের ইতিহাসে তা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ...।[১২]

সেই প্রথম দাঙ্গায় ব্যাপকভাবে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিবেশে তা সহজলভ্য ছিল। এই সময় থেকেই সমাজে এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধীর সৃষ্টি হয় যারা সমাজে ভীতির কারণ হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৪৬ খ্রীঃ নরমেধ-যজ্ঞের পর সমাজ নেতা ভদ্রলোক ও অসামাজিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধের মধ্যে একটা গুনগত পরিবর্তন ঘটে গেল। তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠিত করে সমাজের নেতৃত্ব পাবার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে লাগল।

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রাম মৈমনসিংহ, বরিশাল ও পাবনা প্রভৃতি জেলাতে ছোট বড় দাঙ্গা হলেও নোয়াখালি, ত্রিপুরা সন্দীপ এলাকায় যে এক তরফা হিন্দু নিধন ও উৎপীড়ন পর্বের সূত্রপাত হয় তা এর মধ্যে ভীষণতম। এই দাঙ্গায় গৃহত্যাগী হয়ে হাজার হাজার নর নারী পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আশ্রয় নেয়। কলকাতায় এই পর্যায়ে দাঙ্গা শান্ত হয় স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর প্রয়াসে। ১০ই অক্টোবর থেকে পনের দিন একটানা যে দাঙ্গা হয় তাতে ব্যাপক বাস্তু ত্যাগ ঘটে। ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনাবলীতে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী প্রভাবিত হয়েছিল বলে একটি হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব থেকেও শোচনীয় ঘটনা হল বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করা, বহু ব্যক্তিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা এবং সর্বোপরি বহু নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা ও জোর করে দাঙ্গায় সদ্য বিধবা ও তরুণী, বৃদ্ধাকে এক শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া। '... বাঙালীর এই দুঃসময় এবং বিশেষ করে নারী জাতির অসম্মানে বিচলিত মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ক্ষান্তি দিয়ে শ্মশানে শিবের মত নোয়াখালির ও তৎসংলগ্ন পীড়িত অঞ্চলে শান্তি মিশনের সূচনা করেন। '

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় যার সূত্রপাত সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষে গোটা দেশ জর্জর। আর ১৯৪৭ সালের মার্চ থেকে পাঞ্জাবের বুকে শুরু হয় পৈচাশিক হত্যালীলা। এই পটভূমিতে নেমে এলো বাংলার নববর্ষ। ১৯৫০ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। ১১ই ফেব্রুয়ারির যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ -

> এবার আর দেশবন্ধুপার্ক অঞ্চলের নিকাশী পাড়া বস্তি রক্ষা পেল না। প্রচন্ড বোমাবাজি করে সেখানকার মুসলমান বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হল।

ধীরেন মজুমদার বলছেন -

> গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য বেলগাছিয়ার মুসলমান বস্তি রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যান।[১৩]

মার্চ মাসের গোড়াতে বরিশালে শুরু হল ব্যাপক দাঙ্গা। দাঙ্গায় নিহতদের তালিকা প্রকাশ হতে থাকে যুগান্তর সংবাদপত্রের পাতায়। তারই বদলা চলতে থাকে পশ্চিম-বাংলায়। এই রায়টের ফলে সমাজের বুকে আর একটি সমস্যা দেখা দিল তা হল উদ্বাস্তু সমস্যা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে উভয়বঙ্গেই বাস্তুহারা হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, তারা প্রাণটুকুকে সম্বল করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৫০-এ বরিশালে রায়টের পর উদ্বাস্তু স্রোত প্লাবনের আকারে ধেয়ে আসে কলকাতার দিকে। এই সময় বিপন্ন মানুষের ত্রানকার্যে এগিয়ে আসে দেশের কমিউনিস্টরা। বাংলার বিপন্ন বাস্তুহারাকে বাঁচাবার জন্য অম্বিকা চক্রবর্তীর ব্যাকুল আহ্বান প্রকাশিত হয় ১লা মে যুগান্তরের পাতায়।

> ... বাংলার বুকের উপর আবার বীভৎস হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় দলে দলে হিন্দু মুসলমান সর্বহারা হইয়া পূর্ববাংলা হইতে পশ্চিম বাংলায়, পশ্চিম বাংলা হইতে পূর্ব বাংলায় চলিয়া যাইতেছে। আজ যখন বাংলার দুই অংশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান গ্রাম হইতে উৎখাত ও ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তখন দেখিতেছি যে এই সব দাঙ্গা দুর্গত বাস্তুহারাদের সমস্যা ধামা চাপা দিয়া নানা অবাস্তব রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহবা যুদ্ধের, কেহবা লুটতরাজ কেহবা জোরপূর্বক মুসলমান বাড়ী হিন্দুর দখলের, হিন্দুর বাড়ি মুসলমানের দখলের উস্কানি দিতেছে।[১৪]

৪ঠা জুলাই 'যুগান্তর'-এর এক খবরে প্রকাশ : গত সপ্তাহে শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ববাংলা থেকে পঁচিশ হাজার ছিন্নমূল নর-নারী এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সতেরো হাজার স্টেশন চত্বরেই অবস্থানরত।' [১৫] খাদ্য পানীয় ও স্থানাভাবে তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। জুনের শেষ ভাগ থেকে বাস্তুহারাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিন হাজার শরনার্থী শিয়ালদহে এসে পৌঁছচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে দেশের বাড়ি ঘর বিক্রি করে দিয়েছে বা ফেলে এসেছে। আর দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তাদের। এছাড়াও যুগান্তরে ১২শে জুলাই-এর খবরে প্রকাশ 'শিয়ালদহ স্টেশনে চারজন শর-নার্থীর মৃত্যু ঘটেছে এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে নানা রকম সংক্রামক রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে।' [১৬]

উদ্বাস্তুদের মধ্যে দুটি শ্রেণী ছিল, কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী। কৃষিজীবীরা মোটামুটি কিছু কিছু জমিতে চাষাবাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছিল। অকৃষিজীবীরা বেছে নিয়েছিল ঘনবসতি পূর্ণ শিল্পাঞ্চল গুলিকে, যেখানে তারা জীবিকার সন্ধান করতে পারে। ১৯৫০-এর পূর্বে যে সব পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের মনোভাব ছিল যে তারা যেকোন উপায়ে জীবিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে। তারা দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে উৎখাত হয়ে প্রাণ ভয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর নিকৃষ্ট নাগরিক রূপে তারা পাকিস্তানে বাস করতে চায়নি বলেই ভারতে চলে এসেছিল। কিন্তু ১৯৫০-এ যে পরিবার-গুলি দাঙ্গার ফলে এদেশে চলে এসেছিল তাদের মনোভাব ছিল অন্যরকম। প্রতিকূল ঘটনার চাপে পড়েই তারা চলে এসেছিল, পূর্ব পুরুষের ভিটা একেবারে ত্যাগ করবে বলে আসেনি। তাদের পূর্ববঙ্গে পুনরায় ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। উদ্বাস্তু যুবকদের জন্য কলকাতা সংলগ্ন স্থানে শিল্পাঞ্চলে চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার শিল্পাঞ্চল দূরে অবস্থিত নূতন অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেই কারণে এই সব অঞ্চলে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

১৯৫০-এর দাঙ্গার সময় পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যখন দেশত্যাগ করে এদেশে আসতে লাগল তখন পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জন্য এদেশের মানুষের মন কাঁদত। তারা যখন দলে দলে বাস্তুত্যাগ করে এখানে আসতে লাগল তাদের সেবাকার্যে কত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তারপর বছরের পর বছর যেমন এগোতে লাগল এই উদ্বাস্তু-দের প্রতি পশ্চিম বাংলার মানুষের মনোভাব ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠল। সহানুভূতির পরিবর্তে ক্রমশ বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এর কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার ফলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। পশ্চিমবাংলার শহরাঞ্চলগুলি ক্রমশই ঘন-বসতিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো এবং স্থানাভাব দেখা দিল। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হতে লাগল এবং জনজীবনের বেকার সমস্যা দেখা দিল। বেকার সমস্যার ফলে সমাজে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাংলা গল্প উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্বাস্তু সমস্যা এবং বেকার সমস্যা অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। ষাটের দশকে এবং সত্তরের দশকে বাংলার সমাজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অনুভূত হল। মানুষ চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করলো। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী পদ্ধতির অধীন হয়ে পড়তে লাগলো। দেশের অসংখ্য মানুষ রয়ে গেল দারিদ্র সীমার নীচে। অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষেরা সংগ্রামী হয়ে উঠতে শুরু করলো। দলবদ্ধ হতে লাগলো। শোষিত মানুষেরা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগলো। বাংলা সাহিত্যে, ছোটগল্পকারদের গল্পে এই সংগ্রামী চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমাদের সমাজ জীবনে যে সমস্যাগুলি দেখা দিল তা আমাদের আলোচ্য তিন শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

তথ্যপঞ্জী

১. অমলেন্দু সেনগুপ্ত - উত্তাল চল্লিশ - অসমাপ্ত বিপ্লব, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২১৮ প্রকাশক পাল পাবলিশার্স।

২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪১৬

৩. শ্যামলী গুপ্ত ও কান্তি বিশ্বাস - নারী ও সমতা, ৩০শে মার্চ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬৩

৪. তদেব পৃষ্ঠা ৬৭

৫. সমীর ঘোষ - পঞ্চাশের মন্বন্তর শিল্পে সাহিত্যে, ১৯৯৪, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১২

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১২

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ২৫

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০

১২. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - দাঙ্গার ইতিহাস, ১৪০১, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স পৃষ্ঠা ৬০

১৩. অমলেন্দু সেনগুপ্ত - উত্তাল চল্লিশ - অসমাপ্ত বিপ্লব, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ৪০১

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৮-৪০৯

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৯

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৯

তিন শিল্পীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী গল্পকারেরা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে যে তারা সমাজের কোন্ কোন্ বিষয়কে গল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং সমাজের কোন পরিস্থিতিগুলি তাদের ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছিল, তাদের গল্পের বিষয় ও ধরনের সঙ্গে আলোচ্য তিনজনের পার্থক্য কোথায় ? আলোচ্য তিন গল্পকারের পূর্ববর্তী লেখকেরা হলেন মোটামুটি ভাবে জগদীশগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, এছাড়া রয়েছেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবোধ ঘোষ।

কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। অচিন্ত্যকুমার তার প্রসঙ্গে বলেছিলেন "বয়সে কিছু বড়, কিন্তু বোধে সমান তেজোজ্জ্বল। তারও যেটা দোষ সেটা ঐ তারুণ্যের দোষ - হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার।" তাঁর যথার্থ আবির্ভাবের সময় এবং মুখ্য প্রকাশের কাল হল 'কল্লোল', 'কালি-কলম'এর সময়ে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজলী'র পৃষ্ঠায় ১৩৩১ বাংলা সালে। প্রথম অবস্থায় তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল কবিতার মধ্য দিয়ে। অনেকের মতে পরিণত বয়সে যখন গল্প লিখলেন তখন দেখা গেল - 'তিনি philosophy of sex বা কামতত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না।" [১] আবার ভূদেব চৌধুরীর মতে - "যৌনতার প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের কোন কুণ্ঠা নেই, অথচ সে বিষয়ে কোন বিশেষ ঔৎসুক্যও অন্ততঃ তার ছোটগল্পের জগতে অতিশয় ছায়া সম্পাত করতে পারেনি। ... জগদীশগুপ্ত অবিশ্বাসী তাহলেও বিশ্বাসহীন নন তিনি।" তাঁর গল্পে যৌনতা যেখানে আছে সেখানেও উদ্দীপক নয়, বরং একটা ঘৃণামিশ্রিত ভাব রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে।

বিধাতার প্রতি এক ধরণের ঘৃণাকে দৃঢ়তার সঙ্গে তার গল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে আর কোন লেখকের মধ্যে দেখা যায় না। সে কারণেই তার প্রথম গল্প সংকলন 'বিনোদিনী' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।' তাঁর গল্পের শৈলীতে একটি দৃঢ় সংবদ্ধ রূপ লক্ষ্য করা যায় যা তার নিজের অস্তিত্বের মতোই। তির্যক স্পষ্টোক্তি গল্পগুলিকে দৃঢ় হতে আরো সহায়তা করেছে। ... নিছক বাস্তব জীবনের কার্যকারণের সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ গল্পের বিষয় বস্তুকেই অস্বাভাবিক, এমনকি অসম্ভব বলেও মনে হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিছক সুপ্রদৃষ্ট দুর্ঘটনা সফল করবার জন্যই কামদা নদীতে কুমীরের অকারণ আবির্ভাব (দিবসের শেষে') অথবা শিবপ্রিয়ের অন্তর্ধান, নিত্যর আত্মহত্যা, শিব-প্রিয়ের গ্রামত্যাগ ও ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে কার্যকারণের কোন অনিবার্য সংগতি নেই। কিংবা তার চেয়েও ভয়াবহ অবিশ্বাস্যতা রয়েছে, নিতান্ত অনায়াসে যা চিত্রিত হয়েছে জগদীশ গুপ্তের গল্পে।

তাঁর গল্পে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা রয়েছে - যেমন 'চার পয়সার এক আনা' গল্পে দেখা যায় কুড়িয়ে পাওয়া একটি 'আনি' চরম দরিদ্র পরিবারে প্রায় পাশবিক কোলাহল ও ঈর্ষা সৃষ্টি করেছে। নিষ্ঠুরতার চরম প্রকাশ দেখা যায় 'পয়োমুখম্' গল্পে। আবার কখনো তিনি মানুষকে নিছক দেহবাদের উর্ধ্বে তুলেছেন এবং সুস্থ মানবিক সম্পর্কের প্রতি তার গভীর আকর্ষনের ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমন 'চন্দ্রসূর্য যতোদিন' গল্পে সুর্ণপ্রভার মন তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল বলেই সে উন্মাদ হয়েছিল। বারাঙ্গনা চরিত্রগুলির চিত্রন প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবী বলেন যে ৩।৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি পতিতাদের বাড়ীতে খেলাধূলা করতেন এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষ বা মেয়ে মানুষ ঝগড়া করছে দেখলে তিনি দাঁড়িয়ে যতক্ষন সম্ভব ঐ ঝগড়া শুনতেন। এছাড়া তাঁর জীবনকালেই দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে ধ্বংসমুখী গ্রাম, বিপত্নীক কৃষক এবং এমন সব মানুষ,

প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধে যাদের সংশয়। জগদীশ গুপ্তের শব্দচয়ন বাক্যরীতি সাবেকী, কিন্তু তা দিয়েই তিনি ব্যক্তি চেতনায় যে অনিশ্চিয়তা দুঃখবোধ ও অর্থহীনতার অভিঘাত এসেছে তাকে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মানুষের দুঃখ পাপ বন্ধনের দিকটি গল্পে তুলে ধরতে চেয়েছেন। হাসান আজিজুল হকের মতে 'জগদীশ গুপ্ত তার সৃষ্ট জগতে যেভাবে লোভ, হিংসা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা অন্ধ প্রতিযোগিতা, বীভৎস যৌনতা ইত্যাদি স্তূপাকার করে তুলেছেন তাতে মানুষ তার আড়ালে পড়ে গেছে।'[৩] কিন্তু জগদীশগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নির্লোভ, নির্লিপ্ত অনাসক্ত। তাই তাঁর চোখ অনাসক্ত প্রসন্নতার সঙ্গে মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, পাপপুণ্য প্রেম-জিঘাংসা সব কিছুকেই ক্রিয়াশীল হতে দেখেছে এবং সেগুলিকেই তিনি সাহিত্যে নতুন ভাবে সাজিয়েছেন। জগদীশ গুপ্ত তার গল্পে অনেক সময়েই মানুষের অন্যায় ও অবনমনের মূলে যে অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান তা স্বীকার করেছেন। 'কিন্তু তার আরো একটি গভীরতর সিদ্ধান্ত ছিল, তা হল বহু মানুষই স্বভাবতই অসৎ হয় অন্যায় তাদের স্বাভাবিক আসক্তি। তা প্রত্যক্ষ কোন আর্থিক অভাবের ওপর নির্ভর করে না।'[৪]

কল্লোলের লেখক গোষ্ঠীর মতো জগদীশ গুপ্ত কোনদিনই রোমান্টিক স্বপ্নের পথে পা বাড়াননি তিনি আদৌ আবেগ প্রবণ ছিলেন কিনা সন্দেহের অবকাশ থাকে। 'তার নির্মোহ নিরাসক্ত কঠিন দৃষ্টির দর্পনে তাই উদ্ভাসিত হতে পেরেছে জীবনের এক নিষ্ঠুর সত্যের ভয়ংকর মুখচ্ছবি।'[৫] তিনি বাংলা সাহিত্যের জগতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে, এই স্বাতন্ত্রের পেছনে রয়েছে তাঁর বিষয়বস্তু নির্মানে, চরিত্র চিত্রনে কাহিনীর পট পরিকল্পনায় সমাজ জীবনকে ভিন্ন কোন থেকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। মহাযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে অনেক সময়ই তিনি কোন আশার বাণী আমাদের শোনাতে পারেননি। সমাজ ব্যবস্থার নিয়তির নিষ্পেষণে বা অমোঘ নিয়মে

বিপর্যস্ত মানুষ নিয়েই তার পয়োমুখম্' 'দিবসের শেষে', 'অসাধু সিদ্ধার্থ'-এর মতো গল্পগুলি দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু চরিত্ররাই তাঁর উদ্দিষ্ট তাই তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে তার সাহিত্য। তার গল্পগুলি নিয়মতান্ত্রিক কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন। তার লেখা লেখক জীবনের সূচনা হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগেই, মানুষ তখন থেকেই তার পুরাতন মূল্যবোধকে হারিয়েছে, যার ফলে মনে হচ্ছে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাই তাৎপর্যহীন। মানুষের দুঃখ, কথাকে তিনি একটা বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, তাই কাহিনীর বিকাশ, পরিণতি তার কাছে বড় হয়ে ওঠে নি, বরং তার সাহিত্যে দুঃখ কষ্ট নির্যাতিত মানুষের বাঁচার বৃথা চেষ্টাটাই বড় হয়ে উঠেছে। তার গল্পে তিনি অধিক পরিমাণে দেখাতে চেয়েছেন 'মানুষের স্বভাবের দৈন্য কদর্যতা নোংরামি, দেখিয়েছেন জীবনের অন্তর্নিহিত শুশ্রিভবনের শক্তি- বারে বারে মানুষের অমানুষিক নীচতা ও ইতরতার কাছে কীভাবে পরাভব মানে।'[৬] বাস্তবতার সমস্যাকে তিনি তত গুরুত্ব দেননি বরং বলা চলে 'তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল মানুষের সহজাত ইতরতার রূপায়ণ'[৭]। মানুষের কোন শুভবোধকে তিনি সত্যের আলোয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি কারণ 'মানুষের সংসারে তিনি দেখেছিলেন নৃশংস অ-মানবিকতা, মনুষ্যত্বহীনতা।'[৮]

জগদীশ গুপ্তের সমসাময়িক কালে একটা রোমান্টিক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রধানত এসেছিল 'কালি-কলম', 'কল্লোলের লেখকদের কাছ থেকে। এদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ প্রভৃতিরা। এই লেখকেরা ব্যক্তির জীবনের বঞ্চনা অতৃপ্তিকে বাস্তব পটভূমিকায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাদের রচনায় বঞ্চনার ক্ষোভ, উৎপীড়নের ছবি ফুটে উঠেছে, এবং সমাজ কাঠামোর প্রতি একটা তিক্ততা কখনও কখনও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে দৃষ্টিতে তারা সব কিছুর

সমাধানের কথা ভেবেছিলেন তা ছিল রোমান্টিকতার বিরুদ্ধ বিস্ময়। অচিন্ত্যকুমার কল্লোল সম্পর্কে বলেছেন - কল্লোলের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল দুটো - (১) প্রবল বিরুদ্ধবাদ, (২) বিহ্বলভাববিলাস। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানেই থেমে থাকেন নি, তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' এতে দেখা যায় অনেক মৃত্যু সত্ত্বেও বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় এখানে দেখা যায়, কিন্তু এর থেকে তিনি অতিক্রম হতে চেয়েছেন।

প্রেমেন্দ্রের ছোট গল্পগুলিতে একটা চাপা টেনশন সবসময় অনুভব করা যায়। এই 'টেনশনকে ঠিক তারে বাঁধতে গিয়েই তিনি রচনা করে নিয়েছিলেন একটা একান্ত নিজস্ব শিল্পশৃঙ্খলা।'[৫] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা গল্প উপন্যাসে দরিদ্র জীবন ও চরিত্র যে রকম গুরুত্ব পেয়েছে তা পূর্বে ছিল না। সামাজিক জীবনে একদিকে যেমন শ্রমিক কৃষক নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনে নেমে আসছে তীব্র অর্থনৈতিক বিপর্যয় তেমনি ধর্মঘট, খাজনা বন্ধের চিন্তা, মনুষ্যত্বের মর্যাদা দাবী প্রভৃতি দরিদ্র মানুষের বড়ো মাপে সাহিত্যে আসার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিল। মধ্যবিত্ত জীবনের দুর্গতি চিত্রিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে কারণ লেখকেরা প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলিতে রয়েছে এই বিপর্যয়ের কথা যেমন। 'উপনয়ন' গল্পে দেখা যায় ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের সর্বগ্রাসী ভাঙন, আর্থিক বিপর্যয়ের কথা। জীবিকাগত শূন্যতার কথাই শুধু নয় তাঁর গল্পে যে নারী পুরুষকে আমরা পাই তারা সবদিক দিয়ে নিরবলম্ব। আদর্শের দিক দিয়ে ভাবনার দিক দিয়ে, মূল্যের দিক দিয়ে নিজেদের চিনিয়ে দেবার মতো কোন বাসনা তাদের নেই। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন '... কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থতা (morbidity) বা মনোবিকারের ইঙ্গিত আছে।' কিন্তু ভূদেব চৌধুরীর

মতকে অনুসরণ করে বলা যায় যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের morbidity প্রকৃতপক্ষে এক ভারসাম্যহীন, অসুস্থ যুগজীবন যন্ত্রনাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে তার শৈল্পিক প্রকাশমাত্র। দেহজীবিনীদের নিয়ে লেখা তার 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে দেখা যায় অন্ধকার নগর পথে বেগুনতার গত্যন্তর বিহীন সঙ্গীটিকে নিয়ে চলতে থাকে। সে যাত্রায় আনন্দ নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই, কিন্তু পরাজয়ও নেই। 'লেখক এখানে এবং সর্বত্রই জীবনের গ্রীষ্ম গম্ভীর বিষন্নমূর্তি গড়ে তোলেন। তা যে কখনো মর্বিড হয়ে ওঠে নি তার এটাই কারণ - অস্তিত্বকে সময়ের হাতে, নিয়তির হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখেও সে লাঞ্ছনাই ভবিতব্য - একথা জেনেও সে ভূমিশায়ী হয়না।'[১] তাঁর লেখায় কখনো ব্যক্তির যৌন চেতনা প্রশ্রয় পেলনা। তার কারণ তিনি মানুষের সমগ্র অর্থ খুঁজতে চেয়েছিলেন। মানুষের সমগ্র অর্থে কাছে তার জীবিকা, শ্রেণী সংস্থান যৌনতা এগুলি শেষ পর্যন্ত গৌণ,- এই ছিল তার জীবনার্থ বোধ।

মধ্যবিত্ত জীবনের নিরন্তর টিকে থাকার লড়াই দেখতে পাওয়া যায় তার 'শুধু কেরানী', 'পুন্নাম', 'কুয়াশা', 'শৃঙ্খল' ইত্যাদি গল্পে। পতিতাদের জীবন কাহিনীতে সজল হয়ে উঠেছে তার 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'মহানগর', 'সংসার সীমান্তে' ইত্যাদি গল্পগুলি। আবার মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন 'শৃঙ্খল', 'হয়তো', 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পগুলিতে। যুদ্ধোত্তরকালীন ভারতবর্ষে যে মানুষের চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সব মানুষই যেন ভঙ্গুর মানুষ অসারত্বের সামনে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। 'পুন্নাম' গল্পে দেখা যায় লোলিত চুরি করে কিন্তু সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। এখানে মূল্যবোধের একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। লোলিত আত্ম-সমীক্ষা বা যুগসমীক্ষা করে যা পাচ্ছে সেটা ননর্থক। আবার 'সংসার সীমান্তে' গল্পে রজনী অপেক্ষা করে উজ্জ্বলতর জীবনের জন্য, জীবনের প্রতি আগ্রহে এ গল্পের শেষ হয়। মহানগর গল্পেও রয়েছে পতিতা জীবন থেকে উদ্ধার করার এক প্রতিজ্ঞার কথা। এ গল্পে ছোট

রতন দিদিকে এই শহরের পতিতাজীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা করে। এগল্পেও রয়েছে অন্ধকার জীবন থেকে আলোর জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। প্রথম পর্যায়ে তার গল্পে একটা ব্যঙ্গ রয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালের গল্পে রয়েছে অসীম দরদ। যে মানুষ প্রবৃত্তি দিয়ে গড়া, কামনা দিয়ে গাঁথা সেই মানুষের পরিচয়ের অন্বেষণে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি।

কল্লোলের অন্যতম লেখক হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রথম মহা যুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে সমস্ত জগতে যে একটা ভাঙনের ইতিহাস রচিত হচ্ছিল, যাতে ছিল সংশয়, সন্দেহ পুরাতন মূল্যকে দূরে নিক্ষেপ করা ব্যক্তি জীবনের নিশ্চিত আরামের অবলুপ্তি - বাংলা সাহিত্যের কথাসাহিত্যিকরা সেই সমস্ত জীবনবোধকে বিভিন্ন-ভাবে তাদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। জনৈক সমালোচক বলেছিলেন যে কল্লোলের কথা সাহিত্যিকেরাই প্রথম অনুভব করে যে অর্থনীতিই মানুষকে যথেষ্ট পরিমানে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি অভিজ্ঞতাই যে অচিন্ত্যকুমারের সত্তার ভিত্তিতে ছিল তা বোঝা যায় তাঁর এই মন্তব্য থেকে - এমনি অর্থাভাব প্রত্যেকের পায়ে পায়ে ফিরেছে। মাপেরা নিশ্বাস ফেলছে স্বচ্ছতায়। হাঁড়ি চাপিয়ে চালের সন্ধানে বেরিয়েছে। ... শৈলজা খোলার বস্তিতে থেকেছে পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের প্রুফ দেখেছে। নৃপেন টিউশানী করেছে বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে।' - এর চূড়ান্ত উদাহরণ হয়তো দেওয়া যেতে পারে তার 'হাড়' গল্প থেকে, যেখানে স্বামীর কতকাল বেচে সেই অর্থে জীবন যাপনের কথা ভাবে এক স্ত্রীলোক।

'কল্লোল' পর্বের অনেক লেখকের মত অচিন্ত্যকুমারের লেখনীতেও মানুষের দুঃখ দারিদ্র সুপ্রভঙ্গের দেশের লোকায়ত জনজীবনের দুঃখ-দারিদ্রের বাস্তব ছবি নয়।

কৃষক, মজুর তাঁর সাহিত্যে এসেছে যখন তিনি পরিণত জীবনে মফঃস্বল শহর ও গ্রাম বাংলাকে তার কর্মসূত্রে খুব কাছের থেকে জানার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বিচারক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন। বিচারালয়ে নানা ধরনের মানুষের উপস্থিতিতে তাদের সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ তার হয়েছিল, এবং সেই সূত্রেই বিশেষতঃ - মুসলিম জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যা তার গল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই স্থান করে নিয়েছে। বিচারক থাকাকালীন অর্জিত এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারাই তিনি তার চার পাশের ছড়ানো জীবনকে মনস্তাত্ত্বিক খুঁটিনাটিতে ধরে দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতার নানা দিক তাঁর গল্পে বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে উঠে এসেছে। আবার জোতদার মহাজনের অত্যাচার কণ্টকিত কৃষক শ্রমিকরা তার গল্পের চরিত্র হয়েছে।

—

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডব মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। যুদ্ধ তার সর্বগ্রাসী জিহ্বা বিস্তার করেছিল - মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ওপরে। শুরু হল কণ্ট্রোল, রেশনিং। এর ফলে শুরু হল কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষের চক্রান্তে কালোবাজারি। চোরাকারবারীর এই অমানুষিক পাপের চিত্র রয়েছে - অচিন্ত্যকুমারের 'কেরোসিন' গল্পটিতে। দাঙ্গা, মন্বন্তর ইত্যাদি পটভূমিকা তিনি তার গল্পে অসাধারণ সার্থকতায় ব্যবহার করেছেন। মন্বন্তর রূপী কালনাগের বিষবাষ্পে বিষাক্ত হয়েছে স্বামী, পিতা পুত্রের সম্পর্ক। ক্ষুধা তাড়িত মানুষের কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় তার 'বাঁশবাজি' গল্পে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানকে জীবিকার উপায় করে নিতে মানুষের দ্বিধা হয় না, কেবল মাত্র পেটের ক্ষুধার জন্য। 'চিতা' গল্পেও রয়েছে - মন্বন্তর ক্লিষ্ট মানুষের কাহিনী। যেখানে মৃতদেহের জন্য সংগৃহীত অর্থ দিয়ে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। ক্ষুধানিবৃত্তির কাছে মৃতদেহের সৎকার অর্থহীন হয়ে যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কাক' গল্পে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে মানুষের নিষ্ঠুরতাকে, মানুষের মূল্যহীনতাকে তুলে ধরেছেন। মন্বন্তরের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র সংকট ও সেদিন পঞ্চাশের

বাংলায় কী ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আজ আর তা শুধু কাগজের রিপোর্টে নয়, গল্পের বিষয়েও পাওয়া যায়। 'বস্ত্র' গল্পটি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। 'জীবন ধারণের অন্যতম উপাদান বস্ত্রও যে মরণের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে এবং তাও শুধু লজ্জা নিবারণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই'[১০] - বস্ত্র গল্প তারই তীব্র করুণ আলেখ্য। জগদীশ গুপ্ত থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণে যে মানুষকে পাই তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে জগদীশ গুপ্তে রয়েছে প্রাতিস্বিক মানুষ, অচিন্ত্যকুমারের গল্পে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানুষ, এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে এ দুয়ের মিশ্রণ ঘটেছে।

এদের প্রায় কাছাকাছি সময়ে এসেছেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, এবং কিছু পরবর্তী সময়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে মিশে রয়েছে রাঢ়ের ইতিহাস, রাঢ়ের মানুষ, তার জীবন, তার উৎসব, তার সঙ্গীত। সব মিলিয়ে তার সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন আঞ্চলিক রীতিতে। তারাশঙ্কর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন -

> ... বীরভূম একই সাথে শাক্ত ও বৈষ্ণব। বীরভূমের এই দ্বৈতভাব বুঝতে না পারলে বীরভূমকে বোঝা যাবে না, তারাশঙ্করকেও না।

আবার ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

> অনেক সময় মনে হয় তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি।

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন 'সুক্ষেত্রে সম্রাট'। এই গ্রাম্যজীবন এবং সুক্ষেত্র হল রাঢ় অঞ্চলের মাটি আর মানুষ। জগদীশ ভট্টাচার্যের কথাকে অনুসরণ করে বলা যায় তারাশঙ্কর "আমাদের কথাসাহিত্যকে সেখানে পৌঁছে দিলেন সেখানে ব্যক্তি বিশেষের

সুখ দুঃখ নয় এক বিপুলায়তন জনপদের লক্ষ মানুষের জীবনের কলধ্বনি তাতে শোনা যাচ্ছে।" [১১]

তার গল্পে ব্রাত্য-গোত্রহীন মানুষেরা উঠে এল নায়ক নায়িকা হয়ে। ডোম, বাউরী, বাগ্দী, কাহার, বেঁদে, সাঁওতাল হয়ে উঠল নতুন সাহিত্যের নায়ক। অন্ত্যজ যাযাবর মানুষদের আদিম জীবন নিয়ে তারাশঙ্কর বেশ কিছু গল্প লিখেছেন যেমন 'বেদেনী' গল্পে দেখা যায়, এখানে রয়েছে উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় একটি মেয়ের নিরন্তন প্রয়াশ। 'যাদুকরী' গল্পের আরম্ভ হয়েছে বীরভূমেরই একটি গ্রামের বাজিকর সম্প্রদায়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এ গল্পে পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে বাজিকরীর বিচিত্র চরিত্রকে প্রকাশের জন্যই। তারাশঙ্করের বহু ছোট বড় গল্পে ফুটে উঠেছে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দীর্ণ সময়পটের সংকট ছবি। 'পৌষলক্ষ্মী', 'তিনশূন্য', 'ইস্কাপন', 'মরামাটি' 'অহেতুক' 'বোবাকান্না' প্রভৃতি তারই চিহ্ন স্পষ্ট। "আকালের পর বান, বানের পর মড়ক। নরমুন্ড গড়াগড়ি কথার কথা নয়।' - এ প্রত্যক্ষ বাস্তব, অথবা 'বোবাকান্না' গল্পে দেখা যায় 'গ্রামে লোক নাই, অন্নহীন গ্রাম ছেড়ে নর মাংসের লোভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে।' 'তিনশূন্য' গল্পে দুর্ভিক্ষের আরো নগ্নছবি ফুটে উঠেছে - 'ওদিকে তখন কঙ্কালের দলের মধ্যে কলহ বেধে গেছে। নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে পড়া ফ্যানের ভাগ নিয়ে কলহ। ..."

তারাশঙ্কর তার গল্পগুলিতে দেখালেন গ্রামীন সমাজ কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে যন্ত্র সভ্যতা কিভাবে গ্রাস করছে কৃষিকে, জমিদার আর ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বে কিভাবে পিছিয়ে পড়ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। যন্ত্র নির্ভর উপাদান ব্যবস্থা আধুনিক ইনডাস্ট্রি কিভাবে সংরক্ষিত গ্রামীন সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙে দিচ্ছে, সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে প্রলুব্ধ করছে। জমিদার

শ্রেণীর ভাঙনের চিত্র তাঁর গল্পে অন্যতম প্রধান বিষয়। এই চিত্র দেখা যায় 'জলসাঘর' 'রায়বাড়ি' 'অগ্রদানী' ইত্যাদি গল্পে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহজিয়া প্রেমকে দেখিয়েছেন তাঁর 'রসকলি' 'রাইকমল' গল্পে। এই গল্পগুলিতে বৈষ্ণবরস স্ফুরণ ঘটেছে তার ঘনিষ্ট অভিজ্ঞতা লব্ধ হৃদয়ানুভূতির ফলেই। তারাশঙ্করের গল্পে দেখা যায় পাত্র-পাত্রীরা তাদের আদিম প্রাকৃতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি। তারাশঙ্করের শিল্প প্রতিভার এটাই প্রধান উপাদান। কেবল প্রসঙ্গে নয়, তার প্রকরণের মধ্যেও দেখা যায় এই unsophisticated আদিমতা ও অকৃত্রিমতা। মানুষের জীবন প্রকৃতির দ্বারাই চালিত, এই প্রকৃতির লীলাকে তারাশঙ্কর অস্বীকার করেননি। তার সাহিত্যে এই প্রকৃতি জীবনীশক্তি রূপেই স্থান পেয়েছে। 'প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত মানুষের জীবনে এই জীবনীশক্তিকেই তিনি পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দরের সমস্ত খন্ডিত চেতনার উর্ধ্বে।" [১২] তার বিভিন্ন গল্পে প্রবৃত্তি মানুষের নিয়তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই প্রবৃত্তির বাঁধনে মানুষ আবদ্ধ, এর থেকে মানুষের মুক্তি নেই। প্রকৃতিরূপী নিয়তির অনিবার্য পরিণাম থেকেও মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন 'তারিনীমাঝি' গল্পে শেষ পর্যন্ত তারিনীমাঝি তার একমাত্র আপনজন স্ত্রী সুখীকে বাঁচাবার চেষ্টায় বিফল হয়ে নিজেকেই বাঁচাতে সচেষ্ট হয়। এখানেও তারিনী মাঝি আত্মরক্ষার আদিম প্রকৃতির কাছে পরাস্ত হয়েছে। জগদীশ ভট্টাচার্য-এর কথাকে সমর্থন করে বলা যায় - " তাঁর উপন্যাসের বিপুলায়তনের মধ্যে ধরা পড়েছে জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, আর ছোট গল্পে আছে জীবনের খন্ডাংশের মধ্যেই তার অসাধারণ মহিমার ব্যঞ্জনা। উপন্যাসে আছে বিস্তৃতি, ছোটগল্পে গভীরতা। ... নিজের ব্যক্তি-সাধনায় প্রত্যক্ষীভূত জীবনের কোনো বিশেষ রূপকে তিনি ধ্যান করেননি, বরং তাঁর কবি-কল্পনাকে আশ্রয় করে জীবন সত্যই যেন নিজেকে প্রকাশ করেছে। এখানেই তারাশঙ্করের প্রতিভার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।" [১৩]

প্রায় শিল্পীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা কিছু না কিছু উপকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম উপকরণ হলো প্রকৃতি। কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পী বিভূতিভূষণের রচনা দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষ - এই তিন আয়তনের ওপর। মানুষকে দেখার আগ্রহ তার রচনায় লক্ষ্য করা যায়, যেটা বিশ শতকের আগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য। বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি বিস্ময়করকে আবিষ্কার করে যান। বিস্মিত হওয়া এবং বিস্মিত করা বিভূতিভূষণের লক্ষ্য। মানুষের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে প্রকৃতির চাওয়া পাওয়াকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং এই প্রকৃতিকে নিয়েই তিনি একটা সম্পূর্ণ সত্যে উপনীত হতে চান। অন্তর্বিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিভূতিভূষণ প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য বা Identity mark হলো বিশ শতকের বিষয়। যেমন 'পুঁই মাচা' গল্পে পুঁইশাক দাঁড়িয়ে যায় একটা বিশেষ ভাবনার রূপ হিসেবে। নিজের মতো হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা যেটা ক্ষেন্তির মধ্যে ছিল। আবার 'মৌরীফুল' গল্পে মেয়েটি মৌরীফুলের মতো হয়ে উঠতে চায়। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি আত্মাকে অনুভব করেছেন। আবার 'আহ্বান' গল্পে দেখা যায় ভিন্ন বয়সের ভিন্ন পরিবেশের দুটো মানুষ মানুষীর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। একটি প্রতিবাদী ব্যক্তিসত্তার দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হওয়াই এ গল্পের মূল লক্ষ্য। তাঁর বেশ কিছু গল্পে দেখা যায় দারিদ্রের কারণে মানুষ কতখানি অসহায়, কিন্তু তার মধ্যেও বেঁচে থাকার আকুল প্রয়াস। যেমন পুঁইমাচা গল্পে ক্ষেন্তি সজেজ পুঁইশাকের বদলে শুকিয়ে যাওয়া পুঁই ডাটাতেই খুশি। মানুষ শুধুমাত্র খেয়ে পড়ে বাঁচতে চায় কিন্তু এই সব মানুষেরা সেটাও পায় না। লেখক এই গল্পে অসাধারণ চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। গল্পের শেষে দেখা যায় ক্ষেন্তি বেঁচে নেই, পুঁইশাক জীবন লাবণ্যে ভরপুর হয়েছে। ক্ষেন্তি বেঁচে থাকলে সেও জীবন লাবণ্যে ভরপুর হতো। এখানে বোঝা যায় তার মৃত্যু কতখানি ভয়ংকর। প্রকৃতি ব্যর্থ হয়ে যায় মানুষ ব্যর্থ হয়ে যায় বলে। বিভূতিভূষণের গল্পে কোন সমালোচনা দেখা যায় না। কোন রকম প্রতিবাদও মুখ্য হয়ে ওঠে না। মানুষের

আকাঙ্ক্ষা, তার অসহায়তা অথবা অপার জিজ্ঞাসা-ই তার রচনার মূল বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির শান্ত, সৌন্দর্য রূপই তার গল্পগুলিতে বিশেষতঃ গ্রাম্য প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। গুলঞ্চলতা, টুনটুনি পাখি, একটা প্রান্তর - এই সব প্রাত্যহিক জীবনে দেখা বস্তু বা বিষয়কে তিনি অপরিচিতের আবরণে আচ্ছাদিত করেন। রোম্যান্টিকতা যে আদর্শ ব্যবহার করে সেটার মধ্যেই তিনি একটা সত্যতা খুঁজে নেবার অবকাশ সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের বোধ, উপলব্ধির ওপরে জোর দেন যা আমাদের অন্তর্গত রক্তের মাঝে খেলা করে, যা দোলাচল সৃষ্টি করে।

—

কল্লোলের সময়ের অন্যতম প্রতিভাবান লেখক হলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্কসীয় অনুষঙ্গ এবং বিজ্ঞান বোধের অনুষঙ্গ নিয়ে সর্বদা 'কেন'র উত্তর খুঁজেছেন তিনি। যুদ্ধ, মন্বন্তর আমাদের মূল্যবোধগুলিকে কীভাবে ভেঙে দিচ্ছে তা তিনি দেখিয়েছেন। শুধু দুর্নীতি, শোষণ, অত্যাচার, অনাহারের মৃত্যুর ছবি নয়, কী কারণে কোন সূত্রে এই বিপর্যয় নেমে আসছে তার বিশ্লেষণ করে তিনি সামাজিক বাস্তবতার নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। হতমান্ দারিদ্র্যের প্রতি তার সমর্থন থাকে যদি সে বাঁচতে চায়। যেমন 'ভিখুর' প্রতি তার অসীম দরদ 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে দেখা যায়। আবার 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে নীলমণির প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দরিদ্র, শোষিত ঐক্যবদ্ধ মানুষের মিছিল দেখা যায়। নির্যাতিত মানুষ যে একদিন ঐক্য-বদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে এই উপলব্ধিতার গল্পে রয়েছে। তার গল্পগুলিতে বেঁচে থাকার শর্ত বার বার উচ্চারিত হয়েছে। মানুষের জীবনের অন্যতম দিক যৌন আকাঙ্ক্ষা তাকেও তিনি গল্পের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন - 'প্রাগৈতিহাসিক' 'সরীসৃপ' 'হলুদপোড়া' 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' ইত্যাদি গল্পে।

মন্বন্তরের সময়কালেই 'সমুদ্রের স্বাদ' নামে যে গল্প সংকলন বের হয় তাতেই তাঁর সামাজিক শ্রেণীচেতনার দিকটি ধরা পড়ে। যুদ্ধ, মন্বন্তর আমাদের মূল্য-বোধকে যেভাবে ভেঙে দিয়েছে, প্রশাসনিক স্তর এবং সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীস্তরের সম্পর্কটা যেভাবে নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে তাতে মাণিকের মতো অনেক শিল্পীই সমাজ সচেতন হয়ে পড়েছেন। তাঁর 'ভেজাল' গল্প সংকলনে মধ্যবিত্তের বিপর্যস্ত মূল্যবোধের অসাধারণ ছবি আছে 'ভয়ঙ্কর' 'ধনযৌবন' ইত্যাদি গল্পে। এই অমানবিকতার ছবি আরো তীব্রমাত্রা পেয়েছে 'আজকাল পরশুর গল্প' সংকলনে। 'দুঃশাসনীয়' এই সময়কার প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। এই গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবছায়া রূপকাবরনে ঘেরা নারীর সংস্কার সিদ্ধ লজ্জার এমন বর্বর উলঙ্গতা সাধন, যে সমাজ ব্যবস্থার কীর্তি, তাকেই লজ্জা পাইয়ে দিতে লেখক তির্যক বাগভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। তার 'টিকটিকি' গল্পে কোথাও আলো দেখা যায় না, কুৎসিত আবহাওয়া দিয়ে সমস্ত পরিণামকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে টিকটিকির রূপের মধ্যে। মানুষও এখানে 'টিকটিকি' হয়ে যাচ্ছে, কাফ্কার 'মেটামরফসিস' গল্পের পোকা হয়ে যাবার মতো। এই গল্পে জ্যোতিষার্ণব তার স্ত্রীর মৃত্যুকেও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে। দুরূহ বাকভঙ্গী, অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করে এই গল্পগুলিকে তিনি জটিল করেছেন তাই নয় সেই সঙ্গে গল্পগুলি আধুনিক শিল্প হয়ে উঠেছে।

সাধারণ বা হীনবর্গের মানুষদের নিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন আর তারাশঙ্কর মানুষের হারজিতের কথাকে বলেছেন। কিন্তু মাণিকের স্বাতন্ত্র হলো নিম্নবর্গের মানুষ জিতবে কিনা। মাণিকের যুক্তি হলো মানুষ চরিতার্থ চায়, স্বাভাবিক পথে সেটা না হলে না-স্বাভাবিক পথেই তাকে অর্জন করবে। মানুষের খেয়ে পড়ে বাঁচার অধিকার আছে, এই সৎ আকাঙ্ক্ষার জন্য মাণিক তাদের সমর্থন করে। মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তিনি গল্পগুলোতে দেখিয়েছেন যে তার একমাত্র উপায় হলো সে হীনবিত্ত

হয়ে গেছে এই বোধ নিয়ে হীনবিত্তদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া। জীবন বিমুখতা নয় জীবন উন্মুখতাই মাণিকের গল্পের লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের প্রতি প্রীতি তাঁর প্রায় সব গল্পেই রয়েছে এই বাস্তবতাকে অঙ্কন করার জন্য তাঁকে সাহায্য করেছে মার্কস্-সীজম ও তার বৈজ্ঞানিক মন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যে তার ৪৮এর গল্প গুলো মৃতদেহের মতো ঠাণ্ডা'। জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলো অন্ধকারেই জন্ম অন্ধকারেই শেষ। মাণিক তার উত্তরসূরী হয়ে অন্ধকারের চর্চা করেন, কিন্তু অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে আসার পথও তিনি খোঁজেন। তার প্রথম পর্বের গল্পে রয়েছে কিছু করার চেষ্টা। শেষ পর্বের গল্পে এই দেখাটা আরো সচেতনভাবে এসেছে। জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্যই - মাণিক ফ্রয়েড এবং মার্কসীজমকে গ্রহণ করেছেন। জীবনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যখনই ফ্রয়েডতত্ত্ব তাকে সাহায্য করতে পারছে না তখনই তিনি তা বর্জন করে মার্কসতত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন। তাই গিরিনের (হলুদপোড়া) মনস্তত্ত্ব আর ময়নার মা'র (হারানের নাতজামাই) মনস্তত্ত্ব এক নয়। চারু পরীর মৃত্যু (সরীসৃপ) আর রাবেয়ার মৃত্যু (দুঃশাসনীয়) এক নয়। রাবেয়া মৃত্যুকেই স্বামী বলে মনে করে। সে আত্মহত্যা করে আত্মরক্ষার জন্য।

শুধু সমস্যার চিত্র অঙ্কন করাকে তিনি শ্রেয় মনে করেন না, যেটা প্রেমেন্দ্র মিত্র করেছেন। তিনি সর্বদা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। মাণিকের সাহিত্য, উদ্দেশ্য-প্রধান বা প্রচারধর্মী বলে মনে হলেও তা শিল্প হয়ে উঠেছে, কারণ এই সাহিত্য একটা বাণী বহন করে। এই বাণী কেবল এক শ্রেণীর মানুষের বা কোন পার্টির জন্য নয়। এই বাণী সব পীড়িত মানুষের জন্য। তার সাহিত্য নির্বিশেষত্ব দেয়, তাই তার রচনা মূল্যবান সাহিত্যের উৎকর্ষ লাভ করেছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্পে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন ঠিকই কিন্তু সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের সঙ্গে কৃষিজীবী, শ্রমিকদের অনিবার্য সংঘাতের কথা বলেছেন অনেক

আগেই - সুবোধ ঘোষ তার ফসিল গল্পে। কল্লোল, কালিকলমের লেখকেরা তাদের গল্প উপন্যাসে আঞ্চলিক, অবহেলিত বা না-সামাজিক মানুষের জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে বাস্তবতাকে এনেছিলেন। সুবোধ ঘোষ তার গল্পে এনেছেন গোটা সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো এবং তার প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপ। কীভাবে সামন্ততন্ত্র পেরিয়ে ধনতন্ত্রের মালিক শ্রমিকের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষ নিয়ে আসছে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক পালটে দিচ্ছে, সেই সামাজিক বাস্তবতার একটা সামগ্রিক ছবি।

সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক'-এ রয়েছে অচল ট্যাক্সি গাড়ীর প্রতি তার মালিকের আশ্চর্য মমত্ববোধ, মানুষ আর যন্ত্র এখানে অভিন্ন সত্তা লাভ করেছে। অর্থাৎ সুবোধ ঘোষ এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাবনাকে ছোট গল্পের জগতে নিয়ে এলেন। ধনতন্ত্রের মালিকের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতে বিশ্বাসঘাতকতার বিদ্রূপময় ছবি আছে তার 'গোত্রান্তর' গল্পে। আবার ভদ্র মধ্যবিত্তের নীতি, আভিজাত্য-বোধ ও সংস্কারকে বিদ্রূপ করা হয়েছে 'পরশুরামের কুঠার' 'সুন্দরম্' ইত্যাদি গল্পে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, বেকারত্ব মানুষের মূল্যবোধকে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে সেটা, তার গল্পগুলোকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়। পতিতাদের জীবন নিয়ে কাহিনী উঠে এসেছে এই সময়কার অন্যান্য লেখকদের গল্পে। সুবোধ ঘোষের পতিতাদের নিয়ে কাহিনীতেও দেখা যায় সেই জীবন থেকে বেড়িয়ে আসার প্রচেষ্টা। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমাজের যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে উত্থান পতন হয়েছিল এটাই সুবোধ ঘোষের গল্পের উপজীব্য। 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পে তিনি নিয়ে এসেছেন অটলনাথের মতো অর্থলোভী মানুষের কথা যারা অর্থের বিনিময়ে মানুষের প্রেম ভালোবাসাকেও ক্রয় করতে চায়। আর অন্যদিকে রয়েছে প্রতাপ বাবুদের মতো ক্ষয়িষ্ণু জমিদার যারা এই সব যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ ধনী হওয়া মানুষের কাছে নিজেদের বিক্রী করতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে মধ্যবিত্ত ভীরুতা।

অগাষ্ট আন্দোলনের সাহসী ভূমিকা সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে গল্প তিনি তির্যক বিদ্রূপে ও সাংকেতিক ভাষায় লিখেছেন যা পাঠকের মনে গভীরে দাগ কাটে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বেঁচে থাকার জন্য লড়াইয়ের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু সুবোধ ঘোষের গল্পে এই বেঁচে থাকার চেষ্টা থাকলেও সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কিভাবে মানুষ তার মূল্যবোধ নীতিবোধ হারিয়ে মৃত মানুষে পরিণত হচ্ছে। একটা বৃহৎ সংকটের মুখে মানুষ যে কতখানি অসহায় সেটাই সুবোধ ঘোষের গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে সময়কাল একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। সেটা সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল। 'সুবোধ ঘোষ এমন একজন গল্প লেখক যার এক একটি গল্পের কৃৎ-কৌশল আমাদের সামনে বহু সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়।'[১৪]

এই তিন শিল্পীর পূর্ববর্তীদের মধ্যে জগদীশ গুপ্তের গল্প উপন্যাসে শরীর বা দৈহিক আকর্ষণ বিষয়ে যে উত্তাপ রয়েছে তা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পঞ্চাঙ্গ' গল্পটিকে মনে পড়িয়ে দেয়, কিন্তু দুজনের ভাবনার কৌশলে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। আবার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মিল রয়েছে যেখানে দুজনেই মনোলোকের জটিলতার বিশ্লেষণে আগ্রহী। কিন্তু তফাৎ হলো মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে দেখেছেন সমাজনীতি, রাজনীতির পরিবর্তমান মূল্যবোধের পটভূমিতে, আর নরেন্দ্রনাথ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষকে বিভিন্ন সম্পর্কে, পারস্পরিক সংঘাত-অর্ন্তসংঘাতে রেখে দেখেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'জীবনের জটিলতার শিল্পরূপায়ণে, ব্যক্তি-মানুষের স্বভাব বিশ্লেষণে মাণিকের

যতোই নির্মোহ নিপুণ শিল্পী।'[১৫] কিন্তু মাণিকের যতো তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি সচেতন শিল্পী নন, বরং ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে ইনট্রোভার্ট - বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে জ্যোতিরিন্দ্রের উত্তরণ, তার ছিল এক ধরণের বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনা, যে সৌন্দর্য সামগ্রিক, নিগূঢ়, সম্পূর্ণ। এই বিশিষ্ট প্রকৃতি চেতনা রয়েছে বিভূতিভূষণের মধ্যে যা ঈশ্বরের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরসৌন্দর্য চেতনায় সঙ্গে এখানেই তার তফাৎ।

তথ্যপঞ্জী

১. ভূদেব চৌধুরী - 'বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার', প্রকাশকাল ১৯৮১, পৃ.৩৬১

২. তদেব, পৃ.৩৭৪

৩. হাসানআজিজুল হক - 'কথাসাহিত্যে বিপরীত স্রোত' (সমরেশ বসু সম্পাদিত জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, প্রকাশ-১৯৯৩, পৃ.২০৪)

৪. সুমিতা চক্রবর্তী - 'ভিন্ন আঙ্গিকের সন্ধানে' (সমরেশ বসু সম্পাদিত, জগদীশ গুপ্ত জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩, পৃ.১৮৫)

৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী - 'জগদীশগুপ্ত ও তার সমকালীন কয়েকজন ঔপন্যাসিক' (সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত, জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩ পৃ.১০৭)

৬. অশ্রুকুমার সিকদার - আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ.৭২-৭৩

৭. তদেব, পৃ.৭৪

৮. তদেব, পৃ.৯৩

৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় - 'ভাঙাবন্দর ও আসল সমুদ্রের গল্প' - দেশ পত্রিকা, ১৯৮৮, ৪ঠা জুন, পৃ.৪৩-৪৮

১০. তদেব, পৃ.৪৩-৪৮

১১. জগদীশ ভট্টাচার্য - 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী', ১৯৯৪, পৃ.২০

১২. তদেব, পৃ.২২

১৩. তদেব, পৃ.৩৭

১৪. সুমিতা চক্রবর্তী - 'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প' দেশ পত্রিকা ১৯৯৫ ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ৯, পৃ.

১৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় - কালের পুতুলিকা, ১৯৯৫, পৃ.৪৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - জীবন ও গল্প
(১৯১২ - ১৯৮৩)

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে সু-মহিমায় অনেক শিল্পীই বিরাজমান, এঁদের মধ্যে কল্লোলোত্তর আধুনিক কালের অন্যতম লেখক হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কেউ তাঁকে ভাবেন শব্দের যাদুকর আবার কেউ কেউ তাঁর রচনায় প্রগতিশীলতা ও মর্বিডিটির মতো বিপরীতধর্মী গুণ খুঁজে পান। তিনি ছোটগল্প-উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই নিজস্বভঙ্গীর স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাংলা দেশের কুমিল্লায় তাঁর মাতুলালয়ে জন্ম হয়। কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে। ঢাকার সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী'তে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামেও একসময় তিনি গল্প লিখেছেন। প্রথম গল্পগ্রন্থ পূর্বাশা প্রকাশন থেকে বের হয়েছিল। ১৯৩৬-এ 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'নদী ও নারী' গল্পটি আলোড়ন - সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৮ সালে দেশ পত্রিকায় তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস 'সূর্যমুখী' প্রকাশিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র কৈশোরে তাঁর পিতার কাছে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি শিখেছিলেন, এই সময় তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনা করেন, পরিচিত মহলে কবি হিসেবে স্বীকৃতি তখন পেলেও কবিতা রচনাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। বাল্যকালে তাঁর সঙ্গী ছিল 'চারু-হারু' 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদার ঝুলি'। কিন্তু এগারো বারো বছর বয়সে তিনি ক্রমশ পরিচিত হলেন রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' 'মাধবীকঙ্কন'। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করতে করতে তিনি ঝর্ণাগুহা বা গিরিবর্ত্ম নিয়ে পরিবেশ কল্পনা করতেন, এবং ছবি আঁকাতে মনোনিবেশ করতেন। চিত্রাঙ্কন বিদ্যাচর্চায় তিনি সঙ্গী হিসেবে পেয়ে

ছিলেন তাঁর ছোটমামাকে, যিনি চিত্রশিল্পে দক্ষ ছিলেন। এই বাল্যকাল থেকেই তিনি প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ আকণ্ঠ পান করতেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। তিতাসের জলে নৌকো-বাইচের সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন না, অনেক বেশী আকর্ষণ বোধ করতেন খেজুর আর তালপালা ছড়ানো একটা শ্যাওড়া গাছের পেছনে লাল টকটকে আকাশের সূর্যাস্ত দেখতে। কৈশোরে সাহিত্য পাঠ আর ছবি আঁকা একত্রেই চলতে থাকে। রমেশচন্দ্রের পর জলধর সেনের রচনাপাঠ করে তিনি যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই উপন্যাসের নায়ক উপীনের মতো তিনি তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা কোন নায়িকাকে খুঁজতে লাগলেন, চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেকে তিনি একাত্ম করে নিতেন। তাঁর এই হাবভাব পিতার উকিল বন্ধুর ভাল লাগত না এবং ছেলের বিষয়ে সতর্ক হতে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রের বাবাকে উপদেশ দেন। পূর্ববাংলার একটি প্রাচীন শিক্ষায়তন অম্বদা-উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের তিনি যখন ছাত্র তখন পরীক্ষার উত্তর পত্রে মেহরকালী বাড়ির মেলায় ভ্রমণ বিষয়ে একটি রচনা লেখেন যা পাঠ করে বাংলা শিক্ষক সাহিত্যরসিক হরেন্দ্র ভট্টাচার্য - উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়েন, সেই সময় আবৃত্তি করে এক খন্ড 'গল্পগুচ্ছ' উপহার পেয়েছিলেন যা পড়ে তিনি মুগ্ধ এবং আবিষ্ট হয়ে যান। প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র ইত্যাদিদের রচনা থেকে তিনি রসাস্বাদ করেছেন। কিন্তু এঁদের রচনার দ্বারা তিনি নিজ রচনার ক্ষেত্রে কখনই প্রভাবিত হননি। তাঁর রচনা এদের থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভিন্ন গোত্রের। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'ই তাঁকে ছোটগল্প লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল। এই বয়ঃসন্ধির মুহূর্তে তিনি মফস্বল শহরগুলি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন হাতে লেখা পত্র-পত্রিকার জন্য ছোটগল্প লিখতে থাকেন। এরই মধ্যে তিনি নবমশ্রেণী থেকে দশমশ্রেণীতে পৌঁছে যান। কৈশোরের প্রচন্ড উদ্দীপনা ও উত্তেজনার ঝোঁকে তিনি এই সময় একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন,

এই পত্রিকায় সংকলিত হয়েছিল একমাত্র তাঁরই লেখা কবিতা গল্প এবং ওঁরই আঁকা ছবি। এই পত্রিকার একটি মাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩০ সালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যখন মাত্র আঠারো বছরের তরুণ তখন কুমিল্লায় যুব সম্মিলন অনুষ্ঠানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন, এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র। এই উপলক্ষ্যে হাতে লেখা একটি পত্রিকা বের করেন সঞ্চয় ভট্টাচার্য। এই পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'অন্তরালে' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়, যার পাশে শরৎচন্দ্র মুহূর্তে প্রশস্তিসূচক মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'কলেজ ম্যাগাজিন'এ এই 'অন্তরালে' গল্পটিই ছাপা হয়েছিল। তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিলায় থাকাকালীন তদানীন্তন বিখ্যাত নেতা ললিত বর্ধনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ সংঘের হাতে লেখা পত্রিকার পরিচালনা করেছেন, এই সময় পর্যাপ্ত পড়াশোনা করেছেন ও নাট্যাভিনয়ে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি অভিনয় করা এবং অভিনয় দেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। প্রথম যৌবনকালে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজ প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে করতেন। এই সময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ঢেউ হাওয়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্র এই সময় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এর ফলে কুমিল্লার জেলে বন্দী থাকেন ছ'মাস এবং পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেন। শিশুকাল থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র অত্যন্ত ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। শৈশবে তাঁর ডাক নাম ছিল 'ধনু'। তাঁর শৈশব থেকেই এই ভাবুক চরিত্রকে পরিবারের কেউ-ই উপলব্ধি করতে পারেননি। যে শহরে তাঁরা থাকতেন সেখানে দুর্গাপ্রতিমা ভাসানের দিন তিতাসের জলে অসংখ্য নৌকো এসে ভিড় করতো। এই বিচিত্র দৃশ্যে আর পাঁচজন শিশুর মতো ভালো পোশাকে তিনি তিতাস নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, কিন্তু কোন আকর্ষণ বোধ করতেন না। কোন্ দৃশ্য কোন্ গন্ধ তাঁকে আকুল করে তুলবে তিনি নিজেও সেটা সর্বদা বুঝতে পারতেন না।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সব ইন্দ্রিয়ের চেয়ে সব থেকে বেশী সক্রিয় ছিল ঘ্রাণেন্দ্রিয়। কবি জীবনানন্দ দাসেরও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর ছিল। এই ইন্দ্রিয় সচেতনতায়, এই দুই শিল্পীর মানসিক নৈকট্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করে জ্যোতিরিন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন যার ছাপ তাঁর বিভিন্ন গল্পে রয়েছে। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় গন্ধের পৌণঃপুনিক উল্লেখ রয়েছে। 'অবসরের গান' কবিতাতে পাওয়া যায় - 'মাঠের ঘাসের গন্ধ', 'শিশিরের ঘ্রাণ', 'শৈশবের ঘ্রাণ', 'রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ', 'ফলন্ত ধানের গন্ধ', 'ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধ', 'রূপসী বাংলা'র একটি কবিতায় গন্ধ-এর অভিনব উল্লেখে জড়িয়ে থাকে রহস্য আর বিস্ময় - 'পাড়াগাঁর দু'পহর ভালোবাসি - রৌদ্রের যেন গন্ধ লেগে আছে । সুপনের', । 'বনলতাসেন'-এর 'ঘাস' কবিতায় কবি 'এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান' করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। এই ইন্দ্রিয় সচেতনতা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছেন 'সব কটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই শৈশব থেকে আমার নাকটা অতিমাত্রায় সজাগ সচেতন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে এই গন্ধ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।'[১] শৈশবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর ঠাকুরদার সঙ্গে প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ভ্রমণে যেতেন। ঠাকুরদার সঙ্গে শহরের শেষ সীমায় রেললাইন পার হয়ে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত দেখতে দেখতে খালের ধারে পৌঁছে যেতেন। পূর্ববাংলা হল নদীনালা খালবিলের দেশ, ভাদ্র মাসের জলে ডোবানো পাটের পচা গন্ধে, অঘ্রানের পাকা ধানের গন্ধে বর্ষার দিনে পুঁটি মৌরালা খলসে মাছের আঁশটে গন্ধে ভোরের বাতাস ভরে উঠতো। সেই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রের মনও বিভোর হতো। এই ঠাকুরদার সঙ্গে তিনি হেলিডি সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে যান, সেখানে তিনি দেখেন সদ্য ফোটা দুটো গোলাপ, ভোরের আলোয় ঝকঝক করছিল একটা সোনালি নীল প্রজাপতি একটা-আধফোটা কলির বোঁটায় চুপ করে বসে

আছে। বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুভব করেছিলেন ভাললাগা কাকে বলে, ভাল দৃষ্টি কী। সেই গোলাপে মৃদুগন্ধ তাঁকে এমন স্পর্শ করেছিল যা তাঁর কাছে এক আশ্চর্য সম্পদ বলে মনে হয়েছিল।

আগেই বলেছি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবনের একটা সময়ে রাজনৈতিক কারণে জেলে বন্দী হন, কিন্তু সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করেও তিনি 'সোনার বাংলা' 'বাংলার বাণী'তে বেশ কিছু গল্প লেখেন। মূলতঃ এই সময় থেকেই তিনি পর্যাপ্ত গল্প লিখতে শুরু করেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা তাঁর ওপর থেকে তুলে নেবার পরই, তিনি চাকরির সন্ধানে কলকাতায় চলে আসেন (১৯৩৭-৩৮)। প্রকৃতিপ্রেমী এই লেখকের চাকরি খোঁজার নেশার থেকে গল্প লেখার নেশাই অধিক পরিমানে ছিল। একটি হোটেলে সেই সময় থাকতেন এবং ছেলে পড়িয়ে যে কুড়ি-বাইশ টাকা রোজগার হতো তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। অধিক রোজগারের আশা তাঁর কোনদিনই ছিল না। সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' কাগজের সম্পাদক তখন ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বেঙ্গল ইমিউনিটিতে তিনমাস হিসাব দপ্তরে কাজ করার সময় প্রচার সচিব প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পরিচয় হয় এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে গল্প লেখাতে উৎসাহ দিতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ' এবং 'নবশক্তি'তে জ্যোতিরিন্দ্রের অনেক গল্প প্রকাশ করেন। সেই সময় 'পূর্বাশা' সাপ্তাহিক এবং 'অগ্রগতি' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যেখানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাব-এডিটরের চাকরী পান এখানে তিনি মাত্র ন'মাস চাকরী করেন। যুগান্তরে চাকরী করা কালীন সময়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তিনটি উল্লেখ-যোগ্য গল্প তিনটি পৃথক পত্রিকায় বের হয়। পূর্বাশায় 'সূর্য' ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নদী ও নারী'(১৯৩৬) এবং 'দেশ' পত্রিকায়-'অনাবৃষ্টি'। 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করার পূর্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টাটা এয়ার ক্রাফটের স্টোর ডিপার্ট-মেন্টে তিন বছর চাকরী করেন। এছাড়াও আংশিক ভাবে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান জে-ওয়াল্টার

এ্যান্ড টমসন্-এ পাঁচ বছর যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য রচনার আকাঙ্ক্ষায় কোথাও তিনি স্থির ভাবে চাকরী করতে পারেননি। তিনি পাঠকদের মনোরঞ্জনের কথা ভেবে লিখতেন না, লেখার নেশাতেই সর্বদা মশগুল থাকতেন। লেখাটাকেই তিনি জীবিকা ভাবতেন। 'তাঁর শরীর ও মন এই দুটিরই সমান টান ছিল সাহিত্যের জন্য। জীবনের অন্য কোন দিকে তিনি কীর্তি স্থাপন করেননি, মনোযোগ দিয়ে সুষ্ঠুভাবে একটানা কোনো চাকরীও করতে পারেননি, তিনি শুধু সাহিত্য-রচনা করে গেছেন।'[২] 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করার পর 'আজাদ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে তিন বছর যুক্ত ছিলেন। ইন্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'মজদুর' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন এবং 'জনসেবক' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এ সব চাকরী-ই ছিল স্বল্পকালীন এবং স্বল্প বেতনের, যা তাঁর দারিদ্র্য ঘোচাতে সক্ষম হয় নি। আর এই কারণে স্বচ্ছল জীবন বলতে যা বোঝায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তা কখনোই পান নি।

আত্মকেন্দ্রিক মানুষ বলতে যা বোঝায় জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন সে ধরণের মানুষ। অবান্তর কথা বলতে তিনি ভালবাসতেন না। 'সাহিত্য ঘটিত এবং জীবনযাপনের যে সব ব্যাপার সাহিত্যের সঙ্গেই জড়িয়ে যায় সেই সম্পর্কেই কথা বলতে ভালোবাসতেন।'[৩] তাঁর সাহিত্য কখনো পুরস্কার পাবে কিনা সে বিষয়ে কখনো চিন্তা ভাবনা করতেন না। যদিও তিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রকৃতিতে ছিলেন শিশুর মতো সরল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এই মানুষই, মানুষের মনের অত্যন্ত জটিল কামনা-বাসনা হিংসা ঘৃণার কথা লিখেছেন সুনিপুন ভাবে। তিনি ছিলেন একজন নিসর্গ প্রেমিক শিল্পী। পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় চলে আসার পর আজীবন সেখানেই ছিলেন, কিন্তু এই শহরের জনকোলাহল তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি নির্জন বারান্দায় বসে ঋতুবৈচিত্র্যের - রূপমাধুরী উপভোগ করতে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন পাখিদের

কাকলি, উদ্ভিদের বিস্ময়কর বিকাশ। রৌদ্র, বর্ষা ও জ্যোৎস্নায় তিনি বিভোর হতেন। উন্মাদনা, উত্তেজনার চেয়ে মনঃসমীক্ষন ও বিশ্লেষণই তার গল্পে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি নিজেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত শিল্পীতে পরিণত করেছিলেন। কলকাতার উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়েও পাঠক মহলে অসাধারন্য জনপ্রিয়তা কখনোই অর্জন করতে পারেননি।

জ্যোতিরিন্দ্র যেমন নিসর্গের নির্জনতা উপভোগ করতেন, সেরকম বই পড়তে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। দেশি বিদেশী সবরকম সাহিত্যই পাঠ করতেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি কী হচ্ছে সেটা জানার জন্য প্রচুর বিদেশী বই পড়তেন। আবার সমানভাবেই বাংলা সাহিত্যের বয়ঃকনিষ্ঠ লেখকদের লেখা অত্যন্ত মন-যোগ সহকারে পড়তেন। নতুনকালের নতুন লেখকদের স্পন্দনকে তিনি স্পর্শ করতে চাইতেন। মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর তিনি কাফ্কার প্রচুর রচনা পড়েছিলেন, আর সেজন্যই হয়তো শেষ জীবনের লেখাতে বিমূর্ত ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়াও স্টেইনবেকের চেতনার সঙ্গে তার মানসিক সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। স্টেইনবেকের 'প্যাশ্চার্স অফ হেভেন' দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তার 'সূর্যমুখী' উপন্যাসে এর কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমারসেট মম-এর 'রেন' ও 'রেড' পড়ে তিনি তৃপ্ত হতেন। হেমিংওয়ের 'মেন উইদাউট উইমেন' বইটির প্রতিও তার অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল, সেই সঙ্গে এইচ·ই·বেটস-এর গল্প তাঁর প্রিয় ছিল। তবে স্টেইন-বেকের রচনায় কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা অবাধ যৌন আবেগ- ইত্যাদির সমাবেশ দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও এই কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, যৌন আবেগ দেখা যায়, কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে তার রচনায় কোথায় যেন একটা সৌন্দর্য নির্জনতা, নিসঙ্গতাকে উপলব্ধি করা যায়, যা একেবারে মৌলিক, যা এইসব বিদেশী লেখকের গল্পে একেবারেই দুর্লভ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনেক সময় গল্প রচনার পূর্বেই সেই গল্পের বর্ণনা করতেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন এই ভাবে -

> তার পর বুঝলে, দুবন্ধু গেল পুরীতে ... একটা বাসা ভাড়া করে রইলো, বুঝলে রাত্রে মেয়েটা বুঝলে তারপর মেয়েটা তো খুন হয়ে গেল বুঝলে, তখন পাশের ঝাউবনে সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, বালির মধ্যে ঝাউ গাছগুলোর পাতায়। মেয়েটার খুন হওয়ার ব্যাপারে তিনি সামান্য গুরুত্বও দিলেন না, কিন্তু পাশের ঝাউ বনের সাঁ সাঁ ঝড়ের বর্ণনায় তার অদ্ভুত উত্তেজনা দেখা গেল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি ঝড়ের আন্দোলন বোঝাতে লাগলেন। তার চোখ মুখ তখন একেবারে পাল্টে গেছে, যেন তিনিই সেই ঝড়ের মধ্যে পড়েছেন। [৪]

পূর্ববঙ্গ থেকে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসার পর আর কখনো কুমিল্লায় ফেরেন নি। কলকাতার এক মেসের ক্ষুদ্র পরিসরে দীর্ঘদিন বাস করেছেন। এর পর স্থান বদলও করেছেন কয়েকবার। কলকাতায় কখনো তিনি বেলেঘাটার বস্তি কখনো বাগমারিরোডের ভাড়াবাড়িতে দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। আবার শেষ জীবন তিনতলার সরকারী ফ্ল্যাটের ক্ষুদ্র পরিসরেও দিন কাটিয়েছেন। সর্বত্রই তাঁর সঙ্গী ছিল নির্জনতা, অন্তর্মুখতা। তিনি কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকতেই বেশী ভালবাসতেন। রাজনৈতিক কোলাহল তাকে আকর্ষণ করতো না, বরং বৃষ্টির শব্দ শুনতে তিনি অধিক আকর্ষণ বোধ করতেন। কলকাতায় সুদীর্ঘকাল বাস করেও এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখার জন্য তার কোনরকম আগ্রহ ছিলনা। সারাজীবনে তিনি পুরী,

দীঘা, কাশী গয়া শিমুলতলা ও ঘাটশীলায় ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু তার ধারনা ছিল দেশভ্রমণ না করলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় না। এবং গল্প উপন্যাস রচনার জন্য এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছেন - একটি ছোট সংবাদপত্র অফিসে (জনসেবক) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সুনীল গাঙ্গুলী কাজ করতেন কিছুদিন। সেখানে কমলকুমার মজুমদার মাঝে মাঝে আসতেন। এখানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে কমলকুমারের সাক্ষাৎ ঘটে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন -

> ... ওদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল ওঁরা কেউই কারুর কোনো লেখা পড়েননি। ... যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বললেন - বুঝলেন কমলবাবু লেখার জন্য অনেক অভিজ্ঞতার দরকার অনেক দেশ ও মানুষ দেখা দরকার বুঝলেন, অনেক জায়গায় যাওয়া দরকার বুঝলেন, এমনি এমনি কি হয় ? কমলকুমার মজুমদার গম্ভীরভাবে বললেন আমার কিন্তু তা মনে হয় না, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু অভিজ্ঞতার জন্য তো ঘোরাঘুরির কোনো দরকার নেই। সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাওয়া যায় গ্রন্থের মধ্যে মানুষের মনীষার যা কিছু সবই তো গ্রন্থের মধ্যে আছে, অভিজ্ঞতার জন্য বাইরে তাকাবার কোনো মানে হয় না। অথচ লক্ষ্য করার বিষয় হল কমলকুমার সেই সময় ছিলেন ডাকাবুকো ধাতের অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন লাজুক স্বভাবের ঘরকুনো একা চোরা ধরনের মানুষ।[৫]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবনের একটা সময়ে বেলেঘাটা, ট্যাংরা ইত্যাদির বস্তি অঞ্চলেও দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়েছেন। যা তিনি বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে (১৯৫৫)। বস্তিজীবনের পটভূমিতে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাস এক সময় পাঠক মহলে চমক সৃষ্টি করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্র সে ধরনের চমক সৃষ্টি করেননি, কিন্তু চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের অবক্ষয়ের এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে রয়েছে এই উপন্যাস। বস্তিজীবনে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই প্রেক্ষিতে একটা সময়কে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন - যে সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিশেহারা, পারিবারিক জীবনে তারা মেনে নিচ্ছে সব অন্যায়কে। মানুষ এই সময়ে অর্থনৈতিক নিয়ম নিয়তি শাসিত হয়ে ভেসে যেতে বাধ্য হচ্ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই অন্ধকারে নির্মোহ এক চিত্রকর।'[৬] মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র আঁকতে গিয়েই জ্যোতিরিন্দ্র সার্থক শিল্পী হয়ে উঠেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন -

> আমি তো মধ্যবিত্ত মানুষ, কাজেই এই জীবনের সঙ্গে যতটা পরিচয় অন্য জীবনের সঙ্গে আমার ততটা পরিচয় নেই। কাজেই এখানে আমি যতটা দেখতে পাই শুনতে পাই ততটা অন্যজীবনে নয়। আর এটা তো ডেকাডেন্স, অবক্ষয়েরই যুগ।[৭]

এই অবক্ষয়ের চিত্র তার উপন্যাস ও গল্পে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু একমাত্র অবক্ষয়কেই তিনি অবলম্বন করেন নি। বিভিন্ন বিষয়কেই তিনি তার গল্প রচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। এক সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখায় মর্বিডিটির অভিযোগ ছিল, যদিও তিনি তার কোন গল্পের বিরূপ সমালোচনায় উত্তেজিত হতেন না, কিন্তু মনে মনে হয়তো আহত হতেন। তাঁর 'সোনার চাঁদ' গল্প সম্পর্কে পাঠক মহলে এক ধরণের সমালোচনার ঝড় উঠেছিল কিন্তু এ সবে তিনি উত্তেজিত না হয়ে মুখে চাপা হাসি এনে বলতেন -

> ... তবেই, বুঝে দেখুন ব্যাপার। ধেৎ। ছাড়ুন ওদের কথা, যা খেয়াল হয় লিখি। আবার কখনো দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন - বই যদি সে রকম বিক্রি না হয় তাহলে লেখার তেজও কমে যায়।[৮]

শেষ জীবনে তিনি তিনজলা সরকারী ছোট ফ্ল্যাট বাড়িতেই কাটিয়েছেন তার স্ত্রী পারুলনন্দী ও পুত্র তীর্থঙ্কর নন্দীর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী পারুল নন্দী সেতার বাজাতেন, এটা তাঁর পুত্রের কাছ থেকেই জানা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গৃহেও একেবারেই নিরাভরণ ভাবে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত ঘরে থাকতো 'একটি বুক শেলফ্ ছোট একটি টেবিল চেয়ার, ইতস্তত: ছড়ানো কিছু পত্র পত্রিকা।'[৯] সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একজন লেখক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন 'একটি বুক-শেলফ্ ছাড়া একজন লেখকের ঘরে আর কোন সম্পদ থাকতে পারে না।' বাস্তবিক জ্যোতিরিন্দ্র একজন প্রকৃত লেখকের মতো জীবন কাটাতেন। তাঁর ৬৭ বছর বয়সেও ভাবতেন কী করে আরও আরও একটা ভালো গল্প লেখা যায়। সারা জীবন ধরে তিনি অর্থ নয়, কীর্তি নয়, শুধু ভেবেছেন সাহিত্যের কথা, সাহিত্যের উপজীব্য মানুষের কথা। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এটা প্রচারের যুগ, যে প্রচার তাকে নিয়ে হয় নি। কিন্তু তিনি প্রচারে প্রত্যাশী ছিলেন না। তাঁর মতো দু-একজন পাঠকও যদি তার লেখাকে সার্থক বলে মনে করে, সেখানেই তিনি সন্তুষ্ট। তাঁর লেখা যে বাজারে কাটতি নেই সেটা তিনি জানতেন। এই জনপ্রিয় না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি সেভাবে কোন ব্যাখ্যাও খুঁজে পাবার চেষ্টা করেননি। কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন শিল্পী। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে তিনি পেটের গোলমাল সারাতে কোনো একটি এ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছিলেন যার ফলে তার চোখের জ্যোতি ক্রমশই নিবে আসছিল।[১০] কিন্তু তখনও অনেকগুলি গল্পের প্লট তার মাথায় ছিল।

তিনি ভেবেছিলেন টেপ রেকর্ডারের সাহায্য নিয়ে সেই সব গল্পের কাজ শেষ করবেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবন কাটিয়েছেন নিরাভরণ ভাবে, দুঃখ, দারিদ্র্য তাকে পরিত্যাগ করেনি, এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনেকটাই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, মৃত্যুর সময়েও তিনি পৃথিবীর মায়াকে অতিক্রম করেছেন একেবারেই নিরাভরণ ভাবে। মৃত্যুর সময় বা তার অন্তিম সংস্কারের সময় হাতে গোনা ক-জন মানুষ ছাড়া বিশেষ কেইই ছিলেন না, অত্যন্ত সাধারণভাবেই তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।'[১১] আধুনিক কালের কবি সুব্রতরুদ্র এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তার একটি কবিতায় - কবিতার নাম 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যখন যাচ্ছেন' নিচে তা উল্লেখ করা হল -

স্রেফ একদম একা
সৎকার সমিতির গাড়ি চড়ে বাক্সবন্দী
পৌঁছলে কেওড়াতলায়,
মুখে আগুন পেলে, একটা ফুলের মালা পর্যন্ত না
কেউ আসে নি, তোমার কোনো
বন্ধু তোমায় দেখতে এলো না
খাঁ খাঁ করছে শ্মশান
এই তার পুরস্কার।[১২]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোট গল্প
(১৯৩৬ - ১৯৮২)

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় প্রকৃতির লেখক। কিন্তু তার অনেকটা পরবর্তীকালের লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সম্পর্কে বলা হয় না। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যেও রয়েছে এক বিশিষ্ট প্রকৃতি চেতনা। যা তিনি তার গল্পগুলির মধ্যেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর যে সব গল্পগুলি তাঁকে 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী' হিসেবেই পাঠকমহলে পরিচিত করিয়ে দেয় সেগুলি সবই প্রকৃতি নির্ভর যেমন 'বনের রাজা'(১৯৫৯) 'শিরশিটি' - 'সামনে চামেলি' ইত্যাদি গল্প। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিকে সময়ের দিক দিয়ে তিনটি পর্বে বিভাজন করা যেতে পারে প্রথম পর্ব হলো ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ 'সূর্যমুখী' তার প্রথম উপন্যাস লেখার সময় পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ - এ সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় বা শেষ পর্ব ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ অর্থাৎ তার মৃত্যু পর্যন্ত। বিভূতি-ভূষণের প্রকৃতির বর্ণনায় রয়েছে শিশুর মুগ্ধতা। জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে এই শিশুর মুগ্ধতা না থাকলেও শহরের জীবনে আমাদের আশে পাশে যে প্রকৃতি যেমন একটা ছোট জঙ্গল বা নিরালা পুকুর অথবা কুয়োতলার সবুজ-শ্যাওলা আর আগাছা - তাদের গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ নিয়ে সজীব হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রকৃতির মধ্যে এসে কখনো কখনো আপাত নিরীহ মানুষের মনেও হত্যার ইচ্ছে জাগতে পারে, মানুষের আদিম প্রকৃতি মাথা চারা দিয়ে উঠতে পারে, মানুষ হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর - তাকেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন গল্পের মধ্যে।

প্রথম পর্ব (১৯৩০-১৯৪৮)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম গল্প বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত ১৯৩০ সালে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নদী ও নারী' গল্পটি প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে আলোড়ন

সৃষ্টি হয়। আবার তাঁর প্রথম উপন্যাস হলো 'সূর্যমুখী'(১৯৪৮)। এই উপন্যাস লেখায় হাত দেবার আগে তিনি অনেক গল্প লিখেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'পালিশ', 'মঙ্গলগ্রহ', 'কমরেড', 'বধিরা', 'শালিক কি চড়ুই', 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি', 'বনানীর প্রেম', রাইচরণের বাবরি' ইত্যাদি। তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রকৃতি ও নারী পরস্পরের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে উঠে এসেছে। এই নারীকে প্রকৃতির মধ্যে রেখে তার মন বিশ্লেষণ করেছেন 'নদী ও নারী' গল্পে। এই গল্পের নায়িকা আধুনিকা তরুণী, হলুদ - ছোপ দেওয়া শাড়িতে সে যেন সত্যিই একটা চিতা বাঘিনী। পদ্মার চরে বেড়াতে গিয়ে সুরপতি-নির্মলা এই রহস্যময়ী নারীকে এক দেহোজীবীনী ভেবে নেয়। কিন্তু নিজেদের কৌতূহলের বসেই অবশেষে তারা জানতে পারে এই নারী তার রোগগ্রস্থ, বিকলাঙ্গ স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসকের নির্দেশে বছরের পর বছর নদী-বক্ষে দিনযাপন করছে প্রাচীনকালের বেহুলার মতো। নদী যেমন যাবতীয় আবর্জনাকে নিয়ে নিজের গতিতে বয়ে চলে, এই নারীও জীবনের যাবতীয় দুঃখকে নিয়ে চলেছে অনির্দেশের দিকে।

আবার মানুষের নিজস্ব দেহগত সৌন্দর্য নিয়ে মনোবিশ্লেষণ দেখা যায় 'রাইচরণের বাবরি'(১৯৩৬-দেশ, তৃতীয় সংখ্যা) গল্পে। এই গল্পে দেখা যায় রাই-চরণ তার মাথার কুঞ্চিত কালো কেশ রাশিকে জীবনের যে কোন বস্তু বা বিষয় থেকে অধিক গুরুত্ব দেয়। এই কেশরাশির বিচিত্র বর্ণনা গল্পটির মূল লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে সহায়তা করেছে। অবশেষে যাত্রাদলে রাইচরণ ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পায় তার এই কেশরাশির জন্যই উপযুক্ত পারিশ্রমীকে, কিন্তু দর্শকেরা তার এই অতি যত্নের পরম আদরের কেশরাশিকে যদি নকল বলে ভাবে এই চিন্তায় সে যাত্রার দলের চাকুরী ত্যাগ করে। নিজ দেহের বিশেষ অংশের সৌন্দর্য সম্পর্কে এই

যমতা, অনুভূতি বা বলা যায় এক ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতা গল্পটিকে অন্য যাত্রা দিয়েছে। সৌন্দর্য যে নির্দিষ্ট কোন বস্তু বিশেষের মধ্যে নেই তা রয়ে যায় দেখার চোখে সেটা এই গল্পেই লেখক বুঝিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রের এই পর্বের গল্পে ইঙ্গিতময়তা, মানুষের মনের সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতি নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন 'শালিক কি চড়ুই' গল্পে দেখা যায় হীনমন্যতাবোধে জর্জর এক নিম্নবিত্ত মানুষকে। এ গল্পকে যদি এক দরিদ্র কেরাণীর সৈরিনী স্ত্রীর নিছক যথ্যাহ্ন-রতি বিলাসের গল্প বলে ভাবা হয় তবে সেটা ভুল হবে। প্রকৃত পক্ষে লেখক নিঃশব্দে সমাজের যে অবক্ষয় ঘটছে, সে দিকটিকেই উন্মোচিত করেছেন। বিত্তবান পাত্রে কন্যাকে দিয়ে তার করুণ পরিণতি সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়েই মেয়ের বাবা মেয়েকে সৎ কর্মঠ, দরিদ্র অথচ উদার কেরাণীর হাতে সমর্পণ করে। এই কেরানী নিজের উদার দৃষ্টি-ভঙ্গীতেই তার স্ত্রীকে সরল নিষ্পাপ মনে করতো সে ভাবত এই স্ত্রীর নিঃসঙ্গ দুপুর কাটে চৌবাচ্চার ধারে এটো ভাত খেতে আসা চড়ুইদের সঙ্গে। কিন্তু একদিন সে আবিষ্কার করে মানুষরূপী শালিকের অর্থাৎ পল্লবসেনের আনাগোনা ঘটছে তার গৃহে তার অনুপস্থিতিতে। সে বোঝে পদ্ম-পুকুর রোডের মেয়েদের রঙ বদলায় কিন্তু রক্ত বদলায় না। আর তাই এই দরদ্রি কেরানী অসহায় ভাবে শ্লেষের সুরে বলে 'কে জানে কাল আবার কি আসে, শালিক না চড়ুই'। একটা তীব্র তিক্ততায় বুকের জ্বালা নিয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এই গরীব কেরানী। এ রকমই আর এক হত দরিদ্র কেরানীকে দেখতে পাওয়া যায় 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে। 'বারোঘর এক উঠোন' সম্পর্কে পাঠকদের একটা অনুযোগ উঠেছিল, উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্র লিখেছিলেন -

> আলো দেখাবার জন্য উত্তরন দেখাবার জন্য আমি এ বই লিখিনি। বিপথ-বিপর্যস্ত অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কোনো রকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে, কতটা নিচে নেমে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি।[১৩]

তার এই মন্তব্য তার গল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মঙ্গলগ্রহ আমাদের কাছে লালরঙের রহস্যময় এক অচেনা জগৎ অথচ তা মানুষকে প্রতিনিয়তই আকর্ষণ করছে। এ গল্পেও রয়েছে দরিদ্র এক প্রৌঢ় কেরানী, যে তার প্রতিবেশিনী উচ্চবিত্ত সুন্দরী রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙের আলোর মতো এই রমণীর ঘরটিও দরিদ্র প্রৌঢ় কেরানীর কাছে রঙিন, রহস্যময় মনে হয়। এই প্রৌঢ় কেরানী জীবন থেকে পেয়েছে শুধু রোগগ্রস্থ পঙ্গুস্ত্রী চরম দারিদ্র্য আর অপ্রয়োজনীয় সন্তান। কিন্তু উচ্চবিত্ত এই রমনী তার ইঞ্জিনীয়র স্বামীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে নিজ যৌবনের মরীচিকা দেখিয়ে সংসারের বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেয় বিনা পারিশ্রমীকে। গল্পের শেষে দেখা যায় এই দরিদ্র কেরানী নিজের স্থান এই উচ্চবিত্ত রমনীর কাছে কোন স্তরে সেটা অনুভব করে, আর এক দুর্বিসহ লজ্জা, ঘৃণা জন্মে তার নিজের ওপরেই। একটা তীব্র শ্লেষ জড়িয়ে আছে সমস্ত গল্পটিকে ঘিরে। এ গল্প শুধুমাত্র লাল আলোর যৌন-সংকেতে তথাকথিত এক শিক্ষিতা রমনীর আকর্ষণে প্রৌঢ় এক পুরুষের ঝিমন্ত লিবিডো জেগে ওঠার গল্প নয়। এ-ও এক অবক্ষয়েরই গল্প। এ গল্পে নির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ নেই। গল্পের পুরো মাধুর্য ধরা হয়েছে এর সমাপ্তিতে।

এই পর্বের অন্যতম গল্প হল 'পালিশ'(পূর্বাশা পত্রিকা)। জ্যোতিরিন্দ্র তার গল্পে কখনো কোন প্রতিবাদের উচ্চারণ তোলেন নি এবং এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার সৃষ্ট 'লোকগুলোই কোন প্রতিবাদ করেনা ওরা শুধু মেনে নেয়। চরিত্রগুলোকে নিখুঁত ও জীবন্ত করার জন্যই প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিনি।' সমাজের শোষণ, দুর্নীতি, অত্যাচারে, অধঃপতনকে তিনি তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন। 'পালিশ' গল্পটিতে রয়েছে জুতো পালিশ করার একটি ছেলের গল্প। আবার বেকার ছেলেদের নিয়ে লিখেছেন 'লাইনের ধারে' গল্প, যারা চুরি, ছিনতাই করেই জীবন

চালায়, এর মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকে। 'পালিশ'(পূর্বাশা) গল্পে দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠছে। সারাদিন জুতো পালিশ করে যার দিন চলে সেই কিশোর মন্নু উত্তেজনায় বলে 'লাল ঝান্ডা উঁচু রাখব, বস্তি ছাড়ব না।' - এ গল্পটি জ্যোতিরিন্দ্রের ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮এর মধ্যে লেখা। এই সময় রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলন জোড়দার হয়ে উঠছে। কিন্তু গল্পে একটা প্রতিবাদের সম্ভাবনা থাকলেও সেটাই গল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে ওঠে নি। লেখক দেখিয়েছেন সমাজের এই সব মানুষেরা কুকুরের পাশে শুয়েই রাত কাটায়। ঘর থাকলেও তা এই কিশোরকে ক্লান্তির সময় - হাতছানি দিয়ে ডাকে না। একটা তিক্ত শ্লেষ, তিক্ত অভিমান নিয়ে এরা বেঁচে থাকে। লেখক তার ক্যামেরার লেন্সকে জুম্ করেছেন কিশোরটির মনের ভেতরে। তাই দেখা যায় গল্পে সব প্রতিবাদ ছাপিয়েও বড় হয়ে ওঠে তার মনের দিকটি। সে ক্রমশ আর কোন সভার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না। নিম্নজীবনযাত্রায় আবার সে মনযোগ সহকারে পালিশের কাজ করে এবং তার মনের যে আকাঙ্খা সেটা হল 'বাঙালি জেনানা খুপ সুরুত।' 'আমি বাঙালনি শাদি করব।' এই কিশোরটির মা'ও ছিল বাঙালী কিন্তু সেই মা অধিক সুখের জন্য এই শিশুপুত্রকে ফেলে রেখে করিম মিঞার সঙ্গে চলে যায়। তার বাবাও তার বাঙালী মায়ের রূপ দেখেই বিয়ে করেছিল। অর্থাৎ শিশুকাল থেকেই এই ছেলেটি বঞ্চনার মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, পরিবারের অত্যন্ত নিকট জনের কাছ থেকে সে কিছু পায় না, তাই সমাজের কাছ থেকেও কিছু পাবার আর প্রত্যাশা সে করে না। এই ছেলেটি তার বাবা মায়ের স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেই সম্পর্কগুলো দাঁড়িয়ে থাকে অসহায়তা নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্র কোন প্রতিবাদ নয় মানুষের এই অসহায়তার কথাই বলতে চেয়েছেন। তার পূর্বসূরী প্রেমেন্দ্রমিত্রের 'মহানগর' 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' ইত্যাদি গল্পেও এ

অসহায়তা দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের ভাষার মধ্যে বিভিন্নভাবে শ্লেষের প্রয়োগ দেখা যায়। ধীমান দাশগুপ্ত বলেছিলেন যে তাঁর গল্পে যেগুলি প্যাশন বলে মনে হয় সেখানেও আসলে শ্লেষই বেশি। 'বর্ণনায় সংলাপেও উপমা নির্বাচনে এই শ্লেষ তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[১৪] এই শ্লেষই চিনিয়ে দেয় লেখক হিসেবে তাঁর সমর্থন কোন্ দিকে। মানুষের চিরন্তন জৈবতায় তার শুধু সমর্থন নয়, সমর্থন রয়েছে জৈবতার দিকে নিক্ষিপ্ত চিরন্তন তিরস্কারে।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫০-১৯৭১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকৃতি চেতনা যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমন ভাবে আবার স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঙালী জীবনে যে বিভিন্ন সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছিল তারও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু লেখক কখনোই সেই সব সমস্যা সমাধান বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেননি। এই সব সংকটময় অবস্থায় মানুষেরা কেমন ভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থান করছে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনন্দীর প্রথম পর্যায়ের গল্পের রেশ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়ে গেছে। তার পূর্ববর্তী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ - এঁদের গল্পেও মানুষের এই সংকটময় জীবনের কথা রয়েছে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই পর্বের কিছু গল্পে, মানুষেরা এই সংকটময় অবস্থা থেকে একটা অন্য যাত্রা পেয়ে যায়। অর্থাৎ সংকটের কথা থাকলেও জ্যোতিরিন্দ্রের নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য - প্রকৃতির রূপ, সৌন্দর্য বর্ণনা, চিত্ররূপময়তা ইত্যাদি গল্পগুলোতে রয়ে যায়। এই পর্যায়ের অন্যতম গল্প হল 'জ্বালা'(১৯৫৮)। এ গল্পের শুরু হয়েছে এমন একটা প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে যা পাঠক মনেও জ্যৈষ্ঠের দাবদাহের স্পর্শ এনে দেয়। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়েই লেখক গল্পের একটা ভয়ংকর জ্বালাধরা পরিস্থিতিকে আগাম

ঘোষণা করে দেন। নীরার মনে শুধু প্রকৃতিই জ্বালা ধরায় না, এক ভয়ংকর মানুষও নীরার মনে দাবদাহ সৃষ্টি করে, কারণ এই শানওয়ালা তার দৃষ্টিতে যেমন আগুন ধরায় তেমনি তাকে ভয়ংকর করে তোলে তার বিকট অস্ত্র, ধারাল যন্ত্রপাতি। এই মানুষটি নীরার কাছে আরো ভয়ংকর আরো আতঙ্কের হয়ে ওঠে যখন জানা যায় যে - অভাবের তাড়নায় সে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে, এবং এই হত্যার জ্বালা বুকে নিয়ে সে অস্ত্র শান দেওয়াকে জীবিকা করে পথে বের হয়েছে। অভাবের রূঢ় বাস্তব ছবি এখানে রয়েছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে নীরার মনের বিদ্বেষজাত জ্বালা, শানওয়ালার মনের হত্যার জ্বালা, জ্যৈষ্ঠের দুপুরের জ্বালা ধরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই গল্পের আদি এবং অন্তে রয়েছে দুটি নারী-পুরুষের মনের জ্বালা ধরা অনুভূতি। এই অনুভূতিকে লেখক স্থাপন করেছেন জ্বালাধরা জ্যৈষ্ঠের দুপুরের প্রাকৃতিক পটভূমিতে। এ গল্পেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যে বৈশিষ্ট্য চিত্ররূপময়তা, সেটা লক্ষ্য করা যায় যেমন -

> ... কেউ তাকায়, দেখবে ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পুরনো একটা
> শ্যাওড়া গাছের সামনে একটা টগর ফুলের কুড়ি দাঁড়িয়ে আছে,
> কুড়ির পিছনে এত বড় একটা লাল টগর।

অথবা,

> জ্যৈষ্ঠ দুপুরের প্রতপ্ত আকাশের নিচে দাঁড়ানো ঐ পুরানো
> জীর্ণ গাছ আর দুটি তাজা ফুল ...

এখানে শানওয়ালা মানুষটির সামনে ছোট পিন্টুরানী ও তার মা'র দাড়িয়ে থাকাকে লেখক অপূর্ব ভাষা কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় এক্ষেত্রে লেখক মানুষকে পরিচিত করছেন গাছ, ফুল ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে। শানওয়ালা পাঠক মনে দৃশ্যায়িত হচ্ছে 'ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পুরনো একটা শ্যাওড়া গাছ' দিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্র

এই মানুষটির ছবি পাঠক মনে গেঁথে দেবার জন্য গল্পের একই পরিচ্ছেদে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেছেন 'জ্যেষ্ঠ দুপুরের প্রতপ্ত আকাশের নিচে দাঁড়ানো ঐ পুরানো জীর্ণ গাছ'। এ গল্পে পুরানো জীর্ণ গাছ আর শানওয়ালা মিলে একাকার হয়ে গেছে। এ গল্পে রয়েছে একটি মাত্র দুপুরের ঘটনা, যেখানে খুব সংক্ষেপেই লেখক জানিয়ে দেন মানুষের স্বভাবের অসহায়তার কথা।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে বিত্তহীন মানুষেরা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ভাবে। এই পর্বের অন্যতম গল্প 'তারিনীর বাড়ি বদল' - গল্পে নিঃস্ব রিক্ত এক মানুষের দেখা মেলে। এ গল্পের তারিনী কলকাতা শহরের বস্তিবাসী মানুষেরই প্রতিনিধি। এই তারিনী সমস্ত রকম অভাব ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ অপমানকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল, আর এই বাঁচার প্রচেষ্টাতেই শেষ বারের মতো জ্বলে উঠতে গিয়ে, নিভে গেল চিরদিনের মতো। এ মৃত্যু কোন মহান মৃত্যু নয়, এক এ সর্বগ্রাসী রিক্ততা জড়িয়ে আছে, যার সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। লেখক এ গল্প সম্পর্কে বলেছেন 'পূর্বাশায় তারিনীর বাড়ি বদল' বলে আমার একটা গল্প বেরোয়। আমি চিন্তা করে দেখেছি 'বার ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের বীজ কয়েক বছর আগে লেখা ঐ গল্পের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।'[১৫] ১৯৫৫তে 'বারো ঘর এক উঠান' লেখা হয়, কাজেই ১৯৫৫-র কিছু আগেই 'তারিনীর বাড়ি বদল' গল্পটি লেখা হয়। একই রকম অভাব অনটনের গল্প এই পর্বের 'বুটকি ছুটকি'(১৯৫২)। এই গল্পটি প্রসঙ্গে লেখক তার ঘ্রানেন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন - যে, তাদের বাসার কাছেই ছিল ভুবন পন্ডিতের বাসা। সেই বাসায় রান্নাঘরের পিছনে বাতাবি লেবুর লোভে যখন যেতেন তখন পন্ডিতের দুই মেয়ে বড়বুড়ি ও যমুনার গায়ে পেতেন বাদ্‌লা দিনে মাটির খোলায় কাঁঠাল বিচি ভাজার গন্ধ। কৈশোরের সেই গন্ধের স্মৃতি তাকে দিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে 'বুটকি ছুটকি' গল্প লিখিয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে অভাব অনটন, অসহায়তাকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে প্রায় সর্বত্রই প্রকৃতি। এই পর্বের অন্য গল্পগুলির থেকে কিছুটা ভিন্ন জাতের গল্প হলো 'বনের রাজা'(১৯৫৯)। এই গল্প সম্পূর্ণ রূপেই প্রকৃতি নির্ভর। এখানে প্রকৃতি তার রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই গল্পের মধ্যে লেখকের শৈশবের স্মৃতিকেও ধরা যায়। লেখককে দিয়ে কৈশোরের গন্ধের স্মৃতি যেমন করে 'বুটকি ছুটকি' গল্প লিখিয়েছিল। শৈশবের তার নিত্যসঙ্গী দীর্ঘায়ু ঠাকুরদার গায়ের পাকা আমের গন্ধ, ফুলের গন্ধ তাকে দিয়ে 'বনের রাজা' গল্প লিখিয়েছিল। এ গল্পে প্রকৃতির থেকে . . . সরাসরি রস আস্বাদন করছে ষাট বছর বয়সের দাদু সারদা, কিন্তু তার দৃশ্য দেখছে এবং উপভোগ করছে ছোট্ট দশ বছরের নাতি যতি। এই যতির চোখ দিয়েই লেখক প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকা মানুষ আর কৃত্রিম শহরকেন্দ্রিক মানুষের জীবনের তুলনা করেছেন। ক্রমশ এই বৃদ্ধ মানুষটি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে প্রকৃতির সামনে উলঙ্গ হয়ে যায়, এই নগ্নতা যতির ভাল লাগে। পুকুর থেকে উঠে আসা সদ্যস্নাত দাদুকে তার বহু প্রাচীন গাছ বলে মনে হয়, যার গায়ে যতি পায় শাপলাফুলের মিষ্টি মদির গন্ধ। এখানেও প্রকৃতি আর মানুষ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের ঔপন্যাসিক ডি•এইচ•লরেন্স নগ্নতা, যৌনতা সম্পর্কে প্রাচীনপন্থীদের ধারনাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করেছেন, এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার 'Sons and Lovers' উপন্যাসে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও লরেন্সের মতো নরনারীর শরীর, নগ্নতা, যৌনতা বিষয়ে সমস্ত রকম জড়তাকে কাটিয়ে উঠেছিলেন।

এ পর্বের গল্পে দেখা যায় মানুষ কখনো কখনো তার ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে, প্রাকৃতিক সত্তা লাভ করছে যেমন 'বনের রাজা' গল্পের সারদা যতির কাছে 'গাছ' হয়ে যায়। আবার প্রকৃতি পার্সোনিফায়েড হয়েছে কোন কোন গল্পে, যেমন 'বৃষ্টির পরে'

অথবা 'গাছ' ইত্যাদি গল্পে। 'গাছ' গল্পে লেখক প্রতীকী ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ গল্পে 'গাছ'কে জ্যোতিরিন্দ নন্দী একটি বিশেষ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এবং গল্পের শেষে দেখা যায় - 'গাছ চোখ বুঝল, তার ঘুম পেয়েছে, গাছও ঘুমায়, কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমাতে পারেনি। ... গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।'[১৬] আবার এই প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়জ তৃপ্তি দিয়েছে 'শিরশিটি' গল্পে মায়াকে, 'সেখানে কুয়োতলার নির্জনতা ও নৈঃশব্দ যেন হয়ে উঠেছে দেহের আরাম। আর সেখানে আছে এক প্রতিবেশী বৃদ্ধ, যে শারিরীকভাবে অশক্ত কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রূপাকাঙ্ক্ষা তীব্র। সমগ্র পরিমন্ডলের সঙ্গে মায়ার রূপও সে উপভোগ করে, চোখ দিয়ে, শ্রুতি ও ঘ্রান দিয়ে নৈকট্যের তাপ দিয়ে - কেবল স্পর্শ করে না। এই রূপময় ইন্দ্রিয়ভোগের গল্প 'শিরশিটি'।[১৭] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন -

> 'শিরশিটি' গল্পে বুড়োটা দেখে ভাড়াটে বাড়ির বৌটির স্নানের দৃশ্য। বুড়োটার মধ্যে যৌন বাসনা নেই, সে দেখে এক উদ্ভাসিত রূপের দৃশ্য ... মেয়েটিও দেখে, সে দেখে নির্জনতার মধ্যে কুয়োতলার শ্যাওলায় পড়েছে রোদ কচু গাছে উড়ে এসে বসে প্রজাপতি, জলের চিক্কন ধারা, একটা শিরশিটি সব মিলিয়ে এক রূপ। বস্তুতঃ বুড়ো ও মেয়েটি একই রূপ দেখছে, যাকে বলা যায় নিখিল বিশ্বের রূপ - বুড়ো ও নগ্ন মেয়েটিও ওতোপ্রোত-ভাবে যার অন্তর্গত।[১৮]

কিন্তু একটু গভীর ভাবে গল্পটিকে বিশ্লেষণ করলে সুষিতা চক্রবর্তীর মতকে সমর্থন করে বলা যায় যে 'শিরশিটি' গল্প ঠিক লালসাহীন রূপভোগের গল্প নয়। বৃদ্ধ ভুবন এবং যুবতী মায়ার মনের লালসা অথবা বলা যায় যৌন সংবেদনা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের

ব্যবহারে গল্পে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যে মানুষকে মায়া একটা মরা গাছের মতো মনে করতো সেই মরা গাছে কখন যে সবুজের আভা লেগেছে তা সে অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু যখন সেটা বুঝতে পেরেছে তখন সে ভয় এবং কান্না দুটোকেই জয় করে তার উষ্ণ কোমল হাত সেই মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়েছে অবলীলা ক্রমে। এ গল্প সম্পর্কেও লেখক তার বাল্য স্মৃতির উল্লেখ করেছেন -

> ... হালুইকরের গিন্নি ছিল ভয়ানক সুন্দরী। ... হাঁসের গায়ের গন্ধ, খানা ডোবার গন্ধ, স্যাঁতস্যাঁতে উঠোন আর ওদিকে হালুইকরের কড়া থেকে উঠে আসা খাঁটি ভয়সা-ঘি লুচি পাঁপড় ভাজার গন্ধের স্মৃতি দীর্ঘকাল আমার নাকে লেগেছিল।[১৯]

'গিরগিটি' গল্পটি জ্যোতিরিন্দ্রের বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। অপূর্ব ভাষা প্রয়োগে মানুষের মনের যে রূপমোহ, তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।' এই গল্পে ক্রমশ দেখা যায় 'গাছ আর ফুলফলের জগৎ ছাড়িয়ে গিয়ে প্রাণীজগৎ নিঃশব্দ চক্রান্তে প্রবেশ করছে দুজনের দেখায়।'[২০] যেমন ডালিম গাছের শরীর, করবীফুলের থুতনির পর রাজহংসীর গতিভঙ্গি পেরিয়ে বৃদ্ধভুবন মায়ার চোখে দেখতে পায় 'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার' খুঁজছে' সেই রকম দৃষ্টি। বিশুদ্ধ দৃষ্টির সম্ভোগের আনন্দে একটা মানুষ গাছ হয়ে উঠতে পারে, শরীরের ক্ষমতা না থাকলে সে অগত্যা গাছ হয় বটে, কিন্তু 'ক্ষমতা যদি থাকতো গাছ হতো গিরগিটি।'[২১] 'চিতাবাঘিনী'র চিত্রকল্প জ্যোতিরিন্দ্র 'গিরগিটি' গল্প ছাড়াও প্রথম পর্বের গল্প 'মঙ্গলগ্রহ'তেও ব্যবহার করেছেন। 'গিরগিটি' গল্পটি প্রথমে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, কিন্তু পুরো গল্পটি পত্রিকার জন্য দেওয়া হয়নি, পুরো গল্পটি 'প্রিয় অপ্রিয়' গল্প গ্রন্থে স্থান পায়। কিন্তু তার 'শ্রেষ্ঠ গল্প'তে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা গল্পটিই দিয়েছিলেন।'[২২]

প্রকৃতি যে সবার ধাতে সয় না, এই প্রকৃতিই মানুষকে কখনো দেয় ইন্দ্রিয়জ সুখ আবার কখন মানুষকে সে ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই পর্বে কিছু গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র অন্যান্য প্রকৃতি সচেতন গল্পকারদের মতো প্রকৃতির সৌন্দর্যের শুধু বন্দনা করেন নি, বরং প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে মানুষের অবচেতন মনের যে প্রকাশ ঘটে, জেগে ওঠে বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা - নিরাবরণ আদিম মুক্তি, সে খোঁজে - একেই লেখক এই পর্বের কিছু গল্পে ধরতে চেয়েছেন। যেটা প্রথম পর্বে গল্পে এভাবে হয়তো পাওয়া যায় না। তাঁর 'পতঙ্গ' গল্প গ্রন্থের (১৯৬০) অন্যতম গল্প হল 'পতঙ্গ'। এই গল্পের প্রাকৃতিক পটভূমি হল সবুজমাঠ, গুলমোহর ফুলের গাছ, সেখানে রয়েছে দিনরাত অশ্রান্ত সোনাঝুরা সকাল বিকেল। সোনা রঙের গুল-মোহর ফুল আর রৌদ্রের তাপ পলাশের মতো তরুণের মনের সব কিছু পাল্টে দিয়ে-ছিল, অথবা গল্পের যেখানে অস্তিত্ব বিকেল - 'ছায়া লম্বা হয়ে গেছে, পাখী উড়ছে। রঙীন প্রজাপতি চোখে পড়ল। লাল টুকটুকে এক ঝাঁক ফড়িং দেখলাম মাঠের ঘাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামছে। এক পা এক পা করে গোলমোহরের গাছের তলা দিয়ে আবার সেই ফ্ল্যাটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার নিয়তিই আমাকে আবার সেখানে টেনে নিয়ে গেল।'[২৩] একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে এ গল্পে নিয়তি এবং প্রকৃতি এক অভিন্ন সত্তা লাভ করেছে। মানুষ প্রকৃতির কাছে অতি তুচ্ছ নগন্য, তার আকর্ষণ অমোঘ। সেই আকর্ষণই গল্পের পরিণতিতে পলাশের মনে হত্যার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। গোলমোহরের সেই আগুন পলাশের মনের শান্তি সংযম কেড়ে নিয়েছিল, আর তাই সে শেষ পর্যন্ত হত্যা করতে বাধ্য হয়। এ গল্পে হত্যার প্রসঙ্গে 'মুরগী কাটা'র কথা আনা হয়েছে। মুরগী খাবার প্রসঙ্গ আবার রয়েছে তার 'রাবণ বধ' গল্পেও। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন -

... মুরগি কাটার প্রসঙ্গ এসে গেছে - সেটাও বোধ হয়
বৌদির কামনাসিক্ত লোভকে বোঝানোর জন্য ...।[২৪]

এই ধরনের চিত্রকল্প ধ্রুবপদের মতো এসেছে তার বিভিন্ন গল্পের মধ্যে।

প্রকৃতি কখনো কখনো মানবিক সম্পর্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বিশেষ প্রাকৃতিক পটভূমিতে মানুষের মনে কীভাবে হত্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তার বর্ণনা পাই 'সমুদ্র' গল্পে। প্রকৃতির এক ভয়াল স্বরূপ ফুটে উঠেছে এই গল্পে। কালো জলের অশান্ত গর্জনের মধ্যে সমুদ্রের কেবল ভয়ংকর ক্ষুধার রূপ সে দেখে সমুদ্রের ফেনা হয়ে যায় ঝকঝকে মসৃণ নিষ্ঠুর দাঁতের সারি। লেখক প্রকৃতির ক্ষুধার রূপ ভয়াল রূপের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মনুচৈতন্যের আদিম হিংস্র স্বরূপ প্রকাশিত হয় কীভাবে তা দেখাতে চেয়েছেন। পাঠকের গভীরতম সত্তার মধ্যে এ গল্পের ভয়ংকর হিংস্রতা আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'বনের রাজা'তে তিনি হয়েছেন প্রকৃতির শান্তরূপের মধ্যে। আবার কিছু গল্পে দেখিয়েছেন প্রকৃতির ভয়ংকর ক্ষুধার্তের রূপ যা প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনুচৈতন্যের প্রতিফলন, মানুষ সমস্তকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে তখনও সে প্রকৃতির সঙ্গেই থাকতেই চাইছে - এরকম বিচ্ছিন্ন মানুষকে দেখা যায় 'নৈশভ্রমণ' গল্পে। এই গল্প লেখার বিষয়ে লেখক বলেছেন -

আমি যখন 'নৈশভ্রমণ' গল্প লিখি তখন আগে যে পাড়ায়
থাকতাম সেখানে একটা রেল লাইন ছিল। সেই রেল লাইনের
পাশে একটা ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল ছিল। আমি রোজই চেয়ে দেখতাম
যে নীল, সবুজ, লাল এই সব আলোগুলি জ্বলত নিবত।
... এই যে বিচ্ছিন্নতাবোধ আর একা-একা চলা ফেরা করা
কোনো সঙ্গী না নিয়ে এইটেই আমার নৈশভ্রমণ গল্প লেখার
গোড়ার দিকের কথা।[২৫]

এ গল্পে লেখক প্রকৃতির নির্জনতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মনের বিচ্ছিন্নতা বোধকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। গল্পের শেষেও তাই দেখা যায় মানুষটি তার নিঃসঙ্গতাকে নির্জন-পরিবেশের মধ্যে অতি যত্নে লালন করতে চান। লেখক নিজেও বলেছেন -

> ঐ নির্জনতার মধ্যে নানা রকম আলো জ্বলছে নিবছে, হঠাৎ দেখে মনের মধ্যে অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়, একটা পরিবেশ চেতনা জন্ম নেয়।[২৬]

প্রথম পর্বের গল্পের মতো দ্বিতীয় পর্বের গল্পেও দেখা যায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অসহায়তার কথা যেমন 'রাক্ষসী' গল্পের মেয়েটি অভাবের তাড়নায় অবশেষে নিজেকে বিক্রি করে, পরিবারের কেউ সেজন্য তাকে শাসন করে না সে বোঝে মানবিকসত্তা হারিয়ে সে রাক্ষসী হয়ে উঠছে। সাহিত্যের বেচা কেনার যুগে নিজের সৃষ্টির কাছে আত্মনিবেদিত দরিদ্র এক লেখককে পাওয়া যায় তাঁর 'অমর কবিতা' (১৯৬৪ দেশ) গল্পে। এ গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র দেখিয়েছেন দরিদ্র লেখককে দৈনন্দিন জীবনে কী অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তাঁর 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে এর আভাস অবশ্য পাওয়া যায়।

তৃতীয় পর্ব (১৯৭২-১৯৮২)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবনের প্রথম দিকে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কলকাতায় চলে আসার পর রাজনীতির সঙ্গে আর কোন যোগাযোগই রাখেন নি। অহিংসা নিয়ে বড়ো একটা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা তার ছিল, শেষ জীবনেও যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত নিয়ে তার আগ্রহ ছিল সেটা বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে দেশের রাজনীতির যে

গতিপথ, তার সঙ্গে তিনি একেবারেই চলতে পারেন নি। আর এই তাল মিলিয়ে না চলতে পারাতেই তিনি কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক দল বা নেতাদের সমর্থন করে তাদের দলে থেকে যে সব লেখকেরা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আগ্রহী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাদের দলের ছিলেন না, আর তাই তার শেষ জীবনের গল্পে দেখা যায় অর্থহীন রাজনীতিকে তিনি ব্যঙ্গ করছেন। ১৯৭৬-এর শেষে বা ১৯৭৭-এর প্রথমে 'পিলসুজ' পত্রিকার এক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানিয়ে ছিলেন যে 'সোশ্যাল কমিটমেন্ট' যদি শিল্পের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে শিল্প সৃষ্টি সেখানে গৌণ হয়ে ওঠে এবং শিল্পের সজীবতার সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।'[২৭] ১৯৮১ সালের লেখা একটি আত্ম-কথায় তিনি তাঁর এই অবস্থানে অবিচলিত ছিলেন যে 'কোন শিল্পীই কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ও গন্ডির মধ্যে আটক থাকতে পারে না। ... স্বাধীনতা তার জরুরি। কোনো আরোপিত নিয়মশৃঙখলা বা বাধ্যবাধকতা শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'[২৮] তাঁর শেষ জীবনে দেখা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি যে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তা বোঝা যায় ১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'বিকালের খেলা' গল্পটিতে। গল্পটিতে দুটি শিশুকে পাই, যারা বর্তমান জীবনের ফ্ল্যাট বাড়ির গ্রিলের গরাদে বন্দী। বাস্তবজীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে না। তারা একদিন পথে বের হল এবং একটি পরিচিত বিষয়ের আওয়াজের মুখোমুখি হল। এই জিনিস তারা ভালবোঝে তারা দেখল। নিশান উড়ছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। এই শিশুদেরই বাড়ির ছাদে একদিন রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, যাদের একজনের জামায় একটুকরো কাগজে কাঁচা হাতে লেখা 'বাবলু পারটি, আর একজনের জামায় 'পিন্টু পার্টি' আটকানো। মুখের ছেলে-মানুষির কথা ডাডাইস্টরা অনেকদিন আগে লিখেছিলেন। কিন্তু শিশুরা নিজেদের মুখ দিয়ে ভয়ংকরভাবে কখনো কখনো বড় মানুষদের মুখের ছেলেমানুষিকে, রাজনীতি নিয়ে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব যে কত অর্থহীন তা বুঝিয়ে দেয়। 'ইনক্লাব

জিন্দাবাদ' শ্লোগানটি ব্যবহার করে গল্পে লেখক তার তীব্র শ্লেষকেই প্রকাশ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো বাংলা সাহিত্যে বিশেষ শ্লোগান ব্যবহার করে রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করা খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। এই রকম শ্লেষ আবার দেখা যায় তার 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে। বস্তির পাশে তেতলা বিল্ডিং ভাল মানাবে বলেই সে সেখানে বিল্ডিং বানিয়েছে : তাদের ছেলে বাবলু বস্তির মেয়ে হিমিকে সাইকেল শেখায়। বাবলুর মা এতে খুশি হয়, কিন্তু জগদীশ বলে - বাবলু রাজনীতি করছে' এই ছেলে লিডার হবে।''গরিবি হঠাও, গরিবি হঠাও' এই ধ্বনি তিনি বারংবার ব্যবহার করেছেন গল্পটিতে। সত্তর দশকের দুর্বৃত্ত কংগ্রেস সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রের তীব্র ঘৃণা যেন এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। 'বাক্যের কাটা কাটা গড়নে কয়েকটি বাক্যগুচ্ছের অনবরত আবর্তনে শ্লেষ একেবারে জমজমাট হয়ে উঠেছে'২৯ - এ গল্পে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রজন্মের ব্যবধান। এই ঘটনাকে তিনি তুলে ধরেছেন 'হার' গল্পে। এ গল্পটি ১৯৭৩ সালে দেশ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পে দেখা যায় বাবা ও ছেলের মধ্যে একটা দেওয়াল তৈরি হচ্ছে এবং বাবা এই দেওয়ালের ভাষা ঠিক পড়তে পারছে না। কিন্তু এই ব্যবধান যে গড়ে উঠেছে সেটা উভয়েই বুঝতে পারছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই ভাঙাচোরা সমাজে মানুষেরা অবক্ষয়িত হচ্ছে, সেই সঙ্গে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে চারিদিক থেকে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার গল্পে সেই প্রসঙ্গ এনেছেন। নিজের প্রজন্মের হাত ধরে মানুষ যে জীবনের পথে এগিয়ে যাবে সে সম্ভাবনাও বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সমাজে নেই। মানুষ যে সেখানেও একা হয়ে পড়ছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের সমাজে দাঁড়িয়ে সেটা অনুভব করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর শেষ জীবনে পর্যাপ্ত পরিমানে কাফকা'র রচনা পড়েছিলেন এক ধরনের নিঃসঙ্গতাবোধ তখন তার নিজেকে ঘিরে এবং নিজের শহরকে ঘিরে হয়তো গড়ে উঠেছিল। এই নিঃসঙ্গতা থেকেই মানুষযে নিজের এবং তার চার-পাশের মানুষদের আত্ম-পরিচয়কে হারিয়ে ফেলছে সেটা দেখা যায় ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'মুখ' গল্পে। এই গল্পের মানুষটি একসময় লক্ষ্য করল যে বিভিন্ন পশু পাখি, কীটপতঙ্গের মুখের আকৃতির সঙ্গে তার চারপাশে থাকা মানুষজনদের মুখের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন কাকের মুখে বাড়িওয়ালা বিধু নন্দীর মুখ, সাদা দেওয়ালে টিকটিকিকে মনে হয়ছে পাশের ফ্ল্যাটে কিশোরী কুমকুম । অথবা পেটমোটা কালো একটা ভোমরাকে মনে হল অন্তঃসত্তা কাজের মেয়ে যামিনী। তার মনে হতে লাগল নৈতিক অধঃপতন থেকে তার মধ্যে এক ধরনের ব্যাধির বীজ বাসা বেঁধেছে এবং এর থেকে রেহাই নেই। এই মনোভাব থেকেই সে পোস্ট অফিসের নির্জন কাউনটার থেকে অকারণে কেবল বাঘ, সিংহ, হাতি, হরিণের ছবি যুক্ত স্ট্যাম্প কিনতে চায়। কারণ তাতে মানুষের স্পর্শ নেই। পরিকল্পনা বা বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনের স্টাম্পের প্রতি তার আগ্রহ নেই কারণ তাতে মানুষের সংস্পর্শে আছে। শহরের সভ্যতা, আধুনিকতা মানুষকে শহর বিমুখ করে তুলেছে, মানুষ হয়ে উঠছে নিঃসঙ্গ। মানুষ নিজের মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কাফা'র 'মেটামরফসিস'এও এভাবেই মানুষের পোকাতে পরিণত হয়ে যাবার কথা রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মুখ গল্পের সঙ্গে কাফ্কার এই গল্পের হয়তো কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে অবশ্যই সেটা মানুষের রূপান্তরের ক্ষেত্রে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক পট পরিবর্তনে মানুষের জীবন ধারা চলেছে বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে। আর সেখানে মানুষ কখনো দাড়িয়ে আছে প্রজন্মের ব্যবধানে, কখনো বা একেবারেই নিঃসঙ্গ অবস্থায়। জ্যোতিরিন্দ্রের তৃতীয় পর্বের গল্পে এই নিঃসঙ্গতাকে আমরা দেখতে পাই। বর্তমান সমাজের সব দিকটাই যে ঘুন ধরে গেছে, মানুষে

মানুষে সম্পর্ক শুধু মাত্র স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে আছে তাকেই তিনি দেখিয়েছেন 'ওয়াং ও খেলা ঘরে আমরা'(১৯৭১) গল্পে। ১৯৭৮-এর শেষ দিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গুরুতর ভাবে অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি এ দীর্ঘ গল্প লেখেন। তিনি 'প্রায়ই বলতেন এই গল্পের কথা।'[৩০] গল্পটি একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে যেখানে সমস্ত রোগীই রক্তশূন্যতায় ভুগছে। অথচ রক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, শুরু হয়েছে রক্ত সংগ্রহের প্রতিযোগিতা। এই প্রতি-যোগিতা থেকে দুজন সরে এসেছে। একজনের অর্থবল নেই বলে, অন্যজন জুতোর দোকানের চীনা মালিক 'ওয়াং', সে স্বেচ্ছায় সরে এসেছে অর্থবল জনবল থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু রক্ত দেওয়া আর রক্ত পাওয়া টানাপোড়েনে মনুষত্বের যে ভয়ংকর স্বার্থপর চেহারা আর অন্যদিকে অসহায়তা, তা দেখেই ওয়াং রক্তের বিনিময়ে আর জীবন পেতে আগ্রহী হলো না, মৃত্যুকেই সে বরণ করল। অন্যদিকে অর্থের অভাবে রক্ত না পেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী উমাপদ দেখলো ওয়াং-এর প্রেতকে, যে বলছে 'আমি রক্ত চাই না। অল ব্যাড ব্লাড, অল পলিউটেড - পৃথিবী সব রক্ত খারাপ হয়ে গেছে। ... দিস ইজ এ উইকেড্ ওয়ার্ল্ড অলথ্যান করাপটেড্।' বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজকে বর্ণনা করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই দুঃসাহসীক উক্তি ওয়াং-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। পৃথিবীতে শুধু প্রাকৃতিক পলিউশন-ই ঘটছে না তার থেকেও ভয়ংকর পলিউশন মানব সমাজের মধ্যে চলেছে যা সমাজের ভিতকে একেবারে মূল থেকে ক্ষয় করে দিচ্ছে, সেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনুভব করেছিলেন।

এই অবক্ষয়িত সমাজে, কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, রাজনীতির বিভ্রান্তি আর বিকৃতির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশী সমাজের শিশুরা যারা ভবিষ্যতের নাগরিক, সে চিত্র দেখা গেছে 'বিকেলের খেলা' বা 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে।

এই সমাজে শিশুরা যে খুব একটা ভাল পরিস্থিতিতে নেই সেটা দেখা যায় তার মৃত্যুর এক বছর আগে লেখা 'ইস্টিকুটুম' গল্পে (১৯৮২, প্রকাশিত)। এ গল্পের নায়ক রুগ্ন অনাথ গণেশ নামের একটি শিশু, যাকে তার মাসি আশ্রয় দিয়েছে। তার রয়েছে শুধু সবুজের জগৎ। সে জগতে যেমন তক্ষক রয়েছে সে সঙ্গে রয়েছে পাখির ডাক - বিশেষ করে ইটিকুটুম পাখি। এ পাখি গনেশকে চেনে সে ডাকে 'কুটুম আয় কুটুম আয়।' কিন্তু সমাজের পরিস্থিতি এমন - চালের কেজি চারটাকায় উঠে গেছে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে দরিদ্র ঘরে একমুঠো ভাত দেবার ভয়ে, আর একমুঠো ভাত খাবার লজ্জায় কুটুম বাড়ি কুটুমের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গনেশ তার সবুজ জগৎটুকু নিয়েও থাকতে পারলো না। সামাজিক পরিস্থিতি এমন হয়েছে যেখানে শিশুরাও বড়ই অসহায়। শঠ, প্রলুব্ধ আত্মীয়েরা অনাথ গনেশ বা তার মতো শিশুদের সবুজ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছেলেধরা দলের কাছে বিক্রি করে দেয়। সবুজ জগৎ থেকে শিশুরা নির্বাসিত হয়ে অবস্থান করে গুমোট এক অন্ধকার জগতে। এ জগতে শিশুরাও শিশুদের সহানুভূতি দেখায় না, তারাও একে অপরের প্রতি অতি নির্মম ভয়ংকর হয়ে ওঠে। গনেশ মানুষের এই ভয়ংকর পরিবেশ থেকে তক্ষকের ডাককে কম ভয় পায়। সেভাবে এখানকার চেয়ে তক্ষকের ডাক ভালো, ভয় কম। জ্যোতিরিন্দ্র দেখেছিলেন সমাজের বিনিপাতে মানুষ আজ দগ্ধ, বিবিক্ত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম দিকের রচনার বিষয় এবং লেখার কৌশল পরবর্তী কালের রচনায় ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে ধীমান দাশ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিজের রচনা শিল্প সম্পর্কে লেখক বলেছিলেন 'যা সরাসরিও বলা যায় তা আমি আঙ্গিকগত খুঁটিনাটির মাধ্যমে বলার কথা ভাবি।'[৩৫] আবার ১৯৮২ সালে আর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'আমি এখন টেকনিকটাকে আরো বেশি ফ্রি করতে চাই, যেন তা আলো বাতাসের মতো চরিত্র এবং পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায়। খুব সাধারণ, খুব

সহজ শব্দ যদি এসে যায় আমি ওই শব্দই দেব। ... আমার লেখায় তাই আজ উপমা কমেছে, আমি ইচ্ছে করেই কমিয়ে দিয়েছি।'[৩১] যেমন প্রথমদিকে গল্প 'নদী ও নারী'তে উপমা ব্যবহার হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমানে, একটি নারীর অস্বাভাবিক জীবন যাপনকে তুলে ধরেছে বিভিন্ন উপমা প্রয়োগে - নির্মলার কাছে এই নারীর 'গানের রেশটা কুৎসিত সরীসৃপের মতো তার কানের কাছে কিলবিল করছিল' অথবা 'দীর্ঘছন্দ নিটোল নিভাঁজ গড়ন কোমরে আঁট করে জড়ানো আঁচলটা, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতা বাঘের মতো।' অথবা তার দৃষ্টি হল 'মধ্যাহ্নের আকাশের মতন সুচ্ছ প্রখর।' অথবা 'মঙ্গলগ্রহ গল্পে লীলাময়ীকে প্রৌঢ় কুলদারঞ্জনের মনে হল 'মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিনী কোনো বাঘিনী। ... সুন্দর, গর্বিত, নির্ভীক।" কিন্তু ক্রমশ উপমা ব্যবহার কমেছে তার গল্পে এবং শেষ দিকের গল্পে অনেক সরাসরি ভাবে সমাজের অবস্থাকে দেখাতে চেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যে তিনি বিশেষ বিশেষ শব্দের বারংবার ব্যবহার করেছেন। যেমন 'বিলালের খেলা'তে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বা 'হিমির সাইকেল শেখা'তে 'গরিবি হটাও' ইত্যাদি। উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে জীবনানন্দ দাসের একটা মিল যেমন দেখা যায়, ঠিক সেভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতোই জীবনানন্দের শেষ দিকের অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭-এর লেখাতেও ক্রমশ উপমা ব্যবহার কম দেখা যায়। যেমন '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় দেখা যায় -

> অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পাপে
> যে অনবনমনে চলেছে আজো ...[৩২]

অথবা 'পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে' কবিতায় -

> পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন আলোকিত হয়ে
> ওঠে - রাত্রি অন্ধকার হয়ে আসে ...

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম দিকের লেখায় প্যাশন, রূপের বর্ণনা ইত্যাদিই প্রাধান্য পেয়েছে। সে কারণে লেখায় ভাষা বা বর্ণনার অলঙ্করণ ঘটেছে, যা লেখকের মতে তার গল্পগুলিকে অযথা ভারি করেছে। এই ভার শব্দের ব্যবহারে, উপমায় দৃষ্টান্তে। কিন্তু শেষের দিকের লেখায় এই ভাষার বাহুল্যকে তিনি বর্জন করেছেন, রচনা হয়ে উঠেছে নিরাভরণ। যেমন 'গাছ' গল্পটিতে জ্যোতিরিন্দ্র যেন ছবি এঁকেছেন। এ গল্পে 'বর্ণ-প্রতীকের জীবন্ত চলিষ্ণুতা লক্ষ করার মতো। লালের স্পর্শ পেয়েই ঈর্ষার সবুজ এখানে প্রেমের আর প্রাণের সবুজে গোত্রান্তরিত হয়েছে।'[৩৩] গাছে মধ্যে তিনি মানবসত্তা আরোপ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের অন্যতম বিশেষত্ব হল - মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক সত্তা আরোপ করা, আবার প্রকৃতির মধ্যে মানবসত্তা আরোপ করা। এই অভিনব কৌশল বাংলা সাহিত্যে খুব কম লেখকই অবলম্বন করেছেন। বিমল কর লিখেছিলেন 'জ্যোতিদার লেখার বড় গুণ তার চিত্র কর্ম'।[৩৪] যেখানে তিনি প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করেছেন সেখানেই তাঁর চিত্রকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সমাজের যা আপাত অসুন্দর তার ছবিও তিনি নিপুন শিল্পীর মতো অঙ্কন করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যেভাবে জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন সেই ভাবে আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সম্বন্ধে বলতে পারি, তার গল্প 'বর্ণনা বহুল, তার বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তার চিত্র বর্ণবহুল ...'[৩৫]। জীবনানন্দের মতো জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের 'এ সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যলোকে।'[৩৬] নিসর্গের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে শহর-বস্তি পার্ক-ডাস্টবিনের ছবি ও তার গল্পে সমান ভাবে স্থান করে নিয়েছে। 'সর্ব ইন্দ্রিয়ের সম্মেলক ভাষা তার অঙ্কনকে ঘনত্ব দিয়েছে।'[৩৭] তার ছোট গল্পের শিল্পগুণ উপন্যাসের চেয়ে বেশি বলে মনে হয়, তার কারণ তিনি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি অনুচ্ছেদের বিন্যাস অতি নিখুঁত ভাবে করেছেন। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি পরিণামী উন্মোচন কৌশলের ওপরে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই উন্মোচন

ঘটনার নয়, বলা যেতে পারে উপলব্ধির উন্মোচন।'[৩৮] যেমন 'তারিনীর বাড়ি বদল' 'বনের রাজা' বা গিরগিটি', 'পতঙ্গ' অথবা শেষ পর্বের গল্প 'ইন্টিকুটুম'এ এই উপলব্ধি উন্মোচন ঘটেছে। তার অনেক গল্পই আখ্যান প্রধান নয়। আর সেক্ষেত্রে স্পষ্ট ঘটনা কেন্দ্রিক উন্মোচনের পরিবর্তে উপমা-চকিত, সংকেতবন্ধ প্রতীকী বাক্য বা দৃশ্যে প্রায়ই তার গল্প শেষ হয়।'[৩৯] যেমন 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পের শেষ হয়েছে সংকেত বন্ধ প্রতীকী বাক্যে - 'তা অত ভাবতে হবে না বৌ - সেরে যাবে। পায়ের কাটা ঘা কদিন থাকে, ঘা শুকোয় না মনের।'[৪০] অথবা শ্বাপদ গল্পের শেষে বক্তা বলছে -

> ... যাকে বুনো বলতাম ... সে আর মানুষের আকৃতি
> নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে
> মিশে গিয়েছিল আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের
> ঝকমকে মেয়ে বুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।[৪১]

আবার কোন গল্পে বিভিন্ন প্রসঙ্গ বা চরিত্র প্রতীকের দ্যোতনাময়তা লাভ করেছে যেমন 'শালিক কি চড়ুই' গল্পে দুটি পাখির গতিবিধি ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে পল্লব সেনের গতিবিধির সঙ্গে। অবশেষে বলা যায় তার প্রায় গল্পেই ছড়িয়ে আছে এক ধরনের কবিত্ব যা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

তথ্যপঞ্জী

১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'আমার সাহিত্য জীবন', - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, সম্পাদক-সুব্রত রাহা, অজয় দাশগুপ্ত, ১৯৯৩, প্রকাশক- বিবেশ ভারতী, পৃ.২৯১

২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী' - 'যা দেখি যা শুনি' - নাথ পাবলিশার্স, পৃ.১৩৪

৩. তদেব পৃ.১৩৮

৪. তদেব পৃ.১৩৯

৫. তদেব পৃ.১৪০

৬. সুব্রত রাহা - 'অন্ধকারে নির্মোহ এক চিত্রকর' - কালপুরুষ, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ.১৪৮

৭. লোথার লুৎসে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার - কালপুরুষ পত্রিকার সৌজন্যে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প - সম্পাদক

৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - 'নীলরাত্রি ও বনের রাজা' - দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬, পৃ.২২৫

৯. প্রশান্ত মাজী - চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিবিম্ব, ত্রয়োদশ সংকলন ১৯৭৯ পৃ.২

১০. সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে একটি সন্ধ্যা - কালপুরুষ, ৫ম বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ.১২০

১১. সুব্রত রুদ্রের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিষয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (গবেষকের)

১২. সুব্রত রুদ্র - জ্যোতিরিন্দ্রনন্দী যখন যাচ্ছেন' - যযপুরিতে কবিতা, ১৩৯২, পৃ.৩৪

১৩. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প, ভাঙা কাঁচের শিল্প, বাংলা ছোট গল্পের শিল্পীদল, সম্পাদক - অর্জুন রায়, প্রয়াস প্রকাশন - পৃ.১০০

১৪. ধীমান দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আঙ্গিক - অবহি (নবপর্যায়) ১৯৮২, প্রথম সংখ্যা। পৃ.১৩

১৫. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'আমার সাহিত্য জীবন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, ১৯৯৩, সম্পাদনা সুব্রত রাহা - অজয় দাশগুপ্ত, পৃ.৩০৩

১৬. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'গাছ' - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, ১৯৮১ সম্পাদনা - নিতাই বসু, পৃ.৩০৬

১৭. সুমিতা চক্রবর্তী - গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - কলেজ স্ট্রিট, নববর্ষ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ.৪৮

১৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - নীলরাত্রি ও বনের রাজা, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬, পৃ.২২৭

১৯. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - আমার সাহিত্য জীবন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, ১৯৯৩, সম্পাদনা - সুব্রত রাহা - অজয় দাশগুপ্ত, পৃ.২৯৫

২০. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম, ভাঙা কাঁচের শিল্প, বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল, সম্পাদক - অর্জুন রায় , পৃ.১০৭

২১. তদেব, পৃ.১০৮

২২. প্রশান্ত যাজী - 'চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' প্রতিবিম্ব, ত্রয়োদশ সংকলন ১৯৭৯, পৃ.১৫

২৩. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'পতঙ্গ' - পতঙ্গ গল্প গুচ্ছ ১৩৬৭, পৃ.১২৬

২৪. লোথার লুৎসার - 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার - কালপুরুষের সৌজন্যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, সম্পাদনা - সুব্রত রুদ্র-অজয় দাশগুপ্ত, ১৯৯৩

২৫. তদেব

২৬. তদেব

২৭. শিলসুজ পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার - শিলসুজ, ক্রমিক ২, সম্পাদক - অমিত রায়, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৩

২৮. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - আমার সময় এবং আমার লেখা লেখি, 'নতুন সময়', পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৮১, পৃ.১১

২৯. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম, ভাঙা কাঁচের শিল্প, বাংলা ছোটগল্পের শিল্পী দল, পৃ.১১৮

৩০. শচীন দাস - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'প্রথা' চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

৩১. ধীমান দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আঙ্গিক, আবহি, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৮২

৩২. জীবনানন্দ দাস - '১৯৪৬-৪৭', জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৬, পৃ.১৩৪

৩৩. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম, ভাঙাকাঁচের শিল্প, বাংলা ছোট গল্পের শিল্পীদল, পৃ.১২৯, সম্পাদক - অর্জুন রায়

৩৪. বিমল কর - ভূমিকা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, সম্পাদক - সুব্রত রাহা অজয় দাশগুপ্ত, ১৯৯৩

৩৫. বুদ্ধদেব বসু - কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ.৩৬

৩৬. তদেব, পৃ.৫৩

৩৭. সুমিতা চক্রবর্তী - গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কলেজ স্ট্রীট ১১১৪
নববর্ষ-রবীন্দ্র সংখ্যা, পৃ.৫২

৩৮. তদেব, পৃ.৫২

৩৯. তদেব পৃ.৫২

৪০. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, ১১৮১, সম্পাদক - নিতাই বসু, পৃ.২৭০

৪১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'সাপদ' - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, ১১৮১, নিতাই বসু, পৃ.১৩৬

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প গ্রন্থতালিকা

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনা	সাল	সূচী
খেলনা	পূর্বাশা লিঃ	জৈষ্ঠ ১৩৫৩	নদী ও নারী, সন্ততি, সন্ধান, সিংহরাশি, সমতল, খাকী, খেলা।
শালিক কি চড়ুই	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ	৭ই বৈশাখ	শালিক কি চড়ুই, নায়ক নায়িকা, খুকী, চড়ুইভাতি, বধিরা, ভোলাবাবুর ভুল, খেলোয়াড়, চামচ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী
চন্দ্রমল্লিকা	রথযাত্রা জ্ঞানতীর্থ	১৩৬১	চন্দ্রমল্লিকা, সিঁধেল, ডুবুরি, অমানুষিকা, কাঠপিঁপড়া, নিয়মের বাইরে, সিঁড়ি।
চার ইয়ার	শুভানী সাহিত্য উদ্যম	বৈশাখ ১৩৬১	চার ইয়ার, ···উত্তরায়ণ, রংচং, ভিজিট, ক্যামাক স্ট্রীটে
বন্ধুপত্নী	নাভানা	বৈশাখ ১৩৬২	বন্ধুপত্নী, মঙ্গলগ্রহ, দৃষ্টি, তারিণীর বাড়ি বদল, মেয়ে শাসন, দুপুরে গল্প।
ট্যাক্সিওয়ালা	ক্লাসিক প্রেস	১ বৈশাখ ১৩৬৩	ট্যাক্সিওয়ালা, ঘরণী, পালিশ, খুনী, মাছের দাম, কতক্ষণ, চশমখোর, ঘড়ির মানুষ।
বনানীর প্রেম	প্রকাশক, মদনমোহন	আষাঢ় ১৩৬৪	রজনীগন্ধা, গানের ফুল, রিফ্রিজারেটার, সন্দেশ, সূর্যমুখী, ইস্ত্রি, সোনার সিঁড়ি, নিষ্ঠুর, কমরেড, রিপোর্ট, আমার বন্ধু, বনানী প্রেম।

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনা	সাল	সূচী
পার্বতীপুরের বিকেল	প্রচারিকা	মাঘ ১৩৬৫	সোনার স্মৃতি, সার্কাস, বিষ, দুর্বোধ, পার্বতীপুরের বিকেল।
খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর	কথাকলি	২৫ বৈশাখ ১৩৬৭	কেষ্টনগরের পুতুল, পঙ্গু, মাছ-ধরার গল্প, নীল পেয়ালা, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর।
পতঙ্গ	কল্লোল প্রকাশনী	বৈশাখ ১৩৬৭	মৌচাক, টুকরো কাপড়, প্রতিনিধি, নৈশভ্রমণ, দিগ্‌দর্শন, রাক্ষসী, পতঙ্গ।
মহীয়সী	শ্রীলেখা পাবলিশার্স	বৈশাখ ১৩৬৭	মহীয়সী, বনের রাজা, গুইনি, সিন্ধেশ্বরের মৃত্যু, চোর, জ্বালা।
পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা	সেকাল-একাল	বিজয়া ১৩৬৮	তিনবুড়ি, গোঁয়ার, বৃষ্টির পরে, আপেল, সমুদ্র, উপহার, মৌসুমী, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা।
শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা	ফসল	২৫ বৈশাখ ১৩৭০	শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ।
শ্রেষ্ঠ গল্প	ভারবী	অগ্রহায়ণ ১৩৮৩	নদী ও নারী, শালিক কি চড়ুই মঙ্গলগ্রহ, তারিণীর বাড়ি বদল, ট্যাক্‌সিওয়ালা, চোর, বনের রাজা, গিরগিটি, তিনবুড়ি, সমুদ্র, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, ভাত, আলোর পাখি, সেই ভদ্রলোক, জীবন, ছাতা, অজগর, সামনে চামেলি।

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনী	সাল	সূচী
ছিদ্র	বাণীশিল্প	শ্রাবণ ১৩৮৩	ছিদ্র, সোনার চাঁদ, বুনোওল, ক্ষুধা, হিংসা।
আজ কোথায় যাবেন	আনন্দ পাবলিশার্স	১৩৮৭	সোনালি দিন, আম কাঁঠালের ছুটি, দুই শিশু, লেডিজ ঘড়ি, আরসোলা, গোধূলি, ভাল ছেলে খারাপ ছেলে, চশমখোর, জিয়নকাঠি মরণ কাঠি, আজ কোথায় যাবেন, গোপন গন্ধ।
গল্প সংগ্রহ, ১ম খন্ড	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	তারিখ নেই	আমার সাহিত্য জীবন, তাঁকে নিয়ে গল্প, এক ঝাঁক দেবশিশু, মহরা, কেমন হাসি, হার, মাছি, ওয়াং ও খেলা ঘরে আমরা, সুখী মানুষ, সংহার, ডলি মাল বসন্তকাল ও টি মজুমদার, গাছ, মিষ্টি জ্বালা, বাবু, চাওয়া, নিঃশব্দ নায়ক, বন্ধুপত্নী, মঙ্গলগ্রহ, দৃষ্টি।
জয়জয়ন্তী	নতুন প্রকাশক		বুড়ীর রস, বাদামতলা প্রতিভা, সোনার বিয়ে, ঋতুরঙ।
দিনের গল্প রাত্রির গান			দুঃস্বপ্ন, বিপত্নীক
প্রিয় অপ্রিয়	ডি-এম-লাইব্রেরি		কৈশোর, গিরগিটি, আটপৌরে বুটকি ছুটকি।
নির্বাচিত গল্প	দে'জ পাবলিসার্স	১৩৯৬	নদী ও নারী, রাইচরণের বাবরি, সমুদ্র, বৃষ্টির পরে, বনের রাজা, বন্ধুপত্নী, গিরগিটি

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনা	সাল	সূচী
			সাপদ, তারিণীর বাড়ি বদল, মঙ্গলগ্রহ, চোর, নীলপেয়ালা, চন্দ্রমল্লিকা, পার্বতীপুরের বিকেল, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, পতঙ্গ, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা, জ্বালা, সামনে চায়েলি, গাছ
অপ্রকাশিত গল্প	প্রত্যয় প্রকাশনী মহালয়া	১৩৯৮	কালো বৌদি, আপন ভাই, ম্যাজিক, ফুল ফোটার দিন, রূপকথার রাজা।
বাহাই গল্প	বিবেক ভারতী	১৩৯৮	পালিশ, মিথুন, অবনি নিখোঁজ, মাছ, খাদক, হিমির সাইকেল শেখা, শয়তান, রুপোলি মাছ, আম কাঁঠালের ছুটি, যৌবন, ভূতির মার রেস্টুরেন্ট, তেলেভাজা, অমানুষিক, বাদামতলা প্রতিভা, গিরগিটি, কেমন হাসি, লেডিজ ঘড়ি, আরশোলা, গন্ধ, নীল পেয়ালা, এক ঝাঁক দেব-শিশু, অমর কবিতা, ইষ্টি-কুটুম, মঙ্গলগ্রহ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু রচনার সময়কাল

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'অন্তরালে' - ১৯৩০

'' - নদী ও নারী - ১৯৩৬ - পরিচয় পত্রিকা

'' - রাইচরণের বাবরি ১৯৩৬ - দেশ পত্রিকা

'' - পালিশ, মঙ্গলগ্রহ, কমরেড, বধিরা শালিক চড়ুই, শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি, বনমীর প্রেম, ইত্যাদি গল্প ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে প্রকাশিত

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - বুটকিছুটকি - ১৯৫২

'' - তারিণীর বাড়ি বদল - ১৯৫৫-র কিছু আগে

'' - সূর্যমুখী (উপন্যাস) - ১৩৫৫ (১৯৪৮ দেশ)

'' - মীরার দুপুর(উপন্যাস) - ১৩৬০

'' - বারো ঘর এক উঠান (উপন্যাস) - ১৩

'' - গোলাপের নেশা - ১৩৬৬

'' - জ্বালা - ১৩৬৫ দেশ

'' - বনের রাজা - ১৩৬৬ দেশ

'' - অমর কবিতা - ১৯৬৪ - শারদীয় দেশ

'' - বিকালের খেলা - ১৯৭১

'' - হার - ১৯৭৩

'' - ভাল ছেলে খারাপ ছেলে - ১৩৮২ (১৯৭৫)

'' - লেডিজ ঘড়ি - ১৩৮৪ (১৯৭৭) দেশ

'' - ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা - ১৩৮৬ (১৯৭৯) দেশ

'' - মুখ - ১৯৮০

'' - ইন্টিকুটুম - ১৯৮২

'' - যতি ডাক্তারের গল্প - ১৩৮৯ (১৯৮২), দেশ পত্রিকা

তৃতীয় অধ্যায়

কমলকুমার মজুমদারের - জীবন ও সাহিত্য (১৯১৪-৭১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রায় সমসাময়িক অন্যতম লেখক হলেন কমলকুমার মজুমদার। তিনি বাংলা সাহিত্যে একক প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দিক্ চিহ্নের মতো আজও দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অননুকরণীয় গদ্য শৈলীকে নিয়ে। কমলকুমারের জন্ম হয় ১৯১৪ সালের ১৭ই নভেম্বর। তাঁর বাবা প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন কলকাতা পুলিশের অফিসার। তিনি তাঁর বাবা, মা, ঠাকুমা এবং বাবার মামা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর উৎসাহে শৈশবেই নানান শিল্পের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন চরিত্রের নির্ভীকতা, অনমনীয়তা এবং দৃঢ়তা। অন্যদিকে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী, রুচির সূক্ষ্মতা পেয়েছিলেন মা'র সাহচর্যে। মা রেণুকাময়ী কিশোর বয়সে কমলকুমার ও তার ভাই যিনি পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিল্পী - সেই নীরদকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।[১] কমলকুমার এবং ভাই নীরদ চব্বিশ পরগনার বিষ্টুপুর 'শিক্ষাসংঘ' বিদ্যালয়ে একই - শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুধীর চট্টোপাধ্যায় পুকুর পাড়ে মাছ ধরতে ধরতে বিশ্বের সেরা ছোট গল্প শোনাতেন। এর কয়েক বছর পর এই স্কুল ছেড়ে কলকাতার ক্যাথিড্রাল মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু প্রায়ই বাবার লেখা নকল করে ছুটি নেওয়া ধরা পড়লে এই স্কুল ছাড়েন এবং ভবানীপুরের সংস্কৃত টোলে ভর্তি হন। এখানে তাঁরা মাথা ন্যাড়া করে টিকি রেখে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন। এই সময় থেকেই ঠাকুমার প্রভাবে ভগবৎ সাধনার দিকে ঝোঁকেন। বাড়ির পরিবেশেই শৈশব কালে কমলকুমার অনেক জ্ঞানীগুনীর সংস্পর্শে আসেন। একটি রচনায় তিনি লিখেছেন 'ছেলেবেলাতে আমাদের ব্লকম্যান স্ট্রীটের বাড়িতে আমরা নিরুপমা দেবী, সরলাদেবী, শরৎবাবু বহু গণ্যমান্যকে আসিতে দেখিয়াছি ...।' এই সময় থেকেই কমলকুমার সাহিত্যপাঠ, সেতার বাজান এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। তাঁর আঁকা শিক্ষা এ সময় থেকেই শুরু হয়।

'উষ্ণীষ' নামে যে পত্রিকা ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত হতো(১৯৩৭) তার সম্পাদক ছিলেন কমলকুমার। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কমলকুমার 'লালজুতো' গল্প ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং মুঙ্গেঁর ভূমিকম্প বিষয়ে একটি রচনা লেখেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় কনুদেব ছদ্মনামে লেখেন একটি কবিতা ও 'মধু' গল্প, তৃতীয় এবং শেষ সংখ্যায় লেখেন 'প্রিন্সেস' গল্প। কমলকুমার যখন জাহাজের আমদানি রপ্তানি, মাছের ভেড়ি, ডিডিটি প্রভৃতির ব্যবসা শুরু করেন, সে সময় প্রচুর অর্থাগম হয় এবং তিনি অত্যন্ত বিলাসী হয়ে ওঠেন। বাজারের মূল্যবান ও সেরা প্রসাধনী, পোশাক ছাড়া তিনি ব্যবহার করতেন না। পোশাকে কেতা দুরস্ত কমলকুমারকে দেখে মার্সেল স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন মহম্মদ জিন্নার পর এত ওয়েল ড্রেসড্ ভারতীয় নাকি আর দ্বিতীয়টি দেখেননি।'[২] সাঁওতাল পরগণার রিখিয়ায় কমলকুমারের বাবা একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৯৪১ সালে জাপানী বোমার আতঙ্কে রিখিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। রিখিয়া সম্পর্কে কমলকুমারের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা রাধাপ্রসাদ গুপ্তের একটি বিবরণ থেকে কিছুটা জানা যায়। তিনি বলেছেন, 'কমলবাবু জাঁ রেনোয়াকে রিখিয়া যাওয়ার কথা বলেছিলেন। ফরাসিতে রিখিয়ার যে বর্ণনা তাঁকে দিয়েছিলেন তার ইংরাজি করলে দাঁড়ায় 'plenty of Sun, plenty of rain and innumarable silence' এই রিখিয়াতেই কমলকুমার প্রকৃতি আর মাটির মানুষদের, তাদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, 'অগনিত ছোটলোকের ঘর্মাক্ত কলেবর, কুলি-কামারির শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন, জেনেছেন, এখানের মানুষ তাকেই সুখী বলে জানে যে বর্তনে খায়, বালিশে ঘুমায়, দেখেছেন সৌন্দর্যের কুৎসিত প্যারডি আর গেরি-হরিৎ-কমলার চলমান রং প্রকৃতিকে বিসর্জনকারী চেষ্টার।'[৩] কমলকুমার প্রকৃতিকে এখানে যেভাবে দেখেছেন তার সঙ্গে তার পূর্ববর্তী লেখক বিভূতিভূষণের প্রকৃতিকে দেখার মধ্যে অনেকটাই তফাৎ রয়েছে। কমলকুমার একজন চিত্র শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতিকে দেখেছেন, বিভূতিভূষণ সেখানে যেন অনেকটাই কবি হয়ে উঠেছেন। কমলকুমার রিখিয়ার আকাশে অনুভব করেছেন

'চিরব্রাহ্মণ্য, মৃত্তিকা বিস্তার হয় উৎসবময়ী ফোয়ারা'।[৪] রিখিয়াতে এই সময় অনেক গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। কবি বিষ্ণু দে রিখিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কমলকুমার দে'র বাড়িতেই উঠতেন। কোলাহল কুৎসিত নগরের ভিড়ে ক্লান্ত হয়ে তিনি সাঁওতাল পরগণার নির্জন প্রকৃতির কোলে পালিয়ে এসেছেন। অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন -

> সেই পল্লীতে শরনার্থী মানুষের একটি শিল্প সংসার
> সেদিন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নাচ, গান জলসা।[৫]

কমলকুমারের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'কাফে দ্য রোকিও নামে একটি রেস্তোরা।' রিখিয়াতে দেওয়াল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা গড়ে উঠেছিল যার সম্পাদক ছিলেন কমলকুমারের বোন গীতা এবং সহ-সম্পাদক প্রতিবেশিনী দয়াময়ী। দয়াময়ীর সঙ্গে কমলকুমারের এখানেই প্রথম পরিচয় এবং প্রেম হয় যা পরিণয়ে পরিণত হয় ১৯৪৭ সালে। এ বছরেই তিনি এফ-এ পাশ করেন। যদিও তিনি মনে করতেন যে একজন মানুষকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হয়।

কমলকুমার কর্মানুসন্ধানে কলকাতায় এসে আসেন ১৯৪২-এর দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সমগ্র বিশ্বকেই বিধ্বস্ত করে তুলেছে। কলকাতাবাসীরাও কলকাতা ত্যাগ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রান হারিয়েছে গ্রামে শহরে। সেই সঙ্গে শুরু হল দাঙ্গা। কমলকুমার ১৯৪২ সালের দাঙ্গা, আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর সারা জীবনে ভুলতে পারেননি। তাঁর গল্প উপন্যাসগুলিতেও বারে বারেই এই সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার চিত্র দেখতে পাই। 'নিমঅন্নপূর্ণা' তার এই সময়ে অভিজ্ঞতারই ফল। আবার একেবারে শেষের দিকের উপন্যাস 'খেলার প্রতিভা'তেও রয়েছে 'ফ্যান দাও'-এর করুণ আর্তনাদ। অনেক চিঠি পত্রেও কমলকুমার এই সময়কার (১৯৪২) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন -

আমি ৪২ দেখিয়াছি যেদিন আমার পরনের মানে গলার টাই
খুলিয়া পোড়াইয়া দিল, পথে সেদিন যেসিন গানিং হইল।
গুলি অনবরত চলিতে থাকে, তাহা ব্যতীত রায়েট যে কি অর্থাৎ
কি হিন্দু কি মোছরমান শালারা যে কি দুশ্চরিত্র হইতে পারে
আর ইংরাজ বাস্কতরা যে কি শয়তান, কত বড় হারামী।
অনেকেই বাড়িতে মানে দরজায় কুশ আঁকিতে (এন্টালীতে) কেহ
ইউপিয়ন হ্যাক তুলিতে বাধ্য হইয়াছিল।[৬]

যুদ্ধের কলকাতা, মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি, ইংরেজ সৈনিকদের দাপট, ব্ল্যাক আউট জর্জরিত ভারতবর্ষের বাস্তব চিত্র রূপায়নে শিল্প কলার ভূমিকা কী হবে, সমস্যা জর্জরিত সমাজচিত্র রূপায়নে আধুনিক শিল্প কলার ভূমিকা কী হবে - এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তখনকার সব শিল্পীকেই। ১৯৪৬-৪৭-এর অন্যতম কবি ছিলেন জীবনানন্দ। যুদ্ধ মন্বন্তরের ধ্বস্ত সময়ের চিহ্ন জীবনানন্দের কবিতায় এসেছে, যেমন নিরীহ, ক্লান্ত ভিক্ষান্নেষীদের গান। ১৩৫০ পৌষ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তিমির হননের গান' বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। 'কার্তিকের ভোর ১৩৫০' কবিতায় দেখা যায় এই ছবি -

তেরোশ পঞ্চাশ সালে কার্তিকের ভোর, সূর্যালোকিত সব স্থান
যদিওলঈলর খানা
যদিও শ্মশান
তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে
সূর্যালোকিত হয়ে গেছে।

অথবা 'এই সবদিনরাত্রি' কবিতায় রয়েছে -

এ-রকম ভাবে চলে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিক চিহ্নহীন,
কেবল পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর -
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তবে
অনেক বেডের প্রয়োজন,
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে,
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিরকুট' কাব্য গ্রন্থে পাওয়া যায় সেই দুর্দিনের চিহ্ন-মেশা কবিতা - 'পথের দু-ধারে বাসা বেঁধেছে কঙ্কাল, গ্রাস করে খাঁ খাঁ - শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে ভগ্নদূত শাঁখা।' - স্বাভাবিক ভাবেই কমলকুমারের মধ্যে শিল্প সম্পর্কে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

যদিও সারাজীবন চিত্রকলার চর্চা করলেও চিত্রকর কখনো হতে চাননি বা কথা সাহিত্যিকও হতে চান নি। কিন্তু নতুন পথের সন্ধান করতে সচেষ্ট ছিলেন সর্বদাই। এই নতুনের সন্ধানেই তিনি গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে বাংলা গদ্যকে নতুন পর্যায়ে দাঁড় করালেন। রচনা করলেন 'জল', 'তেইশ', 'মল্লিকাবাহার' যা তার রচিত প্রথমের 'লালজুতো', 'মধু' 'প্রিন্সেস' গল্পগুলির সঙ্গে বিষয়ে এবং রচনারীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা আলোরণ সৃষ্টি করেছে।

কমলকুমারের সঙ্গে দয়াময়ীর বিয়ে হয় ১৯৪৭-এ ৮ই মার্চ। দক্ষিণ কলকাতার কোন একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই বিয়ে হয়, এবং বিয়ের কিছুদিন পর তারা যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যান। দয়াময়ীকে বিয়ে করার বিষয়ে কমলকুমারের মনেও শেষে দ্বিধা দেখা গিয়েছিল। এই সময়ের ডাইরিতে কমলকুমার লিখেছেন -

> যত দিন যাচ্ছে ততই কেমন ঠেকছে। ভগবান। সে সব দিনের মধ্যে আলো বাতাস ছিল, মিথ্যে ছিল না। আজ মনে হয় ও যেন কোথায় একটু স্বার্থপর। ... আগে ভাবতাম ওর বুদ্ধি আছে কিংবা অহংকার এখন দেখি তা নয় - ওর আছে অজ্ঞতা। তার - দুর্বল শরীর। তাছাড়া মেয়েরা একটু গাধা গোছেরই হয়। ... আমি আর ভগবানের কাছে কিছুই চাইছি না, আমি কিছুই চাই না, শুধু সাহস ... ভয় নেই ভয় নেই।[৬]

বিয়ের পর প্রথম সংসার শুরু করেন আনন্দ পালিত লেনে। কিন্তু সেখানে স্থায়ী বাস হয় নি। ক্রমাগত বাড়ি বদল করা কমলকুমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বিয়ের পর থেকেই তাদের জীবন যে বন্ধুর-পথে চলতে শুরু করে তা দয়াময়ী মজুমদারের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় -

> সেই থেকেই আরম্ভ হল ভয়ানক এক সংগ্রামের জীবন, স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় বহু ব্যতিক্রমই ছিল যেন মনে হয়। ... জীবন আর পরিবেশে ভয়ঙ্কর একটা গরমিল ঠেকত।[৮]

এভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বাসা বদল করে কাটে, কখন হোটেলেও কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত স্থায়ী বাসা বাঁধেন পাতি পুকুরে, যদিও অভাব ছিল সেখানে নিত্যসঙ্গী।

১৯৪৭ সালে দেশ জুড়ে যে দাঙ্গা হয় তাতে কমলকুমার রিলিফের কাজে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান উভয়শ্রেণীর মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন -

আমি রায়টে (Riot) ১৭ আগষ্ট হইতে বহু যারাত্মক ব্যাপার দেখি ১৮ই হইতে বহু রিলিফ করি। কত যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে সেদিন হইতে ঐ ২০ তারিখের মধ্যে গিয়াছি তাহা ঠাকুর জানেন। যতদূর মনে পড়ে ২১ তারিখ হইতে প্রবল বারিপাতে ঠান্ডা হয় - সারাদিন পথে পথে আলো নিভানো হয় নাই কুকুরেরা যে কোথায় কেহ জানে না সে এক বীভৎস ব্যাপার।[৯]

তার লেখা আরো বিবরণ জানা যায় -

সেই দিন কার রায়েট এই গঙ্গা দিয়া অসংখ্য কুপাইয়া কাটা খাবলান দেহ যাহার উপরে বসিয়া কাক ঠোকরাইতে আছে, ভাটার টানে চলিয়াছে - এতই বীভৎস দৃশ্য ইহা যে এই সুউচ্চ ব্রীজে দাড়াইয়া থুথু ফেলিয়াছি, যখন পুলের নীচে প্রায়, আমি পা সরাইয়া লইয়াছি।[১০]

ফরাসী চিত্র পরিচালনা জ্যঁ রেনোয়া ১৯৪৮-এ কলকাতায় আসেন 'দ্য রিভার' ছবির শ্যুটিং করতে। কমলকুমার সত্যজিৎ - এই ছবির থেকে চলচ্চিত্র নির্মানের অভিজ্ঞতা হাতে কলমে অর্জন করেন। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত কমলকুমারের সঙ্গে রেনোয়ার সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে কমলকুমার তাঁকে (রেনোয়া) বলেছিলেন -

বাংলা দেশের ওপর ছবি করতে গেলে হোটেলে থাকলে চলবে না, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, রাস্তা-ঘাটে ঘুরতে হবে রোদে পুড়তে হবে, একপেট খেয়ে গরমকালে বটগাছের ছায়ায় ঘুমতে হবে, জলে ভিজতে হবে, গঙ্গার রূপ দুচোখ ভরে দেখতে হবে।[১১]

কমলকুমার জীবনের একটা সময়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সালে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়, এর কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমলকুমার। এই ফিল্ম সোসাইটি থেকে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিচালক ছিলেন সদ্য হলিউড ফেরত হরিসাধন দাশগুপ্ত। চিত্রনাট্য করবেন সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার ডিটেল এবং শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন। কমলকুমারের মতে - সন্দীপের কিশোর চেলা অমূল্য পুলিশের গুলি খেয়ে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, পুকুরের জলে তার মাথা, দেহ সিঁড়ির ধাপে, অকস্মাৎ শান্তিভঙ্গের ফলে অমূল্যের মাথায় ভাসমান চুনের পাশে গেড়ি গুগলি ভেসে উঠল। [১২] তবে কমলকুমার 'ঘরে বাইরে'র জন্য যে স্কেচ করেছিলেন তার একটাও অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় দেখতে পাননি।

কমলকুমার একেবারে মাটির মানুষের খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন ভারত সরকারের ১৫০ টাকা বেতনের জনগননা বিভাগে চাকরী সূত্রে ১৯৫১ সাল নাগাদ, এ সময় জনগণনা বিভাগে সেন্‌শাস্‌ কমিশনার ছিলেন অশোক মিত্র। এই সময় 'মল্লিকা বাহার' গল্পটি প্রকাশ হয়। কমলকুমার 'হরবোলা' নাট্যদলের (১৯৫২) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিছুদিন, যার সঙ্গে সুনীল গাঙ্গুলি কৈশোরে যুক্ত ছিলেন। কমলকুমার এই সময় ওয়েস্টবেঙ্গল রুরাল আর্টস এ্যান্ড ক্রাফট্‌স-এ কিছুদিন যুক্ত থেকে ললিতকলা আকাদেমি কলকাতা শাখায় কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি মাঝে মাঝেই অজ্ঞাতবাস করতেন এবং কাউকে বাড়ির ঠিকানা দিতেন না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন -

> কমলদা শ্যামবাজার পর্যন্ত এসে তারপর হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যান।

অনেকের মতে তিনি মনমতন মার্জিত, উপদ্রবহীন অথচ কম ভাড়ার বাড়ির জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন, অথবা চরম দারিদ্রের জন্য পাওনাদারদের কাছ থেকে হয়তো পালিয়ে

বেড়াতেন। তবে ১৯৭০ থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত হাজরা রোডের বাড়িতেই কাটিয়েছেন।

১৯৫৫ সালে তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৯-এর মধ্যে 'মতিলাল পাদরী' ও 'তাহাদের কথা' এই দুটি গল্প এবং নবযুগ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি নিয়ে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই উপন্যাস সম্পর্কে রাধাপ্রসাদ গুপ্তের অভিজ্ঞতা হল -

> দেখি হাতে একটা সদ্য ছাপ প্রুফের পাকানো বান্ডিল। পরে দেখলাম সেটা 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বাঁধাবার আগের একটা কপি। তখনও যেন একটু ভিজে ভিজে। কমলবাবু আমায় বললেন - 'পড়ে বোলো কেমন লাগলো। আমি রাত দুপুর অব্দি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। সে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা।[১৩]

এই উপন্যাসটি বাংলা ভাষা এবং উপন্যাসের জগতে এক আশ্চর্য সংযোজন। এই উপন্যাস নিয়ে একদল পাঠকের যেমন মুগ্ধতা, আবার অন্য আর এক দলের ছিল সংশয় অবজ্ঞা। যা লেখক কমলকুমার সম্পর্কে বর্তমানেও রয়েছে। একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধে কমলকুমার সমসাময়িক অন্যান্য রচনার সঙ্গে নিজের সাহিত্য ভাবনা, রীতি, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এবং তার নিজের অবস্থান-ই বা কোথায় সে সম্পর্কেও মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন।

কমলকুমার হাঁপানী রোগে এক সময় ভীষণভাবে আক্রান্ত হন, এই রোগে মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল। তিনি কোন দিনই এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পক্ষপাতি ছিলেন না, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তিরিশ চল্লিশ দশকের লেখকদের সম্পর্কে কমলকুমারের খুব একটা উচ্চ ধারনা ছিলনা, ঐ উক্ত নবতম গোষ্ঠী এমনকী বাংলা

সাহিত্যের কিছুই জানে না, যে এবং চারুবাবুর কাছে শুনিয়াছি পাশ্চাত্য সাহিত্যে সংস্কৃতি বিষয়েতে উহারা নিতান্ত কাঁচা।[১৪] আবার চল্লিশের দশকের বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকীর্তির গুণগান করেছেন কখনো বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার চরণাংশ নিজের গল্পের শিরোনাম করেছেন (অনিত্যের দায় ভাগ)।

১৯৭০-৭১-এর দিকে তিনি সি·আই·টি রোডের বাড়ি ছেড়ে হাজরারোডের বাড়িতে চলে আসেন। কমলকুমার এই সময় প্রচন্ড অর্থ কষ্টে ছিলেন। সুব্রত চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে জানান 'আমার মত মার্বেল জীবন কেহই অতিবাহিত ও নির্বিঘ্নে অর্থাভাব কেহই ভোগ করিবেনা।' কমলকুমার বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনে বাড়তি পয়সা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, প্রয়োজনের তুলনায় অর্থবান হওয়া গ্লানি কর। এই সময় তার নিজের প্রতিও হতাশা এসেছিল। কমলকুমার বেঁচে থাকাকালীন সময়েই নক্শাল আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪২-৪৭ সালের দাঙ্গাতে মানুষের অসহায় অবস্থা আর ৭১-এর নক্শাল আন্দোলনে তরুণদের আত্মাহুতিকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এই ভাবে - "8th

> খুব ভোরে গুলি আর বোমার আওয়াজে উঠিলাম, সতুর নীচে গেলাম ... অবিনাশ ব্যানার্জী লেনের আর সি·আই·টি রোডের মুখে অন্তত কুড়িটা রিভলভার ছুটিতেছে কারণ কেহই তাক্-টাকের ধার ধারে না, অনেকটা Defensive measure যেন machine gun ফলে যাহাকে বলে static লড়াই তাহারা বোমা ছুঁড়িতেছে, তুমি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে শতকরা ৮০ ভাগ এ হেন বিদ্রোহে ১২।১৪ বছরের ছোড়ারা বেশী ফলে এমত রিভলভারের গুলিতে কেহ বলে চারটে কেহ বলে ২টি (মানে সরকারী খবর) পড়িল, তাহারা অল্প বয়সী। নিষ্কণ্টক হইল। আমাদের অঞ্চলে শুনি সি·পি·এম নাই। গত ১১ বা ১২ অক্টোবর সমূলে উপড়ান হইয়াছে। সেদিনের ছোঁড়াদের হাতে ছোরা বগলে ট্রান-জিস্টার, কাহারও মুখে গামছা বাঁধা হা হা করিয়া ছুটিয়াছে

> বোমা হাতে দারুন খেলা। ... কিন্তু যে শালারা আজ ভোটে দাঁড়াইবে। সমাজতত্ত্ববিদেরা অনেক উত্তর তৈরী করিবে বেকার, এবং নানা ব্যাপার।[১৫]

নকশাল আন্দোলন তাঁর মনে বেশ রেখাপাত করেছিল যার ফলে তিনি এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন যেমন 'খেলার অপসরা' কিন্তু এ গল্পটির পান্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, প্রকাশিতও হয়নি কোথাও। এছাড়া 'কালই আততায়ী' গল্পটি কৃত্তিবাস অক্টোবর ১৯৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং 'যামলার শুনানী' নামে আর একটি অসম্পূর্ণ গল্পের পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে।[১৬]

৭০-এর দশকে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই যোদ্ধাদের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা ছিল - যা তিনি 'পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে' একটি নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ১৯৭১ সালে কমলকুমারের মা রেণুকাময়ীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুতে তিনি খুব-ই ভেঙ্গে পড়েছিলেন, একটি চিঠিতে তিনি এই মৃত্যু সম্পর্কে লেখেন -

> মা'র মৃত্যু আমাকে বাক্যহীন করিয়াছে, বাবার মৃত্যু আমাকে খুবই কষ্ট দিয়াছিল, আমার বাবা অতীব স্নেহপ্রবণ Loving ছিলেন কিন্তু তবু মা ছিলেন, এখন তিনি নাই।[১৭]

বস্তির ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নাচ, গান, ছবি আঁকা, নাটক, লেখাপড়া শেখানোর একটি স্কুল খোলেন কমলকুমার, যদিও স্কুলটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কমলকুমারের মধ্যে বৈচিত্র্যের সমাহার দেখতে পাই, বিচিত্র বিষয়েও তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি কখনো ফৈয়াজ খাঁর গান, কখনো গ্রাম্য শিল্পীদের ডোকরার কাজ কখনো মার্সেল প্রুস্তের রচনা, কখনো দুবরাজ পুরের ডাকাতদের চরিত্র কখনো রাম-প্রসাদী গানের ভাষা ব্যবহার, কখনো উইলিয়াম ব্লেকের কাব্য কখনো সোনাগাছির গনিকাদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া আবার কখনো যামিনী রায়ের ছবির বিষয়ে আলোচনা করতেন। এছাড়াও 'আইকম বাইকম', 'ছড়া সংগ্রহ', 'অঙ্কভাবনা' সংকলন ও

সম্পাদনা করেছেন। এক সময় তিনি নাট্য পরিচালনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, প্রযোজনার ক্ষেত্রে অনেক নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কখনো বা কাঠ খোদাই-এর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আবার জলরঙের বহু স্কেচও করেছেন একসময়। আর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যখন দু-একটি উপন্যাস, ছোটগল্প লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তখনই আবার পাঠকদের থেকে যেন কিছুটা স্বেচ্ছায়া নিজেকে সরিয়ে নিলেন। সুনীল গাঙ্গুলী বলেছেন -

> তার মুখের ভাষা অতি জীবন্ত, অর্থাৎ যাকে বলে কাঁচা বাংলা।
> অথচ তিনিই যখন নিজের লিখিত রচনা কয়েক পাতা শোনাতেন,
> সে ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে মাথা ঘুরে যেত।[১৮]

কমলকুমার সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো তার সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা তাঁর সম্পর্কে বেশ উদাসীন ছিল।

১৯৭১ সালে ১-ই ফেব্রুয়ারি ৬৪ বৎসর বয়সে কমলকুমার হাজরা-রোডের বাড়িতে নিঃসন্তান অবস্থায় কার্ডিয়াক আক্রমনে হঠাৎ মারা যান। মৃত্যুর তিন-দিন পূর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিখেছেন সুব্রত রুদ্র। 'শেষ তিন দিন' নামে 'কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি' সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত। এই একই দিনে মারা যান বনফুল। কমলকুমারের মৃত্যুর পর অনেক সমালোচক তার রচনা সম্পর্কে বিবিধ মন্তব্য করেছেন। কমলকুমারের মৃত্যু সংবাদ ১০ই ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। সন্তোষকুমার ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'যৌথ যাওয়া' শিরোনামে লেখেন -

> তার সবটা নেব না কিছু কিছু নেব। বাংলা গদ্যের আর
> একটা দিক খুলে যাবে। তার ব্যবহৃত শব্দনিচয়। প্রয়োগে

> প্রয়োগে তারা জীবন্ময় হয়ে উঠবে। কমলকুমারের কৃতিত্ব দেখা যাবে নানা শব্দ সমবায়ের অভূতপূর্ব ব্যবহারে। সেখানে তিনি মৃত্যুর মুখে থুৎকার ছিটিয়ে সঞ্জীবিত থাকবেন। ... যতদিন বাংলা গদ্য আছে এবং তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ততদিন কমলকুমারের মৃত্যু নেই।[১৯]

স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় লেখা হয় -

> Majumdar has earned a permanent place in Bengali literature, but his contribution to theatre may be more exciting.[20]

যুগান্তর পত্রিকায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন -

> খাঁটি বাঙালিয়ানা বলতে সত্যিই যা বোঝায় কমলকুমারের সাহিত্যে তা ভীষণভাবে জড়ানো। প্রাচীন ঘাটের শ্যাওলার মতন। পোড়ো মন্দিরের চটা ওঠা কাজের মতন।[২১]

খুব বিশেষ ভাবে আলোচিত না হলেও, এরকম কিছু মন্তব্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার জীবিত কালের মতোই মৃত্যুর পরেও পাঠক এবং বিদগ্ধ-মণ্ডলীর একটা বৃহৎ অংশ তাঁর সম্পর্কে নির্বাক। তবে সময়ে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমলকুমার সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ নবীন পাঠকেরা হয়তো অনুধাবন করছে যে কমলকুমার বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন।

কমলকুমারের ছোটগল্প

কমলকুমার ব্যক্তিজীবনে যেমন ছিলেন একজন সাহিত্যিক অন্যদিকে ছিলেন চিত্রকর। কাজেই তার সাহিত্যেও সক্রিয় ছিল তাঁর চিত্রকলা। পিকাসো বলেছেন - "I do not search, I find" - কমলকুমারও চিত্রকে দেখতে পান অত্যন্ত অনায়াস ও সাবলীলভাবে এবং এই চিত্রময়তাতেই তার গল্পের গল্পত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। কমলকুমার যে সময় যুবক,

সে সময়টিতে চারিদিকে যুদ্ধ দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষ এই নিয়েই মানুষের প্রতিনিয়ত পথ চলা। তার সাহিত্য, বিশেষ করে বেশ কিছু ছোট গল্পে এই সময়, সমাজ তার মানুষদের নিয়ে উঠে এসেছে। কমলকুমারের গল্পগুলিকে রচনার ভঙ্গীতে দু-ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম দিকের গল্পে দেখতে পাই সেখানে গল্পেরসই প্রধান হয়ে উঠেছে ('জল' থেকে 'সুহাসিনী পয়েটম' ১৯৪৮-১৯৬৫)। আর অন্য একটি পর্যায়ে ('রুক্মিনীকুমার' ১৯৬৮ থেকে শেষ পর্যন্ত) দেখতে পাই গল্পে গল্পরস অপেক্ষা ভাষার বিচিত্র প্রয়োগ কৌশল, পরীক্ষা নিরীক্ষা-ই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এই পর্যায়েই তার ভাষা ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছে।

কমলকুমারের প্রথম প্রকাশিত গল্প হলো 'লালজুতো' ১৩৪৪ সালে উষ্ণীষ পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি মধুর কিশোর প্রেমের গল্প হলেও গতানুগতিক প্রেমের গল্পের মতো নয়, এটি ভিন্ন প্রকৃতির,এ গল্পে দেখা যায় একটি কিশোর বাজারে নিজের জুতো কিনতে গিয়ে দুটো ছোট ছোট লালজুতো কিনে নিয়ে আসে এবং কিশোরী গৌরীর কোলে তুলে দিয়ে তার মধ্যে মাতৃত্ব দেখতে চায়, এবং নিজেও সে পিতৃত্ব অনুভব করে। মানুষের বিভিন্ন বয়সে বা বয়ঃসন্ধিক্ষনে যে বিচিত্র মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে লেখক এ গল্পে এনেছেন। কিন্তু কমলকুমারের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় এ গল্পের দ্বারা দিক্ নির্দেশ করে না। এই একই সময়ে আরো দুটি গল্প প্রকাশিত হয় 'উষ্ণিষ' পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'প্রিনসেস' এবং পৌষ সংখ্যায় 'মধু'। দুটি গল্পের প্রথমটির মধ্যে রয়েছে সর্বহারাদের প্রতিনিধি কমিউনিষ্ট এক যুবক যে সমাজের অবকাশজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি রাজকুমারী লছমীর মধ্যে সর্বহারাদের জন্য মমতা জাগাতে চেষ্টা করে। আর অন্য গল্পটিতে রয়েছে এক মধুয়ালীর কেবলমাত্র সৌন্দর্যের রোমান্টিক আর্কষনে আকৃষ্ট হয়েছে। এই গল্পগুলি যখন কমলকুমার রচনা করেন তখন তার বয়স মাত্র তেইশ বছর। রচনার ক্ষেত্রে তখনও তিনি নিজস্বতা গড়ে তুলতে পারেননি।

কমলকুমারের শিল্প সৃষ্টির প্রকৃত স্ফুরন ঘটে ১৯৫৫ সালে 'জল' গল্পটির মাধ্যমে। এই গল্পটি এক পথিকৃৎ লেখককে চিনিয়ে দেয়। বন্যাপীড়িত মানুষদের নিয়েই গল্পটি রচিত হয়েছে - কিন্তু 'বন্যা'র বিষয় নিয়ে অন্যান্য লেখকদের থেকে এ রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। প্রথম দিকের গল্পগুলি লেখার পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে (প্রায় ১১ বছর) তিনি এই গল্প রচনা করেন। ইতিমধ্যে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে দেশজোড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম, অভাব, খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় উন্মাদকারী দলের সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। জীবনে পথ চলতে বিচিত্র জীবিকাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়ে ব্যবধান তার পরবর্তী গল্পগুলির পরিবেশকে ও সম্পূর্ণরূপে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। 'জল'(১৩৫৫) গল্পে দেখা যায় - বন্যাপীড়িত দু-জন মানুষ নন্দ আর ফজল এরা দুর্বল এবং ধর্মভীরু মানুষ। এরা অসহায় অবস্থাতেই উপায়ন্ত না দেখে ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরা দুজনেই একই ছদ্ম নাম গ্রহণ করে - 'কানাই' এই কানাই যেন এক তৃতীয় ব্যক্তি, সব দোষ কানাই-এর। "পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভালো লোক, ... - কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন। ... সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই তবু ফজল খতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই।" এরা দুজন যাকে লুণ্ঠন করল সে ধনী নয়, পথচারী তাদের মতোই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কেবল তারা লুঠ করতে সমর্থ হয়েছে। এই বন্যাপীড়িত মানুষদের অসহায়তার প্রতি আমাদের এক ধরনের সহানুভূতি রয়ে যায়। এ গল্প থেকেই কমলকুমারের বাংলা গদ্য অন্য চালে চলতে শুরু করে। দারিদ্র ক্লিষ্ট এই মানুষদের দারিদ্রের পেছনে যে আল্লা বা ভগবান নয় মানুষেরই কারসাজি সেটা তারা বুঝতে পারে না। তাদের কাছে বাবুরা 'তারা লোক ভাল'। বাবুরা যে মাছটা খায় না সেটা তারা দান করে - এই দান নিয়েই ফজলরা তুষ্ট, বাবুদের ভালত্বের গুনগান করে তারা। বাবুদের এই দান, ভালত্ব

মহতের প্রকৃত চেহারা যে কী, সেটা বুঝতে পেরেছিল 'তেইশ'(১৩৫৫) গল্পের এক প্রান্তিক চাষী - আলম।

কমলকুমার যে সময় গল্প রচনা শুরু করেন তখন মহাযুদ্ধ। দেশজুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্ভিক্ষ, তেভাগা আন্দোলন - জীবনের নানা স্তরে একটা অস্থিরতা। এ সময় দেখা যায় ধনী হয়েছে মধ্যবিত্ত কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক হয়েছে প্রান্তিক চাষী আর প্রান্তিক চাষীরা হয়েছে ভূমিহীন। আর অন্যদিকে রয়েছে সমাজে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনী শ্রেণী। 'তেইশ' গল্পে আলমের ভূমিহীন হবার পেছনে তার ভাগ্য নয় একমাত্র বাবুই দায়ী এই বাস্তবতাবোধটুকু আলমের রয়েছে আর সে কারণেই সে 'খেপে ওঠা'র চেষ্টা করে। কিন্তু তার মতো ভূমিহীন চাষীরা তার সঙ্গে একত্রিত হয়ে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয় না। তারা ভাবে একজোট হলেও সর্বনাশ হবে। আলম তার সমগোত্রীয়দের একত্রিত করতে বলে – 'বন্ধু আমরা খেপে উঠতে চাই, অন্য গতিক নাই, খেপে আমাদের উঠতেই হবেক, বিহিত একটা করব - মরণ তুমিও লাগো, কাঙাল দুকী আর আমরা থাকব না ক্ষেপে উঠব।'[২২] কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গী সে পায় না, আলমের প্রতিবাদী মন ভেঙে পড়ে সে আত্মহত্যা নয়, আত্মক্ষয়কেই বেছে নেয় এবং নিজে অন্ধ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে তথাকথিত ধর্ম পিপাসু বাবুদের ধর্মাচরণের সুযোগ করে দেয়।

কমলকুমারের প্রথমদিকের গল্পের মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্যে যে গল্প সবচেয়ে চমকপ্রদ তা হল 'মল্লিকা বাহার'(১৩৫৮)। 'এরকম বিষয় বস্তু নিয়ে গল্প লেখার কথা বাংলায় আগে কেউ চিন্তাও করেন নি।'[২৩] গল্পের ভাষার ক্ষেত্রেও বেশ নতুনত্ব চোখে পড়ে বাংলা বিশুদ্ধ বর্ণনারীতি এতে নেই, এর বাক্য গঠনও ভিন্ন জাতের। "এখনও মল্লিকার আবছ, সে আপনাকে আর এক ভবিষৎ থেকে অদ্য নিরীক্ষণ করে, ... - এ সকলই সদ্য মৃত কোনো জনের সমারোহ বা, আর যে, এই পুরুষোচিত ক্লান্তির

ক্ষেত্রে এ সকল যে, ম্রিয়মান, নিষ্ক্রিয়।' - এ গদ্য বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মানে না। অথচ অনাস্বাদিত পূর্ব একটা ব্যঞ্জনা যে রয়েছে সেটাও ঠিক। তাঁর 'জল' গল্প থেকেই বাংলা গদ্য যে অন্য চালে চলতে শুরু করেছে বোঝা যায় কিন্তু বিষয় বস্তুও এই গল্পগুলিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। 'মল্লিকাবাহার' যে ভাষা ব্যবহারের জন্য চমক সৃষ্টি করেছে তা নয়, বিষয় বস্তুতে ও তা অনন্য হয়েছে। এ গল্পে দেখা যায় দুই নারী পরস্পরের প্রতি শারীরিক আকর্ষণে আবদ্ধ হতে চেয়েছে। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সোনার চাঁদ' গল্পে। এ ধরণের বিষয় নিয়ে গল্প লিখে প্রখ্যাত উর্দু লেখিকা ইসমৎ চুঘতাই পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেটা কমলকুমারের 'মল্লিকাবাহার' নিয়ে হয়নি। তার কারণ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্প অনেকেই ধৈর্য ধরে পড়েন নি, পড়ার চেষ্টা করলেও অনেকে বোঝেন নি।'[২৪] এই গল্পগুলিতে পেইন্টিঙের মতোই তার ভাষা ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ বিবরণ বা বিবৃতিকেও কত পুঙখানুপুঙখভাবে - ব্যক্ত করা যায় সেটা কমলকুমার দেখিয়েছেন - যেমন 'মল্লিকা বাহার' গল্পে - "আয়না এখন, আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে এবার যথাযথই প্রতিফলিত এবং অতীব স্পষ্ট। ... যথা তোরঙ্গ যথা ছেঁড়া মাদুর যথা পিতলের কাঁসার অকেজো তৈজসপত্র, এ সব আয়নায় আসে, আর আসে জানলার মুখোমুখি অন্য জানলা বহির্গত উর্ধ্বগামী বিপুল ধোঁয়ার চরিত্র - আয়নায় গভীরতা, আয়নায় অন্তরীক্ষ শূন্যতাকে পূরণ করেই, এ সত্য।"[২৫]

কমলকুমার তার গল্পে খুব সাধারণ আটপৌরে মানুষদের, তাদের বর্তমানতা - ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। আর সেজন্যই তার গল্পের নর-নারীরা কোথাও-ই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি তারা তাদের পরিবেশ, আচার আচরণ এবং মুখের ভাষা নিয়ে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পের ঘটনাতেও কোন ঘনঘটা নেই, অত্যন্ত ছোট ঘটনা নিয়েই গল্পগুলি সু সু ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন বন্যাপীড়িত গ্রাম্য সরল কৃষক উপান্তহীন

হয়ে লুটেরা হয় (জল) কোন সর্বস্ব খোয়া সহায়-হারা চাষী বিদ্রোহের খোয়াব দেখে (ভেইশ) অবশেষে অন্ধহেলায় প্রেম বঞ্চিত হয়ে সাধারণ একটি মেয়ে হয়ে ওঠে সমকায়ী। 'বাবার বাঁশঢালা কাশির আওয়াজ এবং মায়ের শতছিন্ন নোংরা কাপড় এবং দুজনের আকাশ বার্ধক্যে যে তুফানকে, অপরিসর উঠোনের টোকো গন্ধ, বালিখসা দেওয়ালের ঝুল যে তুফানকে কোনক্রমেই ক্ষুন্ন করতে পারেনি'[২৬] - সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে মল্লিকা ক্রমাগত লড়াই করতে করতে জীবনের তুফানকে উপভোগ করতে পারেনি। আয়না নিয়ে তার যে সাজসজ্জার বর্ণনা লেখক দেন তা যে ব্যর্থ অভিসারের প্রস্তুতি সেটুকু লেখক জানিয়ে দেন শুরুতেই। গল্পের শেষে তারই মতো আর এক ব্যর্থ নারী শোভনার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলায় মত্ত হয়, সোহাগ করে মল্লিকার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তার মুখ চুম্বন করে শোভনা। মল্লিকা আবেশে বিহ্বল হয়ে যায়। শোভনার মুখ নিঃসৃত লালা মল্লিকার গালে লেগে থাকে। এ ভাবেই তারা স্বামী স্ত্রীর অভিনয়ে জীবনের স্বাদ নেয়।

কমলকুমারের প্রথম গল্প গ্রন্থ হল 'নিম অন্নপূর্ণা'। এতে ছিল মাত্র চারটি গল্প - 'নিম অন্নপূর্ণা', 'তাহাদের কথা', 'ফৌজ-ই বন্দুক' এবং 'মতিলাল পাদরী' - এভাবেই সাজানো ছিল, কোন কালক্রম মেনে সাজান হয়নি। কমলকুমারের প্রথমদিকে অধি অধিকাংশ গল্পই সমষ্টি জীবন নির্ভর। কিন্তু 'মল্লিকাবাহার', 'মতিলাল পাদরী' ও 'ফৌজ-ই-বন্দুক' - এই তিনটি গল্পে সমষ্টি মানুষের দ্বন্দ্বময় সংগ্রামী বিষয়কে পরিত্যাগ করে কমলকুমার ব্যক্তি মানুষের মনোগহনের সমস্যাকে গ্রহণ করেছেন। এই একই রকম বিষয় এবং টেকনিক দেখা যায় অনেক পরের 'গোলাপসুন্দরী' গল্পে। কমলকুমারের বেশিরভাগ গল্পই সৃষ্টি হয়েছে 'ভিড় নিয়ে, বা জনসমষ্টি নিয়ে বা ভূখন্ড নিয়ে। সেখান থেকে তার গল্পের সুবাদে একটা বা দুটি চরিত্র প্রধান হয়ে উঠে আসে। উঠে আসার পরও কিন্তু তারা সেই বৃহতেরই অংশ হয়ে থাকে।[২৭] অনেকটা অজন্তা পেইন্টিংসের

যতো। তার গল্পগুলি যেন ছবির কোনো অ্যালবাম, সেখানে পোর্ট্রেট নেই, সবই বড় বড় ছবি, অনেকখানি জায়গা ও অনেক মানুষ নিয়ে, কিন্তু মাঝে মধ্যেই আবার বড় ছবিটির বিশেষ থেকে বিশেষ কোন অংশের 'ক্লোজ আপ' হয়ে যায় 'কিন্তু যতিলাল পাদরী' কমলকুমারের গল্পে বিরল পোট্রেট'।[২৬] এই গল্পের পাদরী ভামরের শিশুকে গ্রহণ করতে চায় 'যিশু' হিসেবে। সেখানে সে পাদরি-গির্জা বাইবেল আর ভামরের শিশুর জীবনের আপাত অসংলগ্নতাকে উপেক্ষা করতে চায়। এই গল্পটি-পাদরির জীবনবোধের আর্তিতেই আর্দ্র হয়ে রয়েছে এই আর্তিই গল্পটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছে। 'আঙ্গিক বিষয় সন্ধানের দিক থেকে কমলকুমারের সবচেয়ে যাকে বলে ট্র্যাডিশন্যাল। বোধহয় এই অন্যতম কারণে এই গল্পটিই তার জনপ্রিয়তম। এর ট্র্যাডিশন - আনুগত্য আসছে পাদরির চরিত্রের অন্তর্গত মানবিকবোধের কেন্দ্র থেকে।'[২৯] এ গল্পে রয়েছে পাদরির একটি জন্ম পরিচয়হীন শিশুকে গ্রহণ করার দ্বিধাদ্বন্দ্বের কাহিনী। শেষ পর্যন্ত তার পাদরির মানবিক-তাই বড় হয়ে ওঠে এবং শিশুটিকে সে গ্রহণ করে। বিভূতিভূষণের 'আহ্বান' গল্পেও রয়েছে এভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে গ্রহণ করার কথা। 'যতিলাল পাদরী' এবং 'তাহাদের কথা' গল্প দুটিতে কমলকুমার সম্পূর্ণ নতুনরীতি অবলম্বন করেছেন। 'এতাবৎকাল সমস্ত কাহিনী লেখা হয়েছে ন্যারেটিভ স্টাইলে, ঘটনা পরম্পরায়। কিন্তু কমলকুমারের রচনায় যখন তখন অতীত বর্তমান-ভবিষৎ মিলে মিশে যায়। ... কমলকুমারের এই সব গল্পে, চরিত্র ও পটভূমির বাস্তব নিছক চাক্ষুষ বাস্তব নয়, মানুষগুলির মাথার পেছনে সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বদলে বদলে যায়। কমলকুমারের সংলাপের ব্যবহারও সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণবাক্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। এক একটি বাক্যের অর্ধেক কিংবা কয়েকটি শব্দেই সব বুঝিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।''[৩০]

'তাহাদের কথা'(১৩৬৫ - দেশ ২০ ও ২৭ শে ভাদ্র) গল্পে দেখা যায় এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর (শিবনাথ) স্বপ্ন ভঙ্গের গ্লানিময়, নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী। এই গল্পে

স্বাধীনতা সংগ্রামী এম.এ পাশ শিবনাথ স্বদেশী করার অপরাধে চাকরি থেকে বহিস্কৃত হয় এবং পাগল হয়। তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী যে এক সময় স্বামীর সঙ্গে স্বদেশীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সে শেষ পর্যন্ত স্বামীর পায়ে শৃঙ্খল পরায়। এই শিবনাথ একদিন দেশকে শৃঙ্খলমোচন করতে চেয়েছিল, ভাগ্যচক্রে তাকেই শেকল পড়তে হয়। কমলকুমার - এই গল্পের পুরো ঘটনা শিবনাথের শিশু পুত্র জ্যোতির চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বলা যায় জ্যোতির চোখকেই লেখক ক্যামেরার লেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জ্যোতি-ই একমাত্র তার বাবার পায়ে শেকল পড়ানোকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না এবং মা, দিদি - এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। জ্যোতি যখন ফিস্ হয়ে ওঠে তার মার বিরুদ্ধে তখন শিবনাথ বলে 'জ্যোতি মারিসনি' এবং লৌহের শৈত্য আপনকার গালে অনুভব করতে বলেছিল - খুব ঠাণ্ডারে খুব ঠাণ্ডা।" প্রকৃত স্বাধীনতাকামীদের স্বাধীনতা উত্তরকালে এ সান্ত্বনাই জুটেছিল 'খুব ঠাণ্ডারে খুব ঠাণ্ডা', যুগের এই ট্র্যাজিক তাৎপর্যকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতেই কমলকুমার গল্পের নাম করণ ও সমষ্টিবাচকতায় এনেছেন।

'তাহাদের কথা' গল্পটি হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে এর অনবদ্য আঙ্গিকের গুণে। দেশের জন্য সে শিবনাথ কারাবরণ করেছিল জেল থেকে বেড়িয়ে সে দেখল স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সমাজে আর কোন মূল্য নেই, সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেছে কিছু অসৎ মানুষ, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে। এ গল্পের নায়ক ছোট বালক জ্যোতি, তার চোখ দিয়ে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে কাহিনীটি আরো মর্মস্পর্শী হয়েছে। সমগ্র গল্পটি জুড়ে রয়েছে একটি বালকের অভিমান। গল্পে কঠোর বাস্তবের পাশাপাশি রয়েছে কবিত্ব, যেখানে দেখা যায় আত্মারাম যারোয়াড়ি নীলকণ্ঠ পাখিকে উড়িয়ে দিয়ে বলে -

> আকাশ পাবি গো, ডর কিরে, আর জন্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরান ... একটি নীল স্পন্দন, মনের কিছু ভাগ বনের কিছু ভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি।

নীলকণ্ঠপাখির প্রসঙ্গ রয়েছে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে আবার কমলকুমারের 'তাহাদের কথা'তে। কিন্তু এই নীলকণ্ঠপাখি দুটি গল্পে দুটি ভিন্ন আবহের সংস্কার করেছে। 'বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে পাখিটি যেন অনেকাংশেই প্রকৃতির বিপুল সংগ্রহশালা থেকে খুঁজে পাওয়া একটি চমৎকার, তবে প্রকৃতিমূলক অনুষঙ্গ নিছক না হয়েও তা প্রধানত প্রকৃতি মূলক কেননা, বনজ উদ্ভিদ যেমন, সেও তেমনি থেকে যায় গ্রামের অর্থাৎ মানব সংস্কৃতির নাগালের বাইরে : পরিত্যক্ত কুটির মাঠে। অন্যদিকে, কমল-কুমারের নীলকণ্ঠ পাখিটিকে যা মনের কিছু ভাগ, বনের কিছু ভাগ দিয়ে গড়া, আমরা ঝুঁকে পড়তে দেখি মানব সংস্কৃতির দিকে যা মানস নির্মাণ, অতঃপর বিমানকারী, তাকে উড়ে যেতে দেখা যায় সংস্কৃতির এক দুরূহতম নির্মাণে তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে।'[৩১] 'তাহাদের কথা' গল্পে কমলকুমার মুক্তি কামনার যে স্বপ্ন, তাকে প্রতীকিত করেছেন শৃঙ্খলিত নীলকণ্ঠ পাখির প্রসঙ্গ এনে। এ গল্পের কঠোর বাস্তবের পাশাপাশি রয়েছে যে কবিত্ব তা গভীর বেদনাবোধ জাগায়।

'তেইশ' গল্পের আলম শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একা লড়াই করে উঠতে পারে নি। কিন্তু 'কয়েদখানা'(১৩৬৬) গল্পের শাহাদ সেই লড়াই-এ সমর্থ হয়েছে। কমলকুমারের প্রথম পর্বের গল্পগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত নিখুঁত, সুন্দর জোরালো গল্প 'কয়েদখানা'। কমলকুমার একজন শিল্পী তাই তার গল্পের বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখনী হয়ে উঠেছে রঙের তুলি। 'কয়েদখানা' গল্পে এ ধরণেরই ছবি রয়েছে -

> টিলার লোকটি তাকে দেখলো। লোকটি ঢ্যাঙা, পুরুষকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের তলে অল্প হিসেবি তীরেনা দাড়ি। মাথায় ছোট গামছার ফেটি, তার গায়ে নক্সা করা ভারি কাঁথা ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদদ্বয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা করা হাঁটু - তার পাশেই আঁটলি মাংস পেশী। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত। কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে।

- সব দৃশ্যই এরকম ছবি, পরিবেশের ইজেলে তেলরঙের আঁকা। এ গল্পের একদিকে রয়েছে ভূমিক অধিকারবোধ এবং অন্যদিকে বাবুশ্রেণীর শোষণের কাহিনী। 'কয়েদখানা' গল্পের মধ্যে দেখা যায় চাষীরা প্রথমক্ষেত্রে নীরবে জমিদারের হুকুম মেনে নিলেও একটা পর্যায়ে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এ বিদ্রোহ আর 'তেইশ'এর আলমের একক বিদ্রোহের মতো নয়, এ বিদ্রোহ অনেক সংগঠিত। এ গল্পের কাহিনীটি উন্মোচিত হয়েছে বেশ ধীর লয়ে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির অত্যন্ত সাধারণ কিছু মানুষকে প্রথমে আনা হয়েছে। এদের কাছাকাছি গ্রামে যে নতুন জমিদার এসেছে তার জমিদারি হালচাল পুরো রপ্ত হয়নি। জমিদারি মেজাজ দেখাতে মাঝে-মাঝে বন্দুক তুলে শূন্যতাকে ভয় দেখায়। এ জমিদার ভাবে প্রজাদের দয়া দেখানো মানেই দুর্বলতা অতএব এই সব প্রজাদের পায়ের নীচে রাখতে হবে। আর সেজন্যই প্রজাদের সে জমিদার বাড়ির দর্শনীয় স্থান কয়েদখানাটা দেখে আসতে বলে এবং মাতলামির ঝোঁকে অকারণে শাহাদের ঘোড়াটিকে মারার প্রতিশোধ নিতে জমিদারকে হত্যা করেছে। গল্পে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রিত দল-ই শাহাদের সঙ্গী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে এ পর্যায়ের কিছু গল্পে 'কমলকুমার আশ্চর্য রকম অসাম্প্রদায়িক'। বেশ কিছু হিন্দু মুসলমান চরিত্র এসেছে, এমন স্বাভাবিক ভাবে তারা মিলে মিশে আছে যে তাদের আলাদা করে চেনাই যায় না।'[৩২] যেমন 'জল' গল্পে বা 'কয়েদখানা' ইত্যাদিতে। এই গল্পগুলির মানুষের একই ধরনের দরিদ্র যাদের হিন্দুত্বে মুসলমানত্বে কোন তফাৎ ঘটে না। কয়েদখানা গল্পে জমিদার বাবু ঘোষণা করেছে 'এটা কাঁদবার জায়গা নয়' এবং কাল সকালেই যেন দখল হিসাব সবাই দিয়ে যায় - না হলে কয়েদে পরতে হবে।'[৩৩] কিন্তু এদের দারিদ্রের খেসারত দিতে করতে চোখের জল ফুরিয়েছে। তাই তাদের কণ্ঠে 'ওহো হো' ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না।'[৩৪] কিন্তু এই দুর্বল

মানুষেরাও যে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে কমলকুমার এ সত্য জেনেছিলেন স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে। এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নাগাতার আন্দোলন ১৩৬৬ সালে রচিত কয়েদখানা গল্প রচনার প্রেরণা হতে পারে। তিনি যে কিছুটা বামমনস্ক ছিলেন সেটা পরবর্তী কালে Now পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি চিঠি থেকে জানা যায়, যেখানে নিজেকে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থক বলে ঘোষনা করেছেন -

> I am a Zealous admirer of U.F.Govt. and I shall continue to be so as long as they are on the right track.[৩৫]

'জল', 'তেইশ', 'কয়েদখানা' - ইত্যাদি গল্পগুলির পর কমলকুমার ভূমি-সংলগ্ন আন্দোলন কেন্দ্রিক বিষয় থেকে কিছুটা সরে আসতে থাকেন। 'তেইশ' গল্পে আলয় বিদ্রোহের জন্য সংগঠিত হয়ে উঠতে চায়, 'কয়েদখানা' গল্পে শাহাজাদ বিদ্রোহী হয়ে সফল হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ গল্পে কিছুটা সুবিরোধ লক্ষ্য করা যায়, কোন সংগঠন সেভাবে গড়ে না উঠেই আন্দোলন হয় এবং চাষীরা সফল হয়। কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে কমলকুমার অন্ত্যবাসী মানুষদের নিয়ে গল্প লিখলেও তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কে সে রকম ধারনা তাঁর ছিল না। সেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছুটা ছিল, যা 'হারানের নাতজামাই' বা 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' ইত্যাদিতে দেখা যায়। সেকারণেই কমলকুমার ক্রমশ এ বিষয় থেকে সরে আসতে থাকেন। এই পর্বে আরো যে গল্প রয়েছে তাদের মধ্যে 'নিমঅন্নপূর্ণা' এবং 'ফৌজ-ই-বন্দুক' উল্লেখযোগ্য।

'নিমঅন্নপূর্ণা'(১৩৬৭) গল্পের বিষয় হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্নাভাবে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি পরিবার। ঘটনায় কলকাতার একটি পরিবারকে গল্পের উপজীব্য করলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ সমস্যা শুধু-মাত্র একটি পরিবারের সমস্যা নয় সমগ্র সমাজেরই সমস্যা। অথবা বলা যায় বৃহত্তর

অর্থে সমস্ত নিম্নবিত্তের সমস্যা। এই মানুষের সৃষ্ট অভাবে মানুষই যে কতখানি অসহায়, এবং মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, মূল্যবোধের ভিত সরে যাচ্ছে, তা অসীম মমতায় লেখক 'নিমঅন্নপূর্ণা' গল্পে দেখিয়েছেন। অন্নাভাব থাকলেও মা নিজেদের হাভাতের দলের সঙ্গে নিজেদের মেশাতে চায় না তাই মেয়েদের চোকর সেধ করে বোঝায় তা ভাতের চেয়ে ভাল, কিন্তু ও পাড়ায় যাতে মেয়ে না বলে সেটাও সাবধান করে দেয়। সমস্ত অবস্থার জন্য যে মানুষের সৃষ্ট যুদ্ধই দায়ী - এই কঠোর অথচ চরম সত্য বাস্তবটুকু লেখক বুঝিয়ে দেন একটি প্রসঙ্গে - সুখীর পাখির জন্য রাখা ছোলা চুরি করে খাওয়াকে কেন্দ্র করে মা প্রীতিলতা এবং সম্বল খেতুর মা - যখন পরস্পরের মুখোমুখি তখন 'এ হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গী বিমান উড়ে গিয়েছিল।' কিন্তু এই প্রীতিলতা-ই বৃদ্ধ ভিখারিকে হত্যা করে তার চাল সংগ্রহ করে প্রীতিলতা তার সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে ধরে বলে 'নে খা তোরা'। এই শ্রেণীর মানুষদের আত্মপ্রবঞ্চনা এবং সমস্ত মূল্যবোধের অনিবার্য মৃত্যুকে লেখক প্রকাশ করেন এই উক্তির মধ্যে দিয়ে। এই গল্পের সঙ্গে কমলকুমারের পূর্ববর্তী লেখক তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী'র তুলনা চলে। কিন্তু অগ্রদানীতে নিজের পুত্রের পিন্ড আহার করে বেঁচে থাকার চেয়েও নিম অন্নপূর্ণার মানুষদের বেঁচে থাকা আরো মর্মান্তিক আরো ভয়ংকর। যে অন্নপূর্ণার কর্তব্য নিরন্নকে অন্নদান করা সে অন্নপূর্ণা-ই আর এক ভিখারিকে হত্যা করে অন্ন দাত্রী তথা নিম-অন্নপূর্ণা হয়ে ওঠে। কমলকুমার তার সমকালে রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে নির্ভর করে যে গল্পগুলি লিখেছেন 'নিমঅন্নপূর্ণা' হয়তো তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা। গল্পটির পরিসমাপ্তিতে পাঠক অনুভব করে এই সময়কার মানুষেরা ভয়ংকর এক সংকটের মুখোমুখি দাড়িয়ে আছে।

'ফৌজ-ই-বন্দুক'(১৩৬৭) গল্পটিতে রয়েছে একটি বিমূর্ত প্রেমের কাহিনী। ত্রিযামগত যুদ্ধের বিস্ফোরণ এবং জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকা সৈনিক

করতার সিং পালঙ্কে শায়িতা রং মশালের ফোয়ারার মত একটি নারী আবিষ্কার করে যার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। প্রথমে ফৌজটি এই কল্পনার রমনীকে ভালবাসে এবং নিজের ভালত্বকে প্রমাণ করতে ঘর থেকে চলে যায় তাকে স্পর্শ না করে। পরে ঘরে ঢুকে সেই রমণীর অন্তর্ধান সহ্য করতে পারে না এবং পাগলের মতো চিৎকার করে বলে 'আই লাভ ইউ' এবং তার ভেতরের 'বদরাগী নাম্বারওয়ালা ফৌজকে সে আর ধরে রাখতে পারল না। হাতের বন্দুক উঠে এল, খুট করে শব্দ হল এবং দেয়ালের মেয়েটির আলেখ্য ঝাঝরা হয়ে গেল।'[৩৬] এই গল্পে দেখা যায় মানুষের মর্মস্থলে যে ভালবাসা বাস করে তাকে মানুষ পেতে চায় কিন্তু সে যখন দূরের বস্তু হয়ে ওঠে তখন মানুষের ক্রোধ জাগে। এই ভালবাসা এবং ক্রোধের সংমিশ্রিত রূপ ধরা পড়েছে এই গল্পে। এই গল্পের লক্ষণ সম্পর্কে অমিতাভ দাশগুপ্ত বলেছেন -

> ... আমাদের শোণিতে 'To rape the beauty'র হীনমন্যতা কখনই যে মরে যায় না তারই একটি বিমূর্ত নান্দনিক রূপ যুগপৎ মরুভূমি ও বৃষ্টির গন্ধ নিয়ে 'ফৌজ-ই-বন্দুক'-এ এসেছে।[৩৭]

এই পর্বে 'মল্লিকাবাহার', 'মতিলাল পাদরী' এবং 'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্পগুলিতে ব্যক্তি সমস্যা তাদের আশা আকাঙখা-ই প্রাধান্য লাভ করেছে। এ সব গল্পের মানুষেরা ও একটু ভিন্ন গোত্রের যাদের সঙ্গে 'জল' 'তেইশ' 'কয়েদখানা', 'তাহাদের কথা' বা 'নিমঅন্নপূর্ণা'র মানুষদের ঠিক মেলানো যায় না। এই সব গল্পগুলিতে রয়েছে সমষ্টি মানুষের সংকট, তথা সমাজে সংকট-সমস্যার কথা, এবং গল্পের মানুষেরাও প্রধানত নিম্নবিত্ত বা ভেঙ্গে পড়া মূল্যবোধের মধ্যবিত্ত মানুষ। লক্ষনীয় হল কমলকুমারের এই সময়ে লেখা উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'তেও রয়েছে সমাজের সমস্যার কথা যেখানে বিদ্রোহী হয়েছে সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের বিরুদ্ধে এক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। শ্মশান চন্ডাল বৈজু চিতার এক কোণে প্রজ্বলিত কাঠের উপর হাড়ি বসিয়ে ভাত ফুটিয়ে নিতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এক সদ্য বিবাহিত নব-যৌবনা

নারীর সদ্য বৈধব্যের ও তার সহমৃতা হওয়ার সম্ভাবনায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিতে এই মৃত্যুর সম্ভাবনাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধে উদ্যত হয়।'[৩৮] অর্থাৎ ছোট গল্প এবং উপন্যাসে এই সময়ে একই শ্রেণীর মানুষের কথা এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে।

মানুষের নৈতিকতা এবং মনজাত সংকট কেন্দ্রিক গল্পে আড়ষ্ট দেখি 'মল্লিকাবাহার'(১৩৫৮)-এ অবশ্য কোন কোন সমালোচক 'মল্লিকাবাহার'এ খানিকটা শ্রেণী সমস্যা রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু 'মতিলাল পাদরী'তে রয়েছে সম্পূর্ণ ব্যক্তি সমস্যার কথা। এরই সার্থক রূপ দেখা যায় 'গোলাপসুন্দরী'(১৩৬০) গল্পে। সমষ্টির সমস্যা থেকে কমলকুমার যেমন ব্যক্তি সমস্যার দিকে ঝুঁকেছেন তেমনি গল্পের পটভূমির ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমষ্টি কেন্দ্রিক মানুষের সমস্যা গড়ে উঠেছে গ্রামাঞ্চল বা শহরতলীকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে ব্যক্তি সমস্যার কাহিনীর পটভূমি হয়েছে কলকাতা বা অন্যকোন নাগরিক পরিমণ্ডল। 'গোলাপসুন্দরী' গল্পের বিলাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ভালবাসাকে অবলম্বন করে, সুস্থ হয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশ্রাম নিতে এল, কিন্তু সেখানেই তার মৃত্যু ঘটল। গল্পের প্রথম পর্যায়ে লেখক স্যানাটেরিয়ামের নিখুঁত বর্ণনায় মৃত্যুর এক কবিত্বময় বাস্তবতাকে রূপ দিয়েছেন। এ গল্পের বিলাসের মৃত্যু কল্পনার উদ্রেক করলেও তা ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে না। জীবন মৃত্যুর রহস্যময় জগৎ-এ চেটি-রই উপলব্ধি হয়েছিল যে সমস্ত ক্ষনস্থায়ী। তাই সদ্য সুস্থ হয়ে ওঠা বিলাসের কাছে যে বুদ্ধ সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য।[৩৯] বলে মনে হয়, সেই বুদ্ধ চেটি-র কাছে হয়ে ওঠে - 'ইহা চলন্ত নিদ্রা অথো ভাষ্যমান এপিটাফ।'[৪০]'গোলাপ সুন্দরী' গল্পের আগে 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে লেখক মৃত্যু সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী - মৃত্যুই

জীবনের শেষকথা নয় আত্মা দেহ পরিবর্তন করে মাত্র, - এই দার্শনিক বোধ 'গোলপ 'গোলাপসুন্দরী' গল্পেও এসেছে। কিন্তু 'গোলাপসুন্দরী' গল্পে অনেক কেন'র উত্তর-ই পাঠক খুঁজে পান না, তাই গল্পে প্রথম শ্রেণীর উপদান এবং পরিকল্পনা থাকলেও গল্পটির ট্র্যাজিক মহিমায় উন্নীত হয়। দেবেশ রায় বলেছেন -

> অত কিছু সত্ত্বেও বিলাস তো কোনো কিছুরই প্রতিনিধি নয়। এমনকী তার নিজেরও নয়। এমনকী, প্রতিনিধিত্বের যে প্রভাব আধুনিকতার একটি উপাদান হয়ে উঠতে পারে বিলাসে সেই অভাবও কোন আত্মসচেতন যাথার্থ্য পায় নি। তাই বিলাসের আসক্তি ও আসক্তি থেকে মৃত্যু কোনো ব্যক্তিগত দুঃখও জাগায় না।[৪১]

কিন্তু অন্যতম সমালোচক বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন -

> এই ত্রিমাত্রিক স্তর পরম্পরা (জীবন-মরণ-সুন্দর ইত্যাদি) মূল রচনা থিমেটিক ঐক্যকে কোথাও ক্ষুন্ন করেনা[৪২] 'গোলাপসুন্দরী' গল্পের পর থেকেই কমলকুমার এক নতুন পথে যাত্রা করেছেন। 'গোলাপ সুন্দরী ও অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশের পর তরুণ লেখকদের মহলে যখন হুলুস্থুল পড়ে গেছে অনেকে তাকে কাল্ট ফিগারে পরিণত করতে চায় তখনই কমলকুমার সরে গেলেন এই সুন্দর রচনারীতি থেকে। তিনি যেন পাঠকদেরও চান না।[৪৩]

কমলকুমারের রচনায় একটা পর্যায় থেকে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তন মূলত ভাষা ব্যবহার এবং বিষয় নির্বাচনে। 'রুক্মিনী কুমার' এবং 'লুপ্ত-পূজাবিধি' থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র

যে ধরণের সাধুভাষার প্রয়োগ করেছেন তার সরলীকরণ ঘটে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রে এসে। প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগেই চলিত গদ্যের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। লিখিত ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য দেবার জন্য চলিত ক্রিয়াপদকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও গ্রহণ করেছেন। এর পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই প্রথম জীবনে সাধুভাষায় লিখেছেন, এই শিল্পীরা ন্যারেশনে সাধু এবং সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ীও প্রথমে সাধুভাষায় লিখে পরে চলিত গদ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কমলকুমার বাংলা সাহিত্যের একমাত্র লেখক যিনি প্রথমে চলিত গদ্যে লিখে হঠাৎ করেই সাধু গদ্যে লিখতে শুরু করেন।

'গোলাপ সুন্দরী' গল্পের পর থেকেই কমলকুমারের গল্পের পাত্র-পাত্রীর শ্রেণী অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে। তার প্রথম দিকের গল্পের মানুষদের শ্রেণীগত অবস্থান ছিল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর পরবর্তী গল্পেই শহরের এলিট শ্রেণীরাই অধিক প্রাধান্য পাচ্ছে। শহরের অবকাশজীবী মানুষদের অসংগতিকেই বিভিন্ন দিক থেকে লেখক দেখাতে চেয়েছেন। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'রুক্মিনীকুমার', 'লুপ্ত পূজাবিধি', দ্বাদশ মৃত্তিকা', 'অজ্ঞাতনামার নিবাস', 'কঙ্কাল এইনজি' 'আমার চোখের জল', কালই আততায়ী', 'অনিত্যের দায়ভাগ', 'স্বাতি নক্ষত্রে জল' ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে খেলার বিচার', 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'খেলার আরম্ভ'। 'বাগান' সিরিজে তিনি কিছু গল্প লেখেন - 'বাগান দৈববানী', 'বাগান কেয়ারি' 'বাগান পরিধি' ইত্যাদি। কমলকুমারের প্রথম দিকের গল্পগুলির মধ্যে 'কয়েদখানা' এবং দ্বিতীয় পর্বের গল্পের মধ্যে 'রুক্মিনীকুমার' - এ দুটির মধ্যে প্রকাশ কালের ব্যবধান আট বছর। কয়েদখানার প্রকাশকাল ১৩৬৬, রুক্মিনীকুমার ১৩৭৪-এ প্রকাশিত। এর মাঝে প্রকাশিত হয়েছে, অন্তর্জলী যাত্রা, 'অনিলাস্মরণে' ও 'সুহাসিনী পয়েটম' - এ তিনটি রচনাই প্রচলিত অর্থে সাধুভাষায় রচিত। অর্থাৎ বলা যায় ১৩৬৬-র পর কমলকুমার তথাকথিত চলিত ভাষা পরিত্যাগ করেছেন। 'কিন্তু তথাকথিত চলিত ও সাধু-ভাষার মধ্যে পার্থক্য তো ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ফেরে এবং বলা বেশি যে কেবলমাত্র

ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ক্ষেত্রে ভাষার কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না।"[৪৪] কমলকুমারের ১৩৬৬র আগে লেখা গল্প এবং পরবর্তীকালের লেখা গল্প থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে ভাষার তুলনা করা যেতে পারে। -

> ... তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য,
> যেমন আছে - এই ভাবে যত্নসহকারে তবু সে চতুর্দিকে
> চেয়েছিল। ল্যাম্পের আলোয় তার হাতটা সে দেখেছিল,
> শীর্ণ, পদদ্বয় - তাই (জল)। - 'শীর্ণ' এখানে শীর্ণ
> হাত পাঠক ঠিক দেখে না, আখ্যাত চরিত্রটির শীর্ণ
> হাতটিকে দেখা ক্রিয়াকে পাঠক দেখতে পান। [৪৫]

'রুক্মিনীকুমার' এবং 'লুপ্তপূজাবিধি' গল্পে রয়েছে যেমন -

> এ যাবৎ এই অস্ত্রটি তাহাকে পীড়িত করিয়াছে, ইহা অনুপস্থিত
> কাহারও অবমাননায় ক্রূর, উপরন্তু আপন আত্মসচেতনাতে
> আঘাত হানিয়াছে, যে পুরুষকার উর্ধ্বমুখীন যাহাকে ইদানীং
> রক্ত উদ্গারের বিভীষিকার মধ্যে সবে মাত্র চিনিয়াছে -
> তাহাকেই যেমন বা বিদ্রূপ নিমিত্তে বর্তমান'[৪৬]।

> গ্রামাঞ্চল বলিতে ঐ বালকটি যাহার ভ্রূতে সূচীমুখ দাগ, তাহার
> চোখের পাতা বারম্বার উঠানামা করিল - ইহাতে বুঝায়
> চিমনীর ধোঁয়া যাহা ক্রমে বিলীয়মান তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে।[৪৭]

- এখানে দেখা যায় 'সঠিক শব্দবাছাই ও শব্দের সংস্থান ও ধ্বনিগত তাৎপর্য বিষয়ে যনস্ক ও যরিয়া সচেতনতায় এই ভাষা ক্রমে রূপ নিয়েছে।'[৪৮] সাম্প্রতিক কালের ছোট-গল্পিকার ভগীরথ মিশ্র বলেছেন যে উৎকৃষ্ট পদ্য হবে সেই আলো যা হিরের শরীরে

পড়াযাত্রই ঝিলিক তোলে নিমেষে, ... শব্দব্রহ্ম। সুচারু ব্যবহারে সে অপীম শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। ... ভাষার শক্তি তার দুর্বোধ্যতায় নয়, ভাষার শক্তি তার রহস্যময়তায়।" [৪৯] - কমলকুমারের গল্পে সেই রহস্যময়তাকে খুঁজে দেখা প্রয়োজন, যা কখনই দুর্বোধ্য নয়। দয়াময়ী মজুমদার কমলকুমারের স্মৃতি চারণায় বলেছেন যে একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন এই ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে - "লেখাটা যদি পড়বার জন্যে ছাপা হয়, আর সেটা যদি পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য হয় তাহলে ... ?" এর উত্তরে কমলকুমার বলেছিলেন যে লেখকদের পাঠক তৈরি করার একটা দায়িত্ব থাকে। [৫০] কমলকুমারের গল্পের বিশেষত্ব হল তার বলার ধরণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'আর্কেয়িজম যা তার ভাষাকে যুগপৎ ফ্লুয়িড ও ইরেকটাইল করেছে যা অনভ্যস্ত পাঠকের সহসা দুরূহ মনে হতে পারে।' [৫১] তাঁর গল্পগুলিতে এক দিকে রয়েছে বিশুদ্ধ সংস্কৃত তৎসম শব্দ, দ্যোতনাময় সংস্কৃত ঘেঁষা নতুন শব্দ ও সেই সব শব্দের অভিনব তাৎপর্যময় ব্যবহার অন্যদিকে একান্ত আটপৌরে সাহিত্যে অপ্রচলিত শব্দ, সেই সঙ্গে মাইকেলী রীতির ক্রিয়াপদ সৃষ্টি is বা are -এর অনুরূপ 'হয়' ক্রিয়াপদ ব্যবহার। তিনি, মানুষ যে স্তরে বা যেমন, যে পারিপার্শ্বিকতায় রয়েছে সে অনুযায়ী-ই ভাষা প্রয়োগ করেছেন যা তার সাহিত্যকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে এবং প্রখর চেতনাবান করেছে। প্রথম পর্বের গল্পে দেখা যায় গল্পের বর্ণনা অংশে একভাষা এবং পাত্র পাত্রীদের কথোপকথনে তাদের নিজ নিজ ভাষা, কেননা ঐ ভাষাতেই বাহ্যবস্তুর অবিকলতা ও যুক্তি ধরা যায়। সুনীল গাঙ্গুলী তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন 'ভাষাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি ?' উত্তরে কমল কুমার বলেছিলেন - দ্যাখ্যো, ভাষা নানা রকম হয়। একই ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করে। সকালে বাজারে গিয়ে একরকম ভাষা, বাবা মায়ের সঙ্গে আর এক রকম ভাষা, প্রেমিকার সঙ্গে অন্য ভাষা, ... সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে সংলাপের ভাষা তা আলাদা হতে বাধ্য।' [৫২]

কমলকুমারের প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের গল্পের আঙ্গিকে ভাষায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বিষয়ে কিছুটা সাদৃশ্য থেকে যায়। প্রথম পর্যায়ে 'তাহাদের কথা' গল্পে রয়েছে অসহায় স্বদেশী যুগের মানুষের কথা। আর একই বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে লিখেছেন 'রুক্মিনীকুমার'(১৩৭৫)। এ গল্পটির বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আপাতভাবে এ গল্পকে মনে হতে পারে নিতান্তই ব্যক্তিক সমস্যা। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসভঙ্গ-বিষয়টি বিংশ শতাব্দীতে প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যক্তি-বিশেষের সমস্যা নয়, বরং তা অনেকটাই একটি শ্রেণী সমস্যা। এদিক থেকেও 'তাহাদের কথা'র সঙ্গে রুক্মিনীকুমারের সাজুয্য রয়েছে। তবে 'তাহাদের কথা' স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবনাথের সুপ্তভঙ্গের গ্লানিময় কাহিনী। রুক্মিনীকুমার গল্পের বিষয় 'অগ্নিযুগের দিগভ্রান্ত পথিক রুক্মিনীকুমারের যোগ ও ভোগের দ্বন্দ্ব'[৫৩] কমলকুমার 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীর চিত্র আঁকতে চাননি। তাই গল্পের প্রথম থেকেই গল্পের আবহ সৃষ্টি করেছেন কলকাতার দূষিত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে - 'কি ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রা গুমট স্যাঁত স্যাঁতে জঘন্য সর্দিল অনুভব, রাত্রে কুকুরের ঘেয়োঘেয়ি, ইঁদুরের উপদ্রব, তৎসহ নর্দমার কুটগলিত শকুন খসী পঁচা ঘর্ম্মাক্ত গন্ধ, যেখানে রুগ্না ভিন্ন সকল স্ত্রীলোকই কামুকী, পুরুষেরা লম্পট।'[৫৪] এভাবেই গঙ্গাতীরের কলুষিত আবহাওয়া ট্রাম-ইনস্পেক্টার গোবিন্দবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রকাশ্যে নগ্ন অবস্থায় স্নান করা - ইত্যাদি কলকাতার নগর জীবনের সর্বাত্মক যৌনতার উপস্থিতি দিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যুক্ত হয় সেই নগরেই বাস করা স্বাধীনতার শুদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবক রুক্মিনীকুমারের অন্তর্গত অস্ফুট রিরংসা। সে নিজে কুষ্ঠরোগ সংক্রমিত হয়েও "সে এখন লবঙ্গলতার সহিত রোগজীবানুতে রক্তে- মাংসে সে এক অদ্ভুত ইনসেস্টুয়াস বোধে সে চমৎকৃত।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিপ্লবী থেকে যায় এবং কলকাতার রাস্তায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এ বিষয়ে রফিক কায়সারের মন্তব্য হলো -

> কমলকুমার এই গল্পে বিপ্লবের তত্ত্বকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রক্তমাংসের মানুষকে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আরাধনাকে দূরে রেখে কমলকুমার তুলে ধরেছেন মানুষের জৈব প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুপুঙ্খকে।[৫৫]

এই বক্তব্যের সমর্থন করে বলা যায়, কমলকুমারের বিভিন্ন গল্পের বিশ্লেষনে এই সত্যই উঠে আসে যে ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের আবেগ তার গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেনি বরং দেখা যায় বৈপ্লবিক আন্দোলনকে তিনি জীবনের নানা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন।

কমলকুমার দ্বিতীয় পর্বের গল্পে কাহিনীগত কাঠামো বর্জন করে কেবলমাত্র খিমকে গল্প করে তুলেছেন। 'নুতপুজাবিধি' গল্পে একটি প্রদর্শনীকে অবলম্বন করে দেখাতে চেয়েছেন যে গোটা ভারতবর্ষ কি ভয়ংকর দারিদ্র ও প্রাচুর্যে বিভক্ত। গল্পে দেখা যায় উচ্চ মধ্য বিত্ত সমাজের বালক বালিকাদের শিশুমৃত্যুর হার সম্পর্কে বোঝানো হচ্ছে চীনেমাটির পুতুল দিয়ে, শিশু মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি এবং অনাহার - এ দুটি বিষয় ঐ বালক বালিকাদের কাছে অজ্ঞাত। গোটা প্রদর্শনীই যে কিভাবে হাস্যকর এবং ব্যর্থ হয়ে ওঠে তা কমলকুমার তির্যকভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। এই শ্রেণী বালিকার সৌন্দর্য প্রীতিকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন -

> ঐ ফুল বজ্র বা সরলরেখা ধরিয়া পড়ে নাই, জিগজাগ ভাবে পতিত হয়, অজস্র মুক্তির গায়ে আঘাতের দরুনই তাহা ঘটে।[৫৬]

এই কৌতুক এবং কটাক্ষ আরো স্পষ্ট হয়েছে 'দ্বাদশমৃত্তিকা', স্বাতিনক্ষত্রে জল' - গল্পে। এই গল্পগুলিতে উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষদের জীবনের শূন্যগর্ভ আস্ফালনকে এবং কৃত্রিম-জীবনের চিত্রকে দেখিয়েছেন যেখানে মানুষেরা পরিচিত হয়ে যায় কিছু সাংকেতিক

শব্দের মাধ্যমে - 'মিঃ' অথবা 'মিসেস' বা 'র' বাবু ইত্যাদিতে মানুষ ক্রমশঃ নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলছে, এবং একেই আধুনিকতার নামাবলী পড়াতে চাইছে। এই শ্রেণীর মানুষদের শিশু প্রতিপালন এবং শিক্ষাকে কমলকুমার কুসংস্কার হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। 'স্মৃতিনক্ষত্রে জল' গল্পে রয়েছে অভিভাবকের পদমর্যাদা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিশুমনের উপর চাপান হয় যার ফলে অসংখ্য শিশুমন পরাস্তরে হত্যা করা হয়। গল্পটির নাম সম্পূর্ণই সাঙ্কেতিক। গল্পের কাহিনীকে বাদ দিয়ে থিমকে গুরুত্ব দেওয়াতে কতগুলি বৈশিষ্ট্য এই পর্বে দেখা যায় যেমন এই গল্পে উপমা ব্যবহার 'অসম্ভব নির্জনতা গোঙার হইতে লাগিল'(স্মৃতি নক্ষত্রে জল) কিন্তু আগের গল্পে উপমা ব্যবহার অন্যরকম 'ঘোড়াটির ঘাড় যেমন বা মাছ পড়া ছিপ'(কয়েদখানা)।

প্রথম পর্যায়ের গল্পে কমলকুমার দরিদ্র মানুষদের অসহায়তা দেখিয়েছেন কৃষক আন্দোলনের বা স্বাধীনতা সংগ্রামের বা বিশ্বযুদ্ধের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে। সেখানে সমষ্টি জীবনের সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাহিনীর থেকে থীম প্রাধান্য পেলেও বা ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রধান হয়ে উঠলেও সেখানে রয়েছে শহরের অভিজাত শ্রেণী বনাম দরিদ্র মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কমলকুমার তার সাহিত্য রচনার মূল লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত স্থির ছিলেন, মাঝখানের কিছু ব্যক্তি সমস্যা কেন্দ্রিক গল্প বাদ দিয়ে। চরিত্রগুলোতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি না করে শ্রেণী হিসেবেই দেখাতে চেয়েছেন সেজন্যই ব্যবহার করেছেন 'র' বাবু ইত্যাদি বিশেষভঙ্গী, এক্ষেত্রে গল্পে সংলাপগুলিও ব্যবহার করেছেন সাধু গদ্যে। অর্থাৎ সংলাপও আর চরিত্রগত না হয়ে থিম নির্ভর হয়ে উঠেছে, যা 'বাস্তব না হলেও অবাস্তব হল না। বিষয়ের অন্তর্গত এক অমোঘ বাস্তবতা উঠে এল এই গল্পগুলির সংলাপের ভাষায়।'[৫৭]

কমলকুমার 'খেলা' এবং 'বাগান' এই ক্রম দিয়ে বেশ কিছু গল্প লেখেন। 'খেলা' নাম দিয়ে তিনটি গল্প এবং একটি উপন্যাস রচনা করেন। কমলকুমার 'লেখা বিষয়ক' নিবন্ধে বলেছেন 'খেলা' ও 'বাগান' এই ক্রম দিয়া অনেক লেখা লিখিয়াছি ইহাতে 'খেলা'তে সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনা সকলে মানুষের সূক্ষ্মতা আর 'বাগান' - এতে মানুষের সম্পর্কবোধ 'সূক্ষ্মতা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।'[৫৮] বাগান সিরিজ সম্পর্কে তিনি একটি চিঠিতে বলেন যে মানুষের সম্পর্কবোধ ভালবাসা কীভাবে 'নয়ছয়' হয় তাই'[৫৯] তাই বাগান সিরিজের বিষয়। এই সিরিজের প্রায় গল্পেরই বিষয় 'কুটনৈতিক সম্পর্কবোধ বা বাপ-বেটা মা-ছেলে ভাইবোন, বর-বৌ সবাই।'[৬০]'খেলা' এবং 'বাগান' - এই ক্রমের গল্পগুলির আগে 'শ্যামনৌকা' নামে একটি গল্প রচনা ১৩৭১-এ। এ গল্পে যে মৃত্যুচেতনা এবং জীবনের প্রতি আসক্তি রয়েছে তার সঙ্গে 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে - যেখানে কালাচাঁদ বলছে - "পৃথিবীতে আবার যদি আসি, আমি আসবোই ... ভালবাসা দিও ...। আর 'অন্তর্জলী যাত্রা'তে রয়েছে সীতারাম বলছে "বউ তুমি আছ বলে বড় বাঁচার সাদ হচ্ছে।" অথবা সীতারাম যশোবতীকে যেখানে বলছে - 'এ জীবন গেল কি হয়েছে ? আবার জন্মাব, আবার ঘর পাতব।'

কমলকুমার 'খেলা' সিরিজ দিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন সেটা তার কিছু চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। চতুরঙ্গ সম্পাদককে এ বিষয়ে লিখেছিলেন -

> আমার কাছে একটি লেখা আছে তাহা প্রায় আপনার কাগজে ১০০-পৃষ্ঠা হইবে। গল্পটি নকশাল বিষয়ে আমাদের প্রেম। গল্পটার নাম 'খেলার অপসরা' ...।[৬১]

আর সাময়ের আনোয়ারকে লিখেছেন 'খেলার মীমাংসা ৫০ পৃষ্ঠা কপি করিয়াছি।'[৬২] এছাড়া নির্মাল্য আচার্যের একটি চিঠি থেকে জানা যায় কমলকুমারের কাছে একটি

গল্প ছিল যার নাম খেলার তারিখ।'[৬৩] কিন্তু চিঠিতে উল্লেখিত একটি গল্প ব্যতীত অন্য কোন গল্প সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না, এবং পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। কমলকুমার একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং 'খেলা' সিরিজের কিছু গল্পের শুরুতে রামকৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে। 'খেলার বিচার' গল্পের আউন্ড এ রকম 'মাধবায় নমঃ, তারা ব্রহ্মময়ী মাগো জয় রামকৃষ্ণ। ঠাকুর করুন যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য - আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি।'[৬৪] 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'অনিত্যের দায়ভাগ' গল্পগুলির আরম্ভ এরকম। এই সিরিজের গল্পে যে বিষয়গুলি এসে যায় তা হল নকশাল আন্দোলন, বিচার ব্যবস্থার প্রহসন, অথবা বিশুদ্ধ গ্রাম্য জীবন। এই গল্পগুলি থিম সম্পর্কে কমলকুমার অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন - তার মতে 'খেলা'তে সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা সকলে মানুষের সূক্ষ্মতা চিত্রিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'কালই আততায়ী' (১৯৮০) এবং 'মামলার শুনানী' (অপ্রকাশিত অসম্পূর্ণ গল্প)। এদের বিষয়ও নকশাল আন্দোলন। সেদিক থেকে গল্পগুলিকে খেলা সিরিজের গল্পই বলা যেতে পারে। 'খেলা আরম্ভ' গল্পে রয়েছে 'নকশাল আন্দোলন' সম্পর্কে আমাদের সেই প্রেমের কথা যা অত্যন্তই হাস্যকর। একশ্রেণীর মানুষ যারা বরাবরই আন্দোলনের বাইরে থেকে গা বাচিয়ে চলে তাদের কাছে 'আন্দোলন কথাটা কত না ভালবাসি ... কেমন দারুণ মিষ্টি।'[৬৫] এই গল্পটির শেষে কমলকুমার একটি চিঠিতে লিখেছেন - 'গল্পের রগড় পাইবে - গল্পের যন্ত্রণাতে যাইবেক না।'[৬৬] কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি গল্পটিতে যন্ত্রনাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। এই অন্ধকার যুগের আততায়ী যে 'কাল'ই সেই অনুভব দেখা অন্য একটি গল্প 'কালই আততায়ী'তে। 'খেলার দৃশ্যাবলী' গল্পে দেখা যায় বিচার ব্যবস্থা কিভাবে প্রহসনে পরিণত হয়েছে, কমলকুমার ব্যঙ্গের ছলে বলেছেন 'বিচার যাহারা করিবেন তদীয় পরচুলার নীচে চমৎকার বাগিচা করা টেড়ী ছিল।'[৬৭]

এই গল্পে যে যুবকটি জেলে আছে, তার জেলে যাবার পেছনে যে বাস্তবতা রয়েছে পাঠককে লেখক সুকৌশলে সেদিকে নিয়ে যান। এই গল্পের 'সে' প্রকৃত পক্ষে পৃথকভাবে একক থাকে না অনেকের মধ্যে সে 'একটি নহে আর' - এই অনুভব জন্মে।

'খেলার বিচার'(১৯৭৮ কৌরব পত্রিকা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) গল্পে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ গ্রামে এক বাড়ি থেকে ভূড়িভোজন করে ছাঁদা বেঁধে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে অসুস্থ হয়। তার দুই শিশুকে তখন সাহায্য করে এক 'গোবর কুড়ানী বুড়ি' যার সঙ্গে যোগ দেয় কাচে ডর দেওয়া এক জাত ভিখিরি কিন্তু অদূরে বসে থাকা তিনবাবু সাহায্যে অংশ নেয় না। এখানে দেখা যায় সমাজের যারা দরিদ্র বঞ্চিত তাদের প্রতি কমলকুমারের এক ধরণের সহানুভূতি আর সমাজের অন্য স্তরে থাকা তথাকথিত ভদ্র মানুষদের প্রতি তির্যক ব্যঙ্গ। কমলকুমারের পূর্বসূরী - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পেও ছিল সমাজের নীচু তলার মানুষদের প্রতি এই সহানুভূতি এবং সমর্থন। দারিদ্র্যের জন্যই এই ব্রাহ্মণ ভোজন লোভী এবং সে ছাঁদাবাধাতে প্রবৃত্ত হয়। এই পর্যায়ের গল্পগুলিতেও রয়েছে কমলকুমারের সেই সমাজ-চেতনা। অর্থাৎ ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও লেখক তার ভাবনার মূল ধারাকে প্রথম থেকেই বজায় রেখেছেন। কিন্তু 'খেলা' সিরিজের মতো 'বাগান' সিরিজেও গল্পগুলিতে ভাষা অনেক জটিল এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির ক্ষেত্রেই ভাষার চক্রব্যূহ গড়ে উঠেছে। যা ভেদ করে সাধারণ পাঠক মূল রস গল্প গুলি থেকে আহরণ করতে পারে না।

আলোক সরকার 'কমলকুমার মজুমদার মানুষ ও ভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন 'ideal beauty' মালার্মের অনিষ্ট ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'ভাবের স্বাধীন লোক', কমলকুমারের অনিষ্ট ছিল 'Ideal Man' উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজন মালার্মে কবিতাকে

স্বয়ং সম্পূর্ণ সংগীতের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, কমলকুমার ভাষার প্রচলিত অন্বয় ভেঙে এবং নিবিষ্ট একক প্রতীক ব্যবহার করে তার 'Ideal Man' র জীবন যাপন। তার বিশুদ্ধতাকে অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কমলকুমারের ভাষার যে প্রাচীনগন্ধী রহস্যময়তা, মনে হয় তাও এই লক্ষ্যের প্রতি নিবিষ্ট। " ... আদর্শ মানুষের সরল অকপট জীবন যাপনের উপস্থাপনার প্রয়োজনে ভাষাকে অতিরিক্ত, এবং কখনো বা আপাত অপ্রয়োজনীয় অলংকার পরিয়েছেন। বিশুদ্ধ অকলুষ মানুষ রহস্যময় অকপট সরল মানুষের বর্ণনার তাগিদে এটা আবশ্যক ছিল।[৬৮]

কমলকুমারের ভাষা প্রসঙ্গে অবশ্য অনেকেই বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাদের অভিযোগের প্রধান সূত্রই হল যে কমলকুমারের লেখার বিষয় ও ভাষার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই এবং সে ভাষা জীবন চিত্রনে একেবারেই অচল। নবণীতা দেবসেন এই প্রসঙ্গে তার 'পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং অথবা সিদ্ধান্তচিত্রকের শব্দ সাধনা' প্রবন্ধে নানা অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন -

> মানুষে মানুষে যোগস্থাপনেই ভাষার উদ্দেশ্য তাই ভাষাকে নির্ভর করতে হয় কিছু সংখ্যক প্রতীকের উপরে। তার কাজ কেবল সংকেত সরবরাহ করাই নয়, তার অতিরিক্ত কিছু, এবং এই অতিরিক্ত অংশটুকু থেকেই ঘটে সাহিত্যের উৎসরণ। সাহিত্য মানেই সংগ, সংসর্গ, একক্রিয়াম্বয়িতা, অখণ্ডতা। ... এর অর্থ ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। কমলকুমারের সাহিত্য এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ।[৬৯]

আবার বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত তার 'সেভাষা ভুলিয়া গেছি'[৭০] প্রবন্ধে কমলকুমারের ভাষা ভঙ্গির স্মরণীয়তা এবং বলিষ্ঠতার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। রফিক কায়সার তার 'কমলপুরাণ' গ্রন্থে বলেছেন -

"এই সাধ্যভাষার কোন রকম সামাজিক কিংবা সাহিত্যিক ভিত্তিভূমি নেই। মিশনারী রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষার সঙ্গে কমলকুমারের গদ্যই আপাত লক্ষ্য করা গেলেও সাদৃশ্যের পরিমান স্বল্প এবং পরিমিত। কোন রকম সামাজিক ভিত্তিভূমি ব্যতিরেকে লেখকের খেয়াল খুশিতে এই ভাষা গড়ে উঠেছে।" [৭১]

কিন্তু কমলকুমারের জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম গবেষক হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের যুক্তি ভিন্নতর। তাঁর মতামতকে সমর্থন করেই বলা যায় যে - ভাষার প্রকৃতি হলো চলমানতা এবং সেটা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথে বা রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দে অথবা অতি আধুনিক যুগে প্রবাহমান। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষারও নব নব উন্মেষ ঘটে, আর সেই অনুসঙ্গে কমলকুমারের ভাষাভঙ্গিকে নবপ্রকাশ বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভাষা নিয়ে এই বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মূলে তার লক্ষ্য ছিল 'ভাষার বর্ণনাত্মকতার সঙ্গে নানা আর্ট-ফর্মের অনুষঙ্গ ও সূক্ষ্মতা আরোপ এবং সেই সঙ্গে ভাষাকে রূপাত্মক করে তোলা।' [৭২] এছাড়া বলা যায় ব্যাকরণের নিয়মশৃঙ্খলাকে খানিকটা উপেক্ষা করে শব্দকে অনভ্যস্ত স্থানে বসিয়ে শব্দের উপর বহুতর মাত্রারোপ করেছেন, সেই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষকে তার সমাজ পরিবেশসহ এক বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আঁকতে গিয়ে ভাষাকে সেই বৃহত্তর অনুষঙ্গে ক্লাসিকধর্মী করে তুলেছেন।

'বাগান' সিরিজে কমলকুমারের চারটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, এগুলি হল 'বাগান লেখা' (১৯৭৫-জার্নাল) বাগান দৈববানী (গোলকধাধা মে ১৯৭৮), বাগানকেয়ারি

(বারো মাস, ১৩৭৮) এবং বাগান পরিধি (শিরোনাম ১৩৭৮)। এছাড়া কিছু 'বাগান' সিরিজের রচনার উল্লেখ বিভিন্ন সূত্রে রয়েছে যেগুলি প্রকাশিত হয়নি বা পাওয়া যায়নি। বাগান সিরিজের গল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমলকুমার জানিয়েছেন 'বাগান' এতে মানুষের সম্পর্কবোধ সূক্ষ্মতা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।'[৭৩] 'বাগান লেখা' গল্পটিতে মানুষের এই সম্পর্কবোধের সূক্ষ্মতাকে বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন। গল্পটি ছোট ছোট কতগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন 'স্বপ্ন', 'মরণ', 'বেদান্ত', 'সংবাদপত্র' 'পুলিশ', টেলিফোন', 'বস্তি', 'বাড়ি', 'যুবতীর কথা' প্রভৃতি। বিভিন্ন থিমকে বিভিন্ন অংশে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোন অংশেই কাহিনী নেই। গল্পরস এখানে প্রাধান্য পায়নি বরং দার্শনিকতা পূর্ণবাক্যে রচনাভারাক্রান্ত হয়েছে। গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্য এবং দুরূহ। ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাই এ গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। 'বাগান' সিরিজের শ্রেষ্ঠ গল্পহল 'বাগান কেয়ারি'। একটি শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে গল্পটি গড়ে উঠেছে, মৃত্যুর স্বরূপ কী সেটাই যেন লেখক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই সব শ্রমজীবী মানুষেরা বেঁচে থেকেও কোন পরিচয় পায় না মৃত্যুও হয় তাদের নাম গোত্রহীন ভাবে, মৃত অবস্থায় মৃত বলেও প্রত্যাখ্যাত হয়। পৃথিবী থেকে শ্রমিক বলেও সে স্বীকৃত পায় না। দারোগা তাকে 'ক্রিমিন্যাল' বলে চিহ্নিত করে। এখানে রয়েছে কমলকুমারের সেই সমষ্টি চেতনা। এই সব শ্রমিক মানুষের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে পুণ্যলোভী পুণ্য সঞ্চয় করে। আর বিজ্ঞজনেরা দার্শনিকতা পূর্ণ মন্তব্য রেখে তাদের বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে কমলকুমার গল্প কাহিনীকে প্রাধান্য দেননি, আঙ্গিকগত পরীক্ষা সে তুলনায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে সেই সঙ্গে ভাষার দুরূহতাও লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এই 'বাগান কেয়ারি' গল্পটি ব্যতিক্রম।

কমলকুমারের মৃত্যুর পর কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ গল্পই অন্যের লেখনীতে সম্পূর্ণরূপ পেয়েছে। 'যেমন 'বাবু', জাস্টিস'

ইত্যাদি গল্পগুলি দয়াময়ী মজুমদার সম্পূর্ণ করেছেন। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'কাল-ই আততায়ী' (১৯৮০) এবং 'আমোদ বোষ্টমী' (১৯৮৮ দেশ)। কমলকুমার বেঁচেছিলেন পয়ষট্টি বছর। কিন্তু সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছেন শেষ কুড়ি বছর। গল্প লিখেছেন তিরিশটি এর মধ্যে কয়েকটি অসমাপ্ত। প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলি ভাবনার ঐশ্বর্যে, পুঙখানুপুঙখ নির্মিতিতে, কাব্য ও চিত্র শিল্পের মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলি ভাষার দুরূহতার পাঠকের রসগ্রহনে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু একথা স্বীকার করেও বলা যায় যে কমলকুমারের প্রথম পর্যায়ের লেখাতে যে ভাবনা ছিল অর্থাৎ সমষ্টি চেতনা সেটা শেষ পর্যায়ের গল্পগুলিতেও রয়েছে অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতাকে তিনি বজায় রেখেছিলেন।

—— 0 ——

তথ্যপঞ্জী

১. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমার মজুমদার, জীবন ও সাহিত্য, অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, ১৯৯০, পৃ.১

২. তদেব, পৃ.৫

৩. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমার মজুমদার, জীবন ও সাহিত্য, অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৯০, পৃ.৭

৪. কমলকুমার মজুমদার - পিঞ্জরেবন্দিয়াস্তক (উপন্যাস), সুবর্ণরেখা, ১৯৭১

৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত - 'নিজেকে নিজে', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭১

৬. কমলকুমার মজুমদারের চিঠি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে ১৭.১২.৭১ মিনি বুক প্রকাশ তারিখ নেই।

৭. ডায়েরি কমলকুমার মজুমদার ১৬ই জানুয়ারি - হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, ১৯৯০

৮. দয়াময়ীর স্মৃতিতে কমলকুমার মজুমদার - সাক্ষাৎকার সুব্রত রুদ্র - আজকাল ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫

৯. চিঠি, কমলকুমার মজুমদারে সুব্রত চক্রবর্তীকে ৬.১২.৭০ - হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ।

১০. তদেব

১১. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত - কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরোন কথা - শব্দ পত্র - সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

১২. সত্যজিৎ রায় - 'কমলবাবু', সমতট, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১৩. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত - কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরোন কথা - শব্দ পত্র, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

১৪. কমলকুমার মজুমদার - লেখা বিষয়ক, জার্নাল সওর, শারদ সংখ্যা ১৯৭৬

১৫. চিঠি কমলকুমার মজুমদারের সুব্রত চক্রবর্তীকে ৬.১২.৭০ - মালা চক্রবর্তীর সংগ্রহে।

১৬. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - 'কমলকুমার, জীবন ও সাহিত্য' - অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ।

১৭. চিঠি কমলকুমার মজুমদারের সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে ১৮.১.৭২, মিনিবুক

১৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - বাংলা ছোটগল্পের তিন শিল্পী, দেশ পত্রিকা ৩০শে ১৯৯২

১৯. সন্তোষকুমার ঘোষ - 'যৌথ খাওয়া' - আনন্দবাজার পত্রিকা ১০.২.৭১

২০. Kamal Majumdar death'- Statesman, 10.2.79

২১. অমরেন্দ্র চক্রবর্তী - 'কমলকুমারের মৃত্যু' - যুগান্তর পত্রিকা ১০.২.৭১

২২. কমলকুমার - 'তেইশ' - কমলকুমার গল্প সংগ্রহ - সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৪৩

২৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - ছোটগল্পের তিন শিল্পী, দেশ, ১৯৯২, ৩০ মে,

২৪. তদেব

২৫. কমলকুমার মজুমদার - 'মল্লিকাবাহার' - কমলকুমার গল্প সমগ্র, সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৫৭

২৬. তদেব

২৭. দেবেশ রায় - তেইশ বছর আগে পরে, শব্দ পত্র পৃ.৮১

২৮. তদেব

২৯. তদেব

৩০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - বাংলা ছোটগল্পের তিন শিল্পী - দেশ ১৯৯২ ৩০ মে।

৩১. অনিরুদ্ধ লাহিড়ী - পিতাপুত্রর দায়ভাগ ও ভবিতব্য, শব্দপত্র, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

৩২. সুনীল গাঙ্গুলী - বাংলা ছোট গল্পের তিনশিল্পী দেশ ১৯৯২, ৩০ মে

৩৩. কমলকুমার মজুমদার - 'কয়েদখানা' গল্পসমগ্র সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২ পৃ.১৩৬

৩৪. তদেব

৩৫. চিঠি Now পত্রিকার সম্পাদককে, কমলকুমার মজুমদারের - ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ।

৩৬. কমলকুমার মজুমদার - ফৌজ-ই-বন্দুক - গল্পসমগ্র, সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১০৩

৩৭. অমিতাভ দাশগুপ্ত - নিম অন্নপূর্ণা প্রসঙ্গে, সৃজনী

৩৮. অশ্রুকুমার সিকদার - অন্তর্জলী যাত্রার ঘোর বাস্তবতা - আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস - দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩

৩৯. কমলকুমার মজুমদার - 'গোলাপ সুন্দরী'

৪০. তদেব

৪১. দেবেশ রায় - 'তেইশ বছর আগে পরে' - শব্দপত্র, আশ্বিন ১৩৯১

৪২. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত - কাব্যবীজ ও কমলকুমার, নবার্ক পৃ.১৫

৪৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - ছোট গল্পের তিনশিল্পী, দেশ ১৯৯২, ৩০ মে।

৪৪. সুব্রত চক্রবর্তী - শ্রীকমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত - এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২

৪৫. তদেব

৪৬. কমলকুমার মজুমদার - মুক্তিনীকুমার, গল্পসমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১৭০

৪৭. কমলকুমার মজুমদার - লুপ্তপূজাবিধি, গল্পসমগ্র - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১১০

৪৮. সুব্রত চক্রবর্তী - শ্রীকমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২

৪৯. ভগীরথ মিশ্র - 'ভাষার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্র হলো ব্যথা', দ্যোতনা, সপ্তদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪০২

৫০. দয়াময়ী মজুমদার - 'আমাদের কথা', কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি - সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত।

৫১. সুব্রত চক্রবর্তী - শ্রীকমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২

৫২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - 'ছোট গল্পের তিন শিল্পী, দেশ, ১৯৯২, ৩০মে

৫৩. রফিক কায়সার - কমলপুরাণ, প্যাপিরাস প্রেস, ঢাকা ১৯৮১, পৃ.১৪

৫৪. কমলকুমার মজুমদার - রুক্মিনীকুমার, গল্পসমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১৭০

৫৫. রফিক কায়সার - কমলপুরাণ, প্যাপিরাস প্রেস ঢাকা ১৯৮১

৫৬. কমলকুমার মজুমদার - লুপ্ত পূজাবিধি, গল্প সমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গাঙ্গুলী ১৯৯২, পৃ.১১০

৫৭. হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমার জীবন ও সাহিত্য, - অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৮. কমলকুমার মজুমদার - লেখা বিষয়ক, জার্নাল ৭০, ৫ম সংখ্যা ১৯৭৬

৫৯. কমলকুমারের চিঠি সুব্রত চক্রবর্তীকে

৬০. তদেব

৬১. চিঠি - কমলকুমার মজুমদারের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে ২৪.১২.৭৮, চতুরঙ্গ

৬২. চিঠি - কমলকুমার মজুমদারের সাময়ের আনোয়ারকে ২.২.৭৬

৬৩. চিঠি - কমলকুমার মজুমদারের নির্মাল্য আচার্যকে ৬.৩.৬৭

৬৪. কমলকুমার মজুমদার - খেলার বিচার - গল্প সমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ. ১২১

৬৫. কমলকুমার মজুমদার - খেলার আড্ডা, গল্পসমগ্র, সম্পাদনা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.২৬৬

৬৬. চিঠি - কমলকুমারের নির্মাল্য আচার্যকে, হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

৬৭. কমলকুমার মজুমদার - খেলার দৃশ্যাবলী - গল্প সমগ্র, সম্পাদনা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.২১৮

৬৮. আলোক সরকার - কমলকুমারের মানুষ ও ভাষা, সমতট, জুলাই - সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৬৯. নবনীতা দেবসেন - পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং অথবা সিম্বাতান্ত্রিকের শব্দসাধনা, চতুরঙ্গ মাঘ ১৩৮৪

৭০. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত - কাব্যবীজ, ১৯৮৫

৭১. রফিক কায়সার - কমলপুরান, প্যাপিরাস প্রেস, ঢাকা, ১৯৮১

৭২. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমারের জীবন ও সাহিত্য (অপ্রকাশিত, গবেষণাসন্দর্ভ)

৭৩. কমলকুমার - লেখা বিষয়ক, জার্নাল ৭০, ৫ম সংখ্যা, ১৯৭৬

কমলকুমারের রচনাপঞ্জি -

লালজুতো । গল্প । উষ্ণীষ । ভাদ্র ১৩৪৪—

প্রিনসেস । গল্প । উষ্ণীষ । আশ্বিন-কার্তিক ১৩৪৪

মধু । গল্প । উষ্ণীষ । পৌষ ১৩৪৪

বঁধু । কবিতা । উষ্ণীষ । পৌষ ১৩৪৪

জল । গল্প । সাহিত্যপত্র । কার্তিক ১৩৫৫

তেইশ । গল্প । চতুরঙ্গ । কার্তিক-পৌষ ১৩৫৫

রীতির রহস্য । প্রবন্ধ । চতুরঙ্গ । বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৬

চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার । প্রবন্ধ । চলচ্চিত্র । আশ্বিন ১৩৫৭ । পুনর্মুদ্রণ
পরিচয় । ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৭০

আত্মহত্যা । গল্প । সচিত্র ভারত । ২৮শে পৌষ ১৩৫৭

প্রতিমা পয়জার । ফিচার । সচিত্র ভারত । ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

সংগীত । ফিচার । চতুরঙ্গ । বৈশাখ - চৈত্র ১৩৫৭

মল্লিকা বাহার । গল্প । চতুরঙ্গ । বৈশাখ -আষাঢ় ১৩৫৮

সংগীত । ফিচার । চতুরঙ্গ । শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৫৮

জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রচনাগুলি :

1. Pith and Pith Industry Compiled.
2. Small boxes of various kinds compiled.
3. Two small industries using cloth compiled
   a) The Umbrella.
   b) Oil Cloth.
4. The biri industries compiled.

5. Fishing in Bengal compiled.

6. Native Pottery compiled.

7. The brush industries.

8. The indigenous manufacture of Iron.

9. Brass and bell metal industries.

10. A list of iron implements in common use.

11. Gold work - Census report, Part-IC, 1955.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠান' সমালোচনা । গ্রন্থসমালোচনা। চতুরঙ্গ । মাঘ -চৈত্র ১৩৬৪

মতিলাল পাদরী । গল্প । দেশ । ২২শে চৈত্র ১৩৬৪

বিমল করের উপন্যাস 'দেয়াল' সমালোচনা । গ্রন্থ সমালোচনা । চতুরঙ্গ । বৈশাখ -আষাঢ় ১৩৬৫

তাহাদের কথা । গল্প । দেশ (দুটি সংখ্যায়)। ২০ এবং ২৭শে ভাদ্র ১৩৬৫

অন্তর্জলী যাত্রা । উপন্যাস । নবরং । আশ্বিন ১৩৬৬

কয়েদখানা । গল্প । পরিচয় । (দুটি সংখ্যায়) পৌষ এবং মাঘ ১৩৬৬

নিম অন্নপূর্ণা। গল্প । বক্তব্য । বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৭

ফৌজ-ই-বন্দুক । গল্প । কৃত্তিবাস । শ্রাবণ ১৩৬৭

গোলাপ সুন্দরী । এক্ষণ । এপ্রিল-মে ১৯৬১ । পুনর্মুদ্রণ : কৃত্তিবাস । মাঘ ১৩৮২

রোজনামা । ফিচার । (ধারাবাহিক রচনা) জনসেবক । ৬, ১৩, ১৭ ফাল্গুন ১৩৬৮

ঢোকরা কামার । প্রবন্ধ । সুন্দরম । ১৩৭০

অনিলা স্মরণে । নভলেট । দর্পণ । শারদীয় ১৩৭১

শ্যামনৌকা । গল্প । এক্ষণ । ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৭১

লীলাবতী । অনুবাদ । অঙ্কভাবনা । জানুয়ারি ১৯৬৫

শ্যামনৌকা । উপন্যাস । সরাসরি গ্রন্থাকার মুদ্রিত । প্রকাশিত হয়নি। অসম্পূর্ণ । (১৯৬৪-৬৯)

সুহাসিনীর পমেটম । উপন্যাস । কৃত্তিবাস । শারদীয় ১৯৬৫

বাংলার মৃৎশিল্প । প্রবন্ধ । ধারাবাহিক, চারটি সংখ্যায় । সমকালীন । অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ১৩৭২

পরিপ্রেক্ষিত । প্রবন্ধ । দর্পণ । ৬-৫-৬৬

অভিনয় ও কিংবদন্তী । প্রবন্ধ । ফিল্ম । ১৯৬৬ বার্ষিক সংখ্যা ।

বঙ্গীয় শিল্পধারা । প্রবন্ধ । এক্ষণ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ । পুনর্মুদ্রণ : পরিক্রমা । প-ব-প্রদেশ কংগ্রেস স্মারক পত্রিকা ১৯৭২

রুক্মিনীকুমার । গল্প । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৭৫

কঙ্কালের টঙ্কার । নাট্যরূপ । অন্বীক্ষণ । শারদ ১৩৭৫

বাংলার টেরাকোটা । প্রবন্ধ । উত্তরকাল । আষাঢ় ১৩৭৬

পিঞ্জরে বসিয়া শুক । উপন্যাস । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৭৬

নাচুরালিজম । প্রবন্ধ । নিষাদ। অক্টোবর ১৯৭০ পুনর্মুদ্রণ : বিজ্ঞাপন । কার্তিক ১৩৮৩

পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে । প্রবন্ধ । দর্পণ । দুটি সংখ্যায় । ৭ ও ১৪ মে ১৯৭১

মার্শেল প্রুস্ত বিষয়ে কিছু । প্রবন্ধ । পদক্ষেপ । শারদ ১৩৭৮

শ্যামনৌকা । (নতুন অংশ)। গল্প । গল্প কবিতা । শারদ ১৩৭৮

লুচপূজাবিধি । গল্প । কৃত্তিবাস । জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭২

ক্যালকাটা পেন্টার্স । প্রবন্ধ । দর্পণ । ৩০ মার্চ ১৯৭২

ফাৎনা মনস্কতা । প্রবন্ধ । কৃত্তিবাস । জুন ১৯৭২

'কথা ইশারা বটে' - ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন । প্রবন্ধ । সমতট ।
অক্টোবর - ডিসেম্বর ১৯৭২

বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ । প্রবন্ধ । এক্ষণ । ৪র্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ১৩৭১

যাঁরা গড়েছেন । সাক্ষাৎকার । সমতট ২১-২২ । ১৯৭২

অজ্ঞাত নামার নিবাস । গল্প । আবহ । শারদ ১৩৮০

ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গ । প্রবন্ধ । কালি কলম । আশ্বিন ১৩৮০

রেখো মা দাসেরে মনে । প্রবন্ধ । কৃত্তিবাস । জানুয়ারি - জুন ১৯৭৪

দ্বাদশ মৃত্তিকা । গল্প । এক্ষণ । শারদ ১৩৮১

স্বাতি নক্ষত্রে জল । গল্প । কালিকলম । আশ্বিন ১৩৮১

অনিত্যের দায়ভাগ । গল্প । আবর্ত । আশ্বিন ১৩৮১

নির্বাচিত গ্রন্থ । প্রবন্ধ । কস্তুরী । এপ্রিল ১৯৭৫

ভাবপ্রকাশ বিষয়ে । প্রবন্ধ । শারদ । মে-জুন ১৯৭৫

আর চোখে জাগে । গল্প । অমল দাস । বৈশাখ ১৩৮২

বাগান লেখা । গল্প । জার্নাল ৭০ । সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

শরৎবাবু ও ব্রাহ্মণ্য । প্রবন্ধ । আঁতুর । আশ্বিন ১৩৮২

খেলার দৃশ্যাবলী । গল্প । গাঙেঁয়পত্র । চৈত্র ১৩৮২

বাগান দৈববাণী । গল্প । গোলকধাঁধা । গ্রীষ্ম ১৩৮৩

কলকাতার গঙ্গা । প্রবন্ধ । আনন্দবাজার পত্রিকা । ২০.১১.১৯৭৬

প্রতীক জিজ্ঞাসা । প্রবন্ধ । শারদ । প্রতীক সংখ্যা ১৩৮৩

লেখা বিষয়ক । প্রবন্ধ । জার্নাল ৭০ । ৫ম সংখ্যা ১৯৭৬

খেলার প্রতিভা । উপন্যাস । জার্নাল ৭০ । জানুয়ারি ১৯৭৭

শরৎবাবু বিষয়ক নোট । প্রবন্ধ । সত্তর দশক । এপ্রিল-জুন ১৯৭৭

সীতেশ রায়ের ছবিতে বাঙালী ধরন দেখা যায়। রিভিয়ু । শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনীর স্যুভেনিরের ভূমিকা । জুলাই ১৯৭৭

ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা । প্রবন্ধ । দেশ । ১৯-৮-১৯৭৮

খেলার আরম্ভ । গল্প । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৮৫

খেলার বিচার । গল্প । কৌরব । শারদীয় ১৩৮৫

বাগান কেয়ারী । গল্প । বারো মাস । শারদীয় ১৩৮৫

বাগান পরিধি । গল্প । শিরোনাম । শারদীয় ১৩৮৫

গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম । প্রবন্ধ । সংস্কৃতি পরিক্রমা । আশ্বিন ১৩৮৫

সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন । প্রবন্ধ । বিভাব । শরৎ ১৩৮৫

আইকম বাইকম । প্রবন্ধ । তালতমাল । শরৎ ১৩৮৫

গ্রন্থ :

অন্তর্জলী যাত্রা । উপন্যাস । কথাশিল্পী প্রকাশনী । ১৩৬৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ সুবর্ণরেখা থেকে প্রকাশিত ১৩৮৫

নিম অন্নপূর্ণা । গল্প সংকলন । কথাশিল্প । ১৩৭০

গল্প সংগ্রহ । সুবর্ণরেখা । ১৩৭২

দানসা ফকির । নাটক । সুবর্ণরেখা । ১৩৮২

খেলার প্রতিভা । উপন্যাস । তাম্রলিপি । ১৩৮৪

সংকলন :

ঈশ্বর কোটির রঙ্গকৌতুক । কথাশিল্প ১৩৮৪

সংকলন ও চিত্রণ :

ঈশ্বর গুপ্তের ছড়া ও ছবি । উডকাট । কাহিনী । ১৯৬১

আইকম বাইকম । ছড়া সংকলন ও ড্রয়িং । কথাশিল্প । ১৩৭০
পানকৌড়ি । ছড়া সংকলন ও উডকাট । সুবর্ণরেখা । ১৩৭২

মৃত্যুর পর প্রকাশিত :

গ্রন্থ :

পিঞ্জরে বসিয়া শুক । উপন্যাস । সুবর্ণরেখা । ১৩৮৫
গোলাপ সুন্দরী । গল্প । আনন্দ পাবলিসার্স । ১৯৮২
সুহাসিনীর পমেটম । উপন্যাস । আনন্দ । ১৯৮৩
অমিলা স্মরণে । উপন্যাস । আনন্দ । ১৯৮৪
শবরী মঙ্গল । উপন্যাস । সুরলিপি । ১৯৮৪
পানকৌড়ি । (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ছড়া ও ছবি । আনন্দ । ১৯৮৬
গল্প সমগ্র । আনন্দ । ১৯৯০
শিল্প চিন্তা । প্রমা (গবেষণা পত্র জমা দেওয়ার দিন পর্যন্ত প্রকাশিত)

পত্রিকার পাতায় (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অসংকলিত) :

একটি কবিতা । কবিতা । এক্ষণ । শারদীয় ১৯৭৯
একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ । প্রবন্ধ । অক্ষক্রীড়া। শারদ ১৯৭৯
অপ্রকাশিত রচনা । সংকলন । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৮৬
কিঞ্চিৎ জীবন চরিত । গল্প । কৃত্তিবাস । শারদীয় ১৩৮৭
টুকরো রচনা । সংকলন । প্রতিবিম্ব । বৈশাখ ১৯৮০
কালই আততায়ী । গল্প । কৃত্তিবাস । শারদীয় ১৯৮০
সংখ্যা আমার ভাই । প্রবন্ধ । বিভাব । জুলাই ১৯৮০

—

* শিঙলাবৎ । গল্প । কবিতীর্থ । অকটোবর ১৯৮২

* শবরী-মঙ্গল । উপন্যাস । রবিবাসর । শারদীয় ১৯৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা । জীবনী । কৌরব । অকটোবর ১৯৮৪ (অসম্পূর্ণ)

স্মরণে গোলাপ । কবিতা । চতুরঙ্গ । অকটোবর ১৯৮৪

* বাবু । গল্প । আজকাল । শারদ ১৯৮৭

নৌকোবিলেস । গল্প । প্রতিক্ষণ । শারদ ১৯৮৭

* আস্টিশ । গল্প । পরিচয় । শারদীয় ১৯৮৭

আমোদ বোষ্টমী । গল্প । দেশ । শারদীয় ১৯৮৮

** ছড়া । আনন্দ মেলা । শারদীয় ১৯৮৮

সোনার কাজ । প্রবন্ধ । কবিতীর্থ । শারদীয় ১৯৮৯

প্রেম । গল্প । গল্পসমগ্র । আনন্দ । ১৯৯০

ভূখন্ড । নাটক । কবিতীর্থ । শারদ ১৯৯০

সম্ভাব্য রচনা :

(যার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি, কিন্তু নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে তা লিখিত প্রকাশিত হয়েছিল।)

শঙ্খ । কবিতা । সূত্র সত্যজিৎ রায়ের 'কমলবাবু' প্রবন্ধ । সমতট । শারদীয় ১৩৮৫

দুর্ণাম । নাটক । সূত্র : উষ্ণীষ আশ্বিন ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ।

----

* চিহ্নিত রচনাগুলি দয়াময়ী মজুমদারের হস্তাবলেপনে সম্পূর্ণ।

** চিহ্নিত রচনাটি কমলকুমারের নয়। কমলকুমারের নামে ছাপা হয়েছে।

পত্রিকা সম্পাদনা :

উষ্ণীষ । মাসিক । ১৩৪৪ । তিনটি সংখ্যা । সাহিত্য পত্র।
চলচ্চিত্র । মাসিক । ১৯৫০ । একটি সংখ্যা । চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র ।
তদন্ত । সাপ্তাহিক । ১৯৫২ । ১৮টি সংখ্যা । গোয়েন্দা পত্র।
অঙ্কভাবনা । ত্রৈমাসিক । ১৯৬৫ । দুটি সংখ্যা । গণিত বিষয়ক পত্র ।
গঙ্গাহৃদি । পরিকল্পিত । প্রকাশিত হয়নি । ধর্মবিষয়ক পত্র ।

প্রচ্ছদ চিত্রণ :

কৃত্তিবাস । ২২ নং সংকলন । ১৯৬৫
কৃত্তিবাস । ২৫ নং সংকলন । ১৯৬৮
পঞ্চতন্ত্র । ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা । ১৯৭০
কৌরব । শারদীয় ১৩৮৫
প্রেমিক সন্যাসী । সম্পাদক । সুব্রত রুদ্র । কাব্য সংগ্রহ । ১৯৭৬
প্রতিদিন প্রতি রাত্রি বেলা । কাব্যগ্রন্থ । শুভ মুখোপাধ্যায় । ১৩৮৪
প্রিয় সুব্রত । ভাস্কর চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ । ১৯৭৮
অপরূপ কথা । গল্প । সতীকান্ত গুহ।
এবং মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত নিজের সমস্ত বইগুলি ।

গ্রন্থচিত্রণ । অলংকরণ :

লালকমল নীলকমল । সতীকান্ত গুহ। ১৩৭৪

মৃত্যুর পর প্রচ্ছদ হিশেবে ব্যবহৃত ছবি :

সমতট । আশ্বিন ১৯৭১
দেশ । ২২.৭.৮০

শব্দপত্র । আশ্বিন ১৯৮৬

ব্যাস প্রকাশ । বইমেলা ১৯৮৮

চিত্রপ্রদর্শনী :

১৯৭৯, ১৯ ফেব্রুয়ারি । ২৫টি ছবি। আকাদেমি অব ফাইন আর্টস নর্থ গ্যালারি, এক সপ্তাহ।

১৯৭৯, ১৩-১৯ মার্চ । ২৫টি ছবি । আকাদেমি অব ফাইন আর্টস, নর্থ গ্যালারি। এক সপ্তাহ

১৯৮৪, ৭-৩০ মার্চ । ২৮টি ছবি । আকাদেমি অব ফাইন আর্টস। সাউথ গ্যালারি । ২৪ দিন ।

১৯৮৫। ১০-১৭ জুন । ৩০টি ছবি । আকাদেমি অব ফাইন আর্টস নর্থ গ্যালারি । এক সপ্তাহ ।

- প্রদর্শনীর আয়োজক : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ।

পরিচালিত নাটক :

মৃদিস্পৃক । কমলকুমার মজুমদার । মঞ্চ : টালিগঞ্জ থানার মোটর গ্যারেজ । ১৯৩২ সাল । সঠিক তারিখ জানা যায় নি । দল - উল্কা ।

(১৯৩২-৫১ পর্যন্ত কমলকুমার পরিচালিত নাটকের কোনো তারিখ বা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি । অথচ কমলকুমার নাটক পরিচালনা করেছিলেন সেই সময় এমন তথ্য পাওয়া গেছে।)

লক্ষণের শক্তিশেল । সুকুমার রায় । মঞ্চ : সিগনেট প্রেস । নিউ এম্পায়ার । বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । দল : হরবোলা । চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । তারিখ : ১৯৫২(সঠিক তারিখ পাওয়া যায় নি।)।১০.১০.৬৭।৫.২.৭৭

মুক্তধারা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । মঞ্চ : সিগনেট প্রেস । দল : হরবোলা ১৯৫২ । ৫৩ (সঠিক তারিখ পাওয়া যায় নি।)

রামায়ণ গাথা । কমলকুমার মজুমদার । মঞ্চ : নিউ এম্পায়ার । দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । ১০১০১৯৬৭ । সকাল ১০টা।

এম্পারার জোনস । ইউজিন ও নীল । অনুবাদ : গগন দত্ত । মঞ্চ : মুক্তাঙ্গন । নিউ এম্পায়ার । কলা মন্দির । তারিখ : ৯০২০১৯৬৪ । ১৪০৭০১৯৬৮ । ২০১০৭০ দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ।

দানসা ফকির । কমলকুমার মজুমদার । মঞ্চ : বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন । তারিখ : ২৮০১১০৭৬, ২১০১০৭৬ । ১১০১০৭৭ । দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । ক্যালকাটা চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ।

কংকালের টংকার । কাহিনী : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । পালরূপ : কমলকুমার । মঞ্চ : বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন । তারিখ : ২১০১০৭৬ । ১১০১০৭৭, দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । ক্যালকাটা চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ ।

ভীমবধ । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । মঞ্চ : বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন । তারিখ : ২৮০১১০৭৬ । ১১০১০৭৭ দল : ক্যালকাটা চিলড্রেন গ্রুপ।

অভিনয় হয়নি অথচ তৈরি ছিল এমন নাটক :

লক্ষ্মীর পরীক্ষা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

হ-য-ব-র-ল । সুকুমার রায় ।

সুলতানা রিজিয়া । কমলকুমার মজুমদার ।
ঠোক্কর । কমলকুমার মজুমদার ।
হরচন্দ্রের অশান্তি । কমলকুমার মজুমদার ।
ঘোড়াচোর । কমলকুমার মজুমদার ।
প্রহ্লাদ চরিত । কমলকুমার মজুমদার ।
কবিকঙ্কন চণ্ডী । কমলকুমার মজুমদার
প্রহ্লাদ চরিত । কমলকুমার মজুমদার ।
কবিকঙ্কন চণ্ডী । কমলকুমার মজুমদার ।
যমালয়ে জীবন্ত । কমলকুমার মজুমদার ।
ডন কুইক্সোটের আক্কে । কমলকুমার মজুমদার ।
আলীবাবা । ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ।
আনমগীর । গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যে সব কাহিনী চলচ্চিত্রিত হয়েছে ।

নিম অন্নপূর্ণা । পরিচালক । বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত । ১৯৮০
অন্তর্জলী যাত্রা । পরিচালক : গৌতম ঘোষ । ১৯৮৯ ।
তাহাদের কথা । পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

যে সব সংকলনে কমলকুমারের রচনা গৃহীত :

কিশোর অমনিবাস । সম্পাদক : ধীমান দাশগুপ্ত । গৃহীত রচনা : আইকম বাইকম । বাণী শিল্প । ১৩৮৪
দেশ সুবর্ণ জয়ন্তী গল্প সংকলন । সম্পাদনা : সাগরময় ঘোষ । গৃহীত গল্প : যতিলাল পাদরী । আনন্দ । ১৯৮৩

গোলাপ যে নামে ডাকো । সম্পাদক : পূর্ণেন্দু পত্রী । গৃহীত গল্প : গোলাপ সুন্দরী । প্রতিক্ষণ । ১৯৮৬

দেশ শারদীয় গল্প সংকলন । সম্পাদনা : সাগরময় ঘোষ । গৃহীত গল্প : আমোদ বোষ্টমী। আনন্দ । ১৯৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : আবির্ভাবকাল, জীবন এবং সাহিত্য
বিশেষতঃ ছোটগল্প

ক. ভূমিকা

বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে এমন একটা সময়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে যে সময়টি হলো মোটামুটি ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়। এই যুদ্ধ বাঙালীর জীবন যাত্রা - মূল্যবোধকে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। এই সময়ে মানুষের জীবনে এক অদ্ভুত অথচ অনিবার্য ভাঙা গড়ার খেলা শুরু হয়। এই ভাঙা গড়াতে একই সঙ্গে গ্রাম এবং শহরের মানুষ এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এর আগে পর্যন্ত সমাজ জীবনে যে একটা ধারা ছিল তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে লাগল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর মানুষের উদ্বাস্তু হওয়া অবস্থা। অসহায়তা বা চরম সংকটের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে চলতে মানুষ ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে বাঙালীর জীবন যাপন, দৃষ্টিভঙ্গী এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এই সময়কার অনেক লেখকের লেখাতেই দেখা যায় শুধু মাত্র বেঁচে থাকার জন্যই মানুষ সমস্ত বিপর্যয়কে অসহায় ভাবে মেনে নিচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পেও এই প্রতিবাদহীন, অসহায় অবস্থার চিত্র দেখা যায়।

খ. জীবনকথা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী (১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ)। আর মৃত্যু হয় ১৯৭৫ খ্রীঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর। নরেন্দ্রনাথের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি পল্লীগ্রামে। যে কোন লেখকের রচনাকে অনেক খানি প্রভাবিত করে

তার জন্মস্থান এবং পরিবার। নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই তাঁর অনেক উপন্যাস এবং ছোট গল্পে পূর্ববাংলার প্রকৃতি, পরিবেশ বারংবার এসেছে। তাঁর আত্মকথা থেকে জানতে পারি যে গ্রামের পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদী ছিল তার নাম কুমার। এই নামটি লেখকের কানে মধুর লাগতো। পূর্ববাংলার অন্যান্য ছোট নদী-গুলোর মতোই এ নদীটিও বর্ষায় প্লাবিত হত। কিন্তু দু-একবার বন্যা ছাড়া গ্রামের বাড়ি ঘরে জল উঠত না। কিন্তু সারা বছরই নদীতে জল থাকতো। চৈত্র, বৈশাখ মাসে আর এর অন্য রূপ দেখা যেত। 'পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেষে চাষী গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেই শস্য ক্ষেত। ধান পাটের সবুজ সমুদ্র। বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়।'[১] সদরদি গ্রামে লেখকদের বাস ছিল। যে পাড়াতে লেখকদের যাতায়াত ছিল, সেখানে নানা জাতের মানুষ যেমন চাষী মুসলমান, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর ব্যবসায়ী সাহা সম্প্রদায়, জেলে, জোলা ইত্যাদিদের বাস ছিল। এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যে লেখকের খুব ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল তেমন নয়। তবে গ্রামের এই প্রকৃতি এবং নানা জাতের মানুষেরা তাদের জীবনযাত্রা তাদের বৃত্তি নিয়ে নরেন্দ্রনাথের গল্পে উঠে এসেছে বার বার।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবার ছিল একান্নবর্তী। এই সংসারের দায়িত্ব ছিল তাঁর পিতা মহেন্দ্রনাথ মিত্রের ওপরে। অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল বলে লেখাপড়া বেশি দূর পর্যন্ত করতে পারেননি, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি এবং তাঁর ভাই দুজনে 'ভাজা' শহরে মুহুরীর কাজ করতেন। গ্রামের মধ্যে তাদের পরিবার বেশ সচ্ছল ছিল। লেখকের পিতা মহেন্দ্রনাথ প্রথমে জগৎমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। জগৎমোহিনীর পর পর কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু হয়, এবং তিনি পিত্রালয়ে

থাকাকালীন, আত্মীয়েরা মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহ দেন, ইনি হলেন নরেন্দ্রনাথ ও তার ভাই-এর মা বিরাজবালা। বিরাজবালা নরেন্দ্রনাথের জন্মদাত্রী ছিলেন ঠিকই কিন্তু জন্মের পরেই সংসারে শান্তি বজায় রাখার জন্য এবং কুলগুরুর আদেশে প্রথম পুত্র নরেন্দ্রনাথকে বিরাজবালা তার সপত্নী জগৎমোহিনীকে দান করেন। একেই নরেন্দ্রনাথ মা বলে জানতেন। সে কারণেই জন্মদাত্রী বিরাজবালার মৃত্যুতে তিনি সেভাবে দুঃখ অনুভব করেননি, অনেক বড় হয়ে তিনি এ ঘটনা জেনেছিলেন। তাঁর মতে জগৎমোহিনী-ই তার প্রকৃত মা ছিলেন '... তিনি তো আমার জীবনে অনন্যা, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি মা বলে ডাকিনি, মাতৃস্নেহের স্বাদ একান্তভাবে তার কাছে থেকেই পেয়েছি'[২] নরেন্দ্রনাথ একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলেন বলে পিতা, ও পিতৃব্যসহ তিনভাই দুই মা, মায়ের মতো অন্যান্য রমনীরা বহু ভাইবোন এবং আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং একটি ঘনিষ্ট পারিবারিক জীবনের স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন যার প্রভাব তাঁর কোন কোন গল্প উপন্যাসে দেখা যায়।

নরেন্দ্রনাথের মনে তাঁর বাবার চরিত্র একটি আদর্শ পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি একদিকে যেমন বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র পড়তে ভালবাসতেন তেমনি বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গীত শিক্ষা না করলেও মার্গসঙ্গীত রাগসঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গানও তিনি গাইতে পারতেন। শিশু নরেন্দ্রনাথকে প্রাতকালে সংস্কৃত শ্লোক, সূর্যস্তব, গুরু-বন্দনা, পিতৃবন্দনা শেখাতেন। পিতার জটিল চিঠির মুসাবিদা থেকে নৌকা বাওয়া, গাছ-কাটা পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই দক্ষতা নরেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতো, পিতার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাই তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

লেখকদের জীবনে এমন অনেক মানুষের প্রভাব পড়ে যারা পরবর্তীকালে লেখকের রচনায় নিঃশব্দে স্থান করে নেয়। এ রকমই মানুষ ছিলেন নরেন্দ্রনাথের জীবনে

অবিনাশচন্দ্র চাকলাদার, যহেন্দ্রনাথের তিনি মামা ছিলেন। এই মানুষটির নানারকম হাতের কাজে দক্ষতা ছিল, শিল্পকর্মের তিনি পারদর্শী ছিলেন কিন্তু সে সব কাজ সংসারের উপার্জনের কাজে লাগতো না। কিন্তু এর আনন্দময় ব্যক্তিত্ব ও সঙ্গ নরেন্দ্র-নাথের বাল্যজীবনকে প্রভাবিত করেছিল। এই চরিত্রটি আমরা পাই 'চাকলদার' রচনায়। নরেন্দ্রনাথ তার শিক্ষা সুগৃহে প্রতিবেশী শিক্ষক অক্ষয়কুমার শীলের কাছে শুরু করেন।'[৩] বাল্যজীবনের এই শিক্ষক তার মনে স্থান করে নিয়েছিলেন। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে এই চরিত্রটি দেখা যায়। অক্ষয়কুমার একজন কীর্তন গায়ক ছিলেন। বাল্যশিক্ষার পরিবেশে নরেন্দ্রনাথের কাছে এই কীর্তনের সুর মাঝে মাঝে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত, যাকে তিনি স্মৃতির মনিকোঠায় ধরে রেখেছিলেন।

এর পর তিনি মিডল স্কুলের পাঠ শেষ করে ভাঙা হাইস্কুলে ভর্তি হন, এখান থেকে প্রথম বিভাগে মাট্রিক পাশ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে নরেন্দ্রনাথ ভর্তি হন। অর্থনৈতিক কারণে কলেজের ছাত্রাবাসে না থেকে খাওয়া থাকার বিনিময়ে গৃহশিক্ষকতার কাজ নেন এবং সেই সঙ্গে আই·এ· পড়তে থাকেন, কিন্তু সুভাবে লাজুক নরেন্দ্রনাথ সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য পান নি। এই সময়টি মোটামুটি ভাবে তিরিশের দশকের প্রথমার্ধ। ফরিদপুর তখন নামেই শহর, প্রকৃতপক্ষে মফঃস্বল শহরের কোর্ট কাছারি কেন্দ্রিক আধা নাগরিক আবহাওয়া। 'দোকান বাজার, রাজনীতি, সাহিত্যসভা, উকিলপাড়া, কলেজপাড়া, পুলিশ লাইন, জেলখানা, লাল সুড়কির রাস্তা, কেরোসিনের ল্যাম্পপোস্ট, ছ্যাকড়া গাড়ির ঘর ঘর শব্দ'[৪] এর মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার স্তর ক্রমে বিস্তৃত হল। বাল্যের সেই ভাঙা সদরদির গ্রামীন জগৎ-এর সঙ্গে যুক্ত হল শহরবাসী মধ্যবিত্তের ভাড়াটে জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতা। কলেজে পড়াকালীন তিনি সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পান নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়কে। আই·এ· পাশ করার পর তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতায় আসেন বি·এ·

পড়ার জন্য। নতুন বিষয় ইকনমিক্স নিয়ে পড়া শুরু করেন কিন্তু বিষয়টি তিনি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে না পারার জন্য পরপর দু-বছর পরীক্ষায় বসে উঠে আসেন এবং অবশেষে ১৯৩৯-এ বি•এ পাশ করেন। এই সময়টি হল দ্বিতীয়টি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মুহূর্ত। নরেন্দ্রনাথ বি•এ পাশ করে ১৯৩৯-এ চাকরী পেয়ে যান।

নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের স্বাধীন রচনার সূত্রপাত হয় বাল্য বয়সেই। তিনি নিজে সেই বর্ণনা দিয়েছেন -

> কবে যে প্রথম লিখতে শুরু করি তার সন তারিখ কিছুতেই মনে পড়ছে না। বাল্য রচনার সেই বিষয় বস্তুও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। মনে পড়ে ঠাকুরদার সেই আয় কাঠের বাক্সের মধ্যে একখানি পৌরানিক নাটক পেয়েছিলাম 'গয়াসুরের হরি-পাদপদ্মলাভ।' সেই বইয়ের গোড়ার দিকটাও ছিলনা শেষের দিকটাও ছিল না। তবু সেই নাটকের অনুকরণে আমিও একটি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আর একবার আমাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত লিখেছিলাম ডায়রির মত করে। তখন আমি ভাঙ্গা হাইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি।[৫]

এর পর নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও কিছু সহপাঠী মিলে আহ্বান পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তিনি নবম শ্রেণীতে পড়েন। এছাড়া একই সময়ে তার ভাইদের সঙ্গে আর একটি হাতে লেখা পত্রিকা করেন, এটির নাম ছিল 'মুকুল'।

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি হাতে লেখা আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন সেটি মাসিক পত্রিকা 'জয়যাত্রা'। কলেজে অন্যান্য বন্ধুদের যথা সত্যেন্দ্রনাথ রায়,

অচ্যুত গোস্বামী ইত্যাদিদের সঙ্গে 'অভিসার' নামে হাতে লেখা পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত লেখা হল 'মূক' নামে একটি কবিতা, যেটা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। এই একই সময় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচিত গল্প 'মৃত্যু ও জীবন'। সেই গল্পটি পড়ে 'দেশ'এর দপ্তর থেকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাকে আরো গল্প পাঠানোর জন্য চিঠি লিখেছিলেন। লেখকের ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়।'[৬] এরপর ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে তাঁর প্রায় ২২।২৩টির মতো গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭-এর মধ্যে দেশে তাঁর চার পাঁচটির মতো গল্প প্রকাশিত হয়। এছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি 'প্রবাসী' 'বিচিত্রা' 'বঙ্গশ্রী' 'পরিচয়' আনন্দবাজার পত্রিকায় দোল, পূজা ও রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার জগৎ থেকে তিনি ক্রমশ সরে আসতে থাকেন, তবে কবিতার সম্পর্কে তার গভীর ভালবাসা ছিল, তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন -

> যারা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন তারাই জানেন
> কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশি।

নরেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ'। এই বইখানি বেরোয় ১৯৪৭ সনে। তার চার বছর আগে ১৯৪২ কি ৪৩-এ বইখানি 'হরিবংশ' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। তখন সাগরময় ঘোষ 'দেশে'র সহকারী সম্পাদক। তিনিই চেয়েছিলেন সেই ধারাবাহিক উপন্যাস।[৭] 'দেশে' যখন 'হরিবংশ' বেরোয় তখন নরেন্দ্রনাথ এবং কালিকলমের সম্পাদক মুরলীধর নিবেদিতা লেনের একটি বাড়িতে তিন-তলার একই ঘরে বসবাস করতেন। লেখক আত্মকথায় বলেছেন -

> বোমাবর্ষনের ভয়ে আমার সেই আত্মীয় গৃহের গৃহিনীরা পুত্রকন্যা নিয়ে স্থানান্তরিতা। পাশাপাশি তক্তপোষে মুরলী বাবু থাকেন, আমি থাকি আরো অনেকে থাকেন। [৮]

'হরিবংশ' লেখাটি যখন বের হয় তার কিছুকাল আগে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয় 'প্রত্যহ' পত্রিকার অফিসে। তিনি লেখকের 'হরিবংশ' সম্পূর্ণ লেখাটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। 'হরিবংশ' রূপান্তরিত নামান্তরিত হয়ে 'দ্বীপপুঞ্জ' নামে বের হলে বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন সেই উৎসাহদাতা সন্তোষকুমার ঘোষকে। 'দ্বীপপুঞ্জ'র প্রকাশক হতে চেয়েছিলেন দুজন, তাদের অন্যতম নাট্যকার দিগিন্দ্রনাথ। লেখক বলেছেন -

> বইখানি যখন বেরোয় আমি সানুজ পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে ব্রজদুলাল স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়ির একতলার বাইরের একখানি ঘরে থাকি, বেশি বৃষ্টি হলে সেখানে জল ওঠে। তক্তপোষের ওপর বসে বসে আমি দ্বীপপুঞ্জের প্রুফ দেখি। নিজেই যেন দ্বীপবাসী। আর বৃষ্টি ভিজে ছাতায়ুড়ি দিয়ে ধীরেন রায় নিতে আসেন সেই প্রুফ। দিনগুলির কথা খুব মনে পড়ে। সেদিনের বর্ষাকে ঠিক দুঃখের বর্ষা বলে মনে হতনা। বরং দিনগুলি আশা ভরসায় ভরা ছিল আমি তখন প্রথম ঔপন্যাসিক হতে যাচ্ছি। [৯]

নরেন্দ্রনাথের রচনাকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা যায় - ছোটগল্প, উপন্যাস এবং ছোট উপন্যাসের মতো বড় গল্প যাকে বলা যায় নভেলেট। নরেন্দ্রনাথের শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমান পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে। বিশেষতঃ প্রথম পর্বের ছোট গল্পগুলিতে। 'শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, গঠন বা ফর্মেও এরা অনবদ্য।' [১০]

নরেন্দ্রনাথ বিবাহিত জীবন শুরু করেন ১৯৩৮ সালে। কিছুটা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পিতার আদেশ এবং একান্ত আগ্রহের জন্য সদরদির নিকটবর্তী চোয়ড়দি গ্রামের অবিনাশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সঙ্গীতে পারদর্শিনী, চতুর্দশী শোভনার সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তখনও তিনি বি.এ. পাশ করেননি। ১৯৩৯-এ অনুজ ধীরেন্দ্রনাথ আই.এ পাশ করলে তাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে আসেন। মূলতঃ ছাত্র পড়ানোই ছিল নরেন্দ্রনাথের অর্থ উপার্জনের উপায়, তবে গল্প লিখেও কিছু উপার্জন হতো। যদিও দু-আনায় একজনের একবেলা খাওয়া হয়ে যেত। তবু লেখক তাঁর ভাইকে নিয়ে হিসেব করে চলতেন। এই একই বছরে তিনি জীবনে প্রথম চাকরী গ্রহন করেন অর্ডনান্স ফ্যাক্টরীতে। চাকুরীর স্থান হল দমদমে, এবং সময়টি হল যুদ্ধের সময়। সৈন্যদের সরবরাহে জিনিষ গণনা এবং হিসেব রাখা তাঁর কাজ ছিল, কাজটি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দের ছিলনা, কিন্তু এখান থেকেই তিনি কিছু গল্পের প্লট পেয়েছিলেন, যেমন 'নেতা' (১৩৫১ :ভাদ্র) গল্পটি। এই গল্পে তাঁর চাকুরীস্থলের আফিসের পরিবেশটিকে পটভূমি রূপে ব্যবহার করেছেন।

১৯৪২-এ যুদ্ধ যখন চলছে তখন নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। স্বাভাবিক-ভাবে সংসারের প্রধান আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং নরেন্দ্রনাথকেই জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। ১৯৪৩-এ যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের মধ্যে স্ত্রী, দুই শিশুপুত্র এবং ভাই ধীরেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এই সময় তিনি ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংকে কর্মরত। 'প্রত্যহ' নামে একটি সাময়িক পত্রিকার অফিসে সন্ধ্যার সময় তিনি পার্ট টাইম কাজ নিয়েছিলেন এরপর তাঁকে ব্যাংক থেকে জব্বলপুর শাখায় বদলি করা হয়, অনেক অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও তিনি শুধু বাইরের দেশ দেখার আগ্রহে রাজি হয়ে যান। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি পুনরায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময়ে তিনি পরিবার সহ বাস করতেন ১৭।১, ব্রজদুলাল স্ট্রীটে। এই সময় তিনি ব্যাঙ্কে চাকুরীরত অবস্থায় একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং সাসপেণ্ড হন। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর ও সজনীকান্ত লেখককে এই মামলায় নানাভাবে সাহায্য করেন। পরে লেখক এই চাকরীতে ইস্তফা দেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগ হলে গ্রাম থেকে সবাইকে নিয়ে ১১১ বি নারকেল ডাঙ্গা মেইনরোডে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে লাগলেন। 'সোনার তরী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এই সময় প্রকাশিত হতে লাগল তাঁর নাগরিক জীবন নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস 'অমরে অমরে'। তাঁর বিখ্যাত 'রস' গল্প এই সময় লেখা। নরেন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মূল্যবোধের নানা পরিবর্তন নিম্নবিত্ত বাঙালীর জীবনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তাকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ আর চল্লিশের দশকের আরম্ভ, এই সময়টি বাঙালি মধ্যবিত্ত - নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে এ বড় সংকটের কাল।[২১] এই সময় থেকেই নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। কোন অসাধারণ, অভিনবত্বের দিকে তিনি যেতে চাননি, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের অত্যন্ত পরিচিত জগৎকে পাঠকের কাছে অপূর্ব কৌশলে নিয়ে এসেছেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'গল্প লেখার গল্প' নামে এক বেতার কথিকায় (বৈশাখ ১৩৮২) প্রসঙ্গক্রমে লেখেন -

> পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করে নি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে

পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।[১২]

যে কোন লেখকের রচনা বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার পরিবেশ ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করে। নরেন্দ্রনাথের স্বভাবের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে দেখা যায় তিনি ছিলেন অন্যমনস্ক একটি মানুষ। খুব সহজে মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। তিনি ছিলেন স্বল্পবাক্ লাজুক স্বভাবের মানুষ। তার প্রমান - বাদকুল্লার অনুষ্ঠানের বক্তৃতার আসরে রণজিৎ সেনকে অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি বলেছেন -

আমার বলাটলা কিছু আসে না, বলতে গেলে ভালও লাগবে না কারুর, যা বলবার আপনিই বলুন, আমাকে সেভ করে দিন।[১৩]

তিনি অল্প বয়স থেকেই মেয়েদের শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই গ্রামে মেয়েদের জন্য স্কুল হয়েছিল। এছাড়া বাড়িতে একটি উন্নত মানের লাইব্রেরী নিজে গড়ে ছিলেন। তখনকার অনেক মাসিক পত্রিকা এই লাইব্রেরীতে আসত। তিনি নানা দিক থেকে নারী প্রগতিবাদে বিশেষ ভাবে তৎপর ছিলেন। মূক স্বভাবের নরেন্দ্রনাথের এই সব বিষয়ে মুখরতার শেষ ছিল না। ঘর সংসারের কাজে পুরোপুরিই অপটু ছিলেন। কথার চাইতে সারাক্ষণ আবৃত্তি করতেন। সখ সৌখিনতার মধ্যে তার ফোনে কথা বলা, পত্র লেখা, 'ফুল কেনা প্রায় নেশার মতো ছিল।'[১৪] বাইরের জীবনে নরেন্দ্রনাথ এলোমেলো স্বভাবের মানুষ ছিলেন ঠিকই কিন্তু সাহিত্যের চিন্তাধারায় ছিলেন সাজানো গোছানো বলিষ্ঠ লেখক। মেয়েদের পরাধীনতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নিজের স্ত্রীর(শোভনা) শিক্ষা এবং সঙ্গীত চর্চার দিকে তার বিশেষ আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল। তার স্ত্রী শোভনা মিত্র স্মৃতি চারণায় বলেছেন - গানের আওয়াজে লেখার অসুবিধে হতে পারে তা ভেবে আমি দরজা ভেজিয়ে দিতাম। তা দেখে সুন্দর মৃদু হেসে বলতেন 'দরজা বন্ধ করোনা',

গানের সুর শুনে আমার বরং লিখতে ভালো লাগে। আমার লেখার অসুবিধে হবে না।'[১৫] তার অনেক ছোট গল্পেই সঙ্গীত শিল্পীর জীবনের টানাপোড়েনের চিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথের গৃহে প্রিয় পরিচিতজনের আসা যাওয়া সর্বদা ছিল, কিন্তু এই ভিড় আর কোলাহলের মধ্যে গভীর মনোযোগে লিখতেন। 'লেখার পাত্রপাত্রীদের শোক দুঃখ উচ্ছ্বাস, আনন্দের সব ভাবনার ছায়া লেখকের মুখের অবয়বে ফুটে উঠত।' সে রকম কোন মুহূর্তে লেখক নিজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন, আবার কখনো হাসির উচ্ছ্বাসও দেখা যেত। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা অন্তরের থেকেই করতেন, তার বিখ্যাত একটি গল্পে লিখেছেন -

> শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্ককে আমি বড় বলে মানিনে, নিত্যদিনের মেলামেশার মধ্য দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা আমার কাছে অনেক বড়।

কথাসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক সমরেশ বসু তার পূর্বসূরী নরেন্দ্রনাথের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন -

> প্রথম দর্শনে ছোটখাটো স্বল্পবাক্ মানুষটির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়েনি। এমনকি মনে হয়েছিল ব্যক্তিত্বহীন। ... কিন্তু ব্যক্তিত্ব ছিল বই কি ? তা ছিল তাঁর ভাষা আর আচরণের মধ্যেই। তাঁর নির্বাক কিন্তু ভাষাময় দৃষ্টি তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে বলা ছোটোখাটো উজ্জ্বল কয়েকটি কথা ও জিজ্ঞাসা আচরণে চঞ্চলতাহীন স্নিগ্ধতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর বৈশিষ্ট্য। ... এক লহমায় দেখে আর বুঝে নেবার মতো ঝংকার তার ছিল না। ছিল না তার কারণ সম্ভবত অহংবোধের কণামাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না।[১৬]

বড় পত্রিকার যখন তিনি নিয়মিত লেখক তখনও ছোট পত্রিকায় সম্পাদকের সঙ্গে ছিল তাঁর

একই রকম ব্যবহার। চাওয়ার আগেই তাদের 'অবাক করে দিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন কবে চাই ?'[১৭] শৌরকিশোর ঘোষ বলেছেন যে তিনি বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন, নিজে বেশী কথা না বললেও বন্ধুদের সমাবেশ উপভোগ করতেন।[১৮] যে সময়ে নরেন্দ্রনাথ লিখছিলেন তখন যুদ্ধ, রাজনীতি আমাদের সমাজের ওপর, জীবনের ওপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাতে বিচলিত হলেও ভেসে যান নি। তিনি এই সময়কে নিঃশব্দে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যুদ্ধ সমস্যা নিয়ে লেখা গল্পগুলো আমাদের মনকে ঘা দেয়, আন্দোলিত করে। অন্তরে তিনি দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। 'নরেন্দ্রনাথ - সাহিত্যকে যে হুজুগে পরিণত' করেননি অজস্র প্রলোভনের মধ্যেও সুধর্মে নিধনকেই যে শ্রেয় মনে করেছিলেন, এই কারণেই তিনি আমাদের নমস্য।'[১৯]

নরেন্দ্রনাথের মধ্যে মধ্যবিত্ত যে মানসিকতা এবং রক্ষণশীলতা ছিল, তিনি তাঁর নিজস্বতা থেকে কখনোই সরে আসেন নি '-'তার লেখা পড়লেই জানা যায় বিদ্বেষ কি তিনি তা জানেন। রক্তঝরা কামনা কেমন তাও তার অজানা নয়। কিন্তু তার অন্বেষণ সমস্ত ভাঙাচোরা মুখের ভেতর থেকে একটি প্রসন্ন মুখ আবিষ্কার করা।'[২০]

গ. পূর্ববর্তীদের প্রভাব

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আগে ছোটগল্পের জগতে যারা নতুনত্বের স্বাদ এনেছে বা চমক এনেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ ইত্যাদিরা, এবং এদের অনেকটা আগে গ্রাম বাংলার সমস্যা নগরমুখী জীবনযাত্রা নিয়ে যিনি বাংলা সাহিত্যকে অনেকখানি অলংকৃত করেছেন তিনি

হলেন শরৎচন্দ্র। এছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনায় নারীরা তাদের প্রেম, প্রীতি স্নেহের এবং নির্যাতিতার রূপ নিয়ে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের লেখার এই বিষয়গুলোতেই বেশ মিল লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে দেখা যায় গ্রাম থেকে শহরে মানুষ উপার্জনের, শিক্ষার প্রয়োজনে চলে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামের আকর্ষণকে ভুলতে পারছে না, নরেন্দ্রনাথের রচনায় গ্রাম এবং শহরে উভয়ই একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ জীবনের একটা বৃহৎ সময় কাটিয়েছেন পূর্ব-বাঙলায়। তাই গ্রাম বাংলা তার গল্পে বারংবার এসেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে চিরকালের জন্য চলে আসাতে একটা দুঃখ তার মধ্যে সর্বদাই ছিল।

শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক ছিলেন। বাঙালী পরিবারের একেবারে আঁতের কথাকে তিনি গভীর মমতায় এঁকেছেন। বিশেষ করে নারীদের যে স্নেহশীলা, মমতাময়ী রূপ, এবং ভাবাবেগ, তাকে তিনি উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। নরেন্দ্রনাথ ও একটি বিশেষ সময়ে এই বাঙালী মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের প্রতি-নিধিস্থানীয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর গল্পে স্ত্রীচরিত্রগুলিতে সহনশীলতা, আত্মত্যাগের ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়, এ ক্ষেত্রেও তিনি শরৎচন্দ্রের অনুসারী বলা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নারীদের তুলনায় 'প্রেমের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের নারীরা অনেক বেশী উদ্যোগী ও সাহসিক-উন্নত চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।'[২১] শরৎচন্দ্রের পর সময়ের পরিবর্তনের ফলে নারীদের মধ্যে ক্রমশ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মৌলিক একটা মিল থেকে গেছে, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের নায়িকারা এ যুগে থাকলে হয়তো এই প্রগতিশীলতায় চলে আসতো।

আধুনিক কথা সাহিত্যের লেখকদের লেখায় পল্লীগ্রাম ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের লেখায় পল্লী, প্রধান

উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পল্লী তাদের কাছে প্রধান বাস্তব রূপে দেখা দিয়েছে। তার প্রধান কারণ হলো লেখকেরা ছিলেন গ্রামের সন্তান। শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রথম পল্লীসমাজের ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ উপস্থাপনা ঘটেছে। তার রচনায় যে সমাজ রয়েছে তা বর্ণবাদ শাসিত। উঁচু বর্ণের সমাজপতিরা সেখানে সামাজিক দলাদলি ও কুৎসা রচনায় দক্ষ। কিন্তু সেখানে মহৎপ্রাণ মানবিক মানুষও রয়েছে, সমাজ যাদের ভিন্ন ভাবে পীড়ন করে। শরৎচন্দ্রের পর পল্লীসমাজের বাস্তবতার রূপকার রূপে এনেছেন জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রমুখ। পল্লী সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা ছিল - সেখানকার জীবন হল সবুজ, শান্ত সুন্দর। সরল মানুষেরা নিশ্চিন্ত জীবন কাটায় সেখানে। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত পল্লী সম্পর্কে এই প্রথাগত ধারণাকে দূরে সরিয়ে পল্লীর কঠিন বাস্তব রূপকে তার সাহিত্যে নিয়ে এলেন। 'তাঁর পল্লীর অধিকাংশ মানুষই ইতর, লোলুপ, বিবেকহীন, দুশ্চরিত্র ও আত্মসর্বস্ব। ভালোরা সেখানে মন্দদের কাছে পরাজিত হয়। তাদের জীবন ভরে যায় অশেষ দুর্গতিতে।'[২২]

নরেন্দ্রনাথের গল্পে পল্লীর চিত্র আমরা জগদীশ গুপ্তের মতো পাই না। জগদীশ গুপ্তের মানুষদের নরেন্দ্রনাথের গল্পে আমরা দেখিনা। জগদীশ গুপ্ত ছিলেন মানুষের জীবনের ব্যর্থতা কঠিন চিত্রের রূপকার। মানুষের ব্যর্থতার পিছনে এক রহস্যময় অশুভ শক্তিতে তার বিশ্বাস ছিল। তার গল্পে মানুষ জটিল, প্রকৃতি নিষ্ঠুর, নিয়তিও সেখানে কুচক্রী। মানব চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলিকে তিনি তার 'পয়োমুখম্' 'গতিহারা জাহ্নবী', 'অসাধু সিদ্ধার্থ' ইত্যাদি গল্পে নিয়ে এলেন যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তার এই পূর্ববর্তী লেখকের কোন বৈশিষ্ট্যকেই গ্রহণ করেননি, বা তাকে জগদীশ গুপ্তের রচনা প্রভাবিত করতে পারেনি।

নরেন্দ্রনাথ স্বভাবের দিক দিয়ে ছিলেন অনেকখানি বিভূতিভূষণের সমগোত্রীয়। অনেক লেখকেরই চলতে চলতে পেছনে ফিরে তাকানোর বাসনা থাকে, ফেলে আসা জীবন, মানুষ তাদের বারবারই ইশারায় ডাকে। তাই এদের রচনার প্রকৃতিও কিছুটা মন্থর বা বলা যায় যেন স্মৃতি বেদনায় আর্দ্র। বিভূতিভূষণ এই গোত্রের লেখক। নরেন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ফেলে আসা জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং বেদনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের একটা মন দুঃসাহসী, রোমান্টিক। আর একটি মন একান্তভাবে অতীত লগ্ন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মন সবটাই ঘরোয়া, কিন্তু সে মন গ্রামীন বা অতীত লগ্ন নয়। বিভূতিভূষণ নগর জীবনকে কখনোই আপন করে নিতে পারেননি। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে পরিপূর্ণভাবে নাগরিক হয়ে না উঠতে পারলেও নগর জীবনে তার অনাগ্রহ ছিল না।

আবার তারাশঙ্করের রচনায় যে পল্লীর চিত্র পাই - তা নরেন্দ্রনাথের রচনায় দেখা যায় না। তারাশঙ্করের পল্লী লালমাটির রূঢ়তায় ঘেরা, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের পল্লী অনেক আর্দ্র। তারাশঙ্করের মানুষেরা অন্তজ: শ্রেণীর, সেখানে নরেন্দ্রনাথের মানুষেরা সম্পূর্ণ রূপে বাঙালী। একজন রাঢ় বাংলার কথাকার, অন্য জন জলে জলে একাকার আর্দ্র পূর্ববঙ্গের মানুষ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নগরে যে রহস্যবোধ, নাগরিক জীবনের জটিলতা, বিস্ময় রয়েছে তা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নেই, আবার নগর জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বৈজ্ঞানিক সুলভ কৌতূহল বা 'নির্মোহ বিশ্লেষণ তা-ও হয়তো নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নেই। তাহলেও নগর জীবনের রূপায়নে নরেন্দ্রনাথ যে প্রেমেন্দ্র-মাণিকের উত্তর সাধক তাতে সন্দেহ নেই।'[২৩]

এই সময়কার লেখকদের মধ্যে যুদ্ধ মন্বন্তর, বস্ত্রসংকট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখার একটা প্রচেষ্টা চলছিল। প্রায় একই বিষয় বস্ত্রসংকট নিয়ে লেখা নরেন্দ্রনাথ

এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে বেশ তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। নরেন্দ্রনাথ একটি গল্পে লিখেছেন -

> সেলাই করা সুবিধা হচ্ছেনা দেখে গায়ের রাগে চাঁপা নিজেই বোধহয় সেগুলি আবার টেনে ছিঁড়েছে। পলকের জন্য সেই নিরাবরণ নারীদেহের দিকে তাকিয়ে বংশী চোখ ফিরিয়ে নিল।[২৪]

এরকম পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

> ... কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট পাথর ভরে জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।[২৫]

দুটো গল্পেই বস্ত্রের চরম সংকটের দিনগুলির কথা রয়েছে। কিন্তু মাণিকের গল্পে যে তীব্র জ্বালা সেটা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নেই। অসহায় অবস্থায় মৃত্যু যে কত ভয়ংকর, মাণিক তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে যান কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মানুষের অসহায়তাকে বুঝিয়ে দেন অনেকটা আভাসে ইঙ্গিতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ঘণের মুলুক' অথবা সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' 'পরশুরামের কুঠার' ইত্যাদির মতো অল্পবিস্তর চমকপ্রদ বৈচিত্র্যের স্বাদ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে আমরা পাই না। তাঁর গল্পের পটভূমি মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনের পারিবারিক ক্ষেত্র।

ঘ. নরেন্দ্রনাথের গল্প ও রচনাবৈশিষ্ট্য

আদিপর্ব (১৩৪৬-৫০)

নরেন্দ্রনাথ একসময় তাঁর রচনার প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন -

> ... প্রীতি, প্রেম, সৌহার্দ্য স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

মোটামুটি ভাবে ১৩৪৬ থেকে ১৩৫০-এ লেখা গল্পগুলিতে এই মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক এবং মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। ১৩৪৬-এ 'পুরুষ' এবং ১৩৪৯-এ 'যৌথ' এই দুটি গল্পে দেখা যায় পরিবারের একজন বধূকে নিয়ে দু-ভাইয়ের মধ্যে ঈর্ষার সংস্কার। অবশ্য প্রথম গল্পে (পুরুষ) এই ঈর্ষার মধ্যে দিয়ে যোগেনের মনে এক-ধরনের জেদ সৃষ্টি হয় আর তাই সে তার পুরুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় 'স্ত্রী অনিমা' কে শাসন করে। গল্পে দেখা যায় যোগেনের ভাই যুগেন - দুটিতে বাড়িতে এলে অনিমা খুশীতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে যা যোগেন সহ্য করতে পারে না এবং যুগেনের সঙ্গে অনিমাকে মেলামেশা করতে নিষেধ করে, অনিমা সে কথা গ্রাহ্য করে না, এর ফলে যোগেন তার স্বামীত্ব এবং পুরুষত্ব দেখাতে শক্তি প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয় গল্প 'যৌথ'তে দুই ভাই-এর মধ্যে যোগসূত্রকারী বাড়ির একমাত্র স্ত্রী মল্লিকাকে নিয়ে রেষারেষি। অনুরূপের স্ত্রী মল্লিকা সে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামী এবং দেওয়র স্বরূপকে নিয়েই অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে চলে। স্বরূপ হঠাৎ দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায় এবং শিল্পকর্মে নিপুন হয়ে ওঠে। মল্লিকা দুই ভাইকেই

খুশী রাখতে চেষ্টা করে, ফলে তার স্বামী তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে, ছোটভাই সুরূপের সঙ্গে তার নিজের স্ত্রী মল্লিকার সম্পর্ক সে ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেনা। মানুষে মানুষে বিচিত্র সেই সম্পর্কের ইঙ্গিত এই গল্প দুটিতে নরেন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন। ১৯৪১-এ লেখা তাঁর অন্য দুটি গল্প 'কুমার সম্ভব' এবং 'কুমারী শুক্লা' প্রথম গল্পটিতে রয়েছে সমাজে অবহেলিত এক কু-দর্শনা নারীর কথা, যে সন্তানের জন্ম দিয়ে 'মা' ডাক শুনতে চায় কিন্তু নিজের কু-রূপে যদি সন্তান তাকে ঘৃণা করে এই আশঙ্কায় ভাবী সন্তানের চোখ দুটিকে অন্ধ করে দিতে চায়। এক ধরণের বঞ্চনার থেকেই তার মধ্যে যে দুঃখের বা মন-বেদনার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে জন্ম নিয়েছে এ ধরণের নিষ্ঠুর ভাবনার। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার আড়ালে রয়ে গেছে অশ্রু সজল এক মমতাময়ী মায়ের মন। কিন্তু দ্বিতীয় গল্প 'কুমারী শুক্লা'তে দেখা যাচ্ছে - মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে সুনির্বাচিত পাত্রকে না গ্রহণ করার প্রসঙ্গ আসছে, অর্থাৎ সমাজের যে একটা পরিবর্তন সেটা আমরা নরেন্দ্রনাথের এই গল্পে দেখতে পাচ্ছি। তবে বাঙালী মধ্যবিত্তমন নারীর এই নিজস্ব পছন্দ করার বিষয়কে সহজে মেনে নিতে পারেনি। শুক্লার সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনায় প্রশান্ত'র বিচ্ছেদ হয়ে গেলে শুক্লার বাবা তাই বলেন -

> দূর হয়ে যা হারামজাদী লেখাপড়া শিখেছিস বলেই কি
> স্বেচ্ছাচারিনী হতে হবে ?'

শুধু সুনির্বাচিত পাত্রকে গ্রহণ করার সাহস-ই নয়, বয়সে ছোট এরকম পুরুষকে গ্রহণ করার প্রসঙ্গও লেখক এনেছেন। সমাজের পরিবর্তন এভাবেই আমরা এখানে পেয়ে যাই -

> বয়সে দু-বছরের বড়, কিন্তু জাতে দু-ধাপ ছোট,
> কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করবার দিনক্ষণ সারা পঞ্জিকায়
> কোথাও পাবে না।[২৬]

১৩৫০ - এ গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'মহাশ্বেতা', 'হলদেবাড়ি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'মদনভস্ম'। নরেন্দ্রনাথের মূল পরিচয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্পকার হিসেবে। তাঁর অনেক গল্পের মূল শীর্ষ মুহূর্তটির অবলম্বন হয় মানুষের মনের কোন না কোন গ্রন্থি উন্মোচন, সে কারণেই তাঁর গল্পের একটা বড় অংশ ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'মহাশ্বেতা' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে ভালোবাসা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এসেছে। 'মহাশ্বেতা' গল্পে চিন্মোহন প্রকৃতপক্ষে ভালোবেসেছিল অমিতার শ্বেতবেশের শুভ্র রূপটিকে, বিবাহের পর যখন সালংকারা অমিতাকে সে দেখে তখন মন তার বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, কারণ এ রূপের সঙ্গে সে পরিচিত নয়, এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধও নয়। এখানে বোঝা যায় বিবাহ বন্ধনে পরস্পর তারা আবদ্ধ হলেও ভালোবাসায় তাদের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে গেল। 'হলদেবাড়ি' গল্পেও লেখক প্রেমের প্রসঙ্গ এনেছেন, কিন্তু এ গল্পে যুদ্ধের সময় এবং খাদ্যাভাবের প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে এসেছে। এ গল্পে প্রেম মূল বিষয় হলেও যুদ্ধের সৈন্যদের পদধ্বনি গল্পের প্রথম থেকেই শোনা যায়, এ গল্পেই দেখা যায় একজন অনাহারে পীড়িত মানুষ, যে ডাস্টবিন থেকে খাবার সংগ্রহে সচেষ্ট হচ্ছে। ১৩৫০ -এ বাংলার বুকে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার চিত্র কোন রকম অতিরঞ্জিত না করে লেখক দু-একটি কালির আচড়ে অসাধারণ ভাবে এ গল্পে এঁকেছেন। এই দৃশ্য আমাদের পঞ্চাশের দশকে সোমনাথ হোড়ের ভাস্কর্য অথবা 'জয়নুল আবেদিনের আঁকা কলকাতার ফুটপাতে খেতে না পাওয়া ছিন্নমূল মানুষের'[২৭] কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এই ১৩৫০-এর অন্যতম গল্প হল 'মদনভস্ম'। এই গল্পেও নরেন্দ্রনাথ ভালোবাসা, ঈর্ষা - এই প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করলেও গল্পের শেষে এসেছে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের চিত্র, জঠরের অনলে যেখানে ভালোবাসা, কামনাও দগ্ধ হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে একমুঠো ভাতকে কেন্দ্র করে, ভালোবাসায় গড়ে ওঠা সম্পর্কগুলি ছিন্ন হয়ে যায় নিরন্ন খাদ্যের চাহিদায়।

দ্বিতীয় পর্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫১ থেকে ১৩৬০-এর মধ্যে যে গল্পগুলি লিখেছেন, প্রথম পর্বের গল্পগুলি থেকে সেগুলি একেবারেই ভিন্নস্বাদের। দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে যে পট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সেটা এই পর্বের কিছু কিছু গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'নেতা', 'চোর', 'আঘাত', 'পুনরুক্তি', সত্যাসত্য, আবরণ, 'সেতার' ইত্যাদি। আবার মুসলমান সম্প্রদায়কে ঘিরে গল্পগুলি রয়েছে এ পর্বেই, যেমন পুনশ্চ, চাঁদমিঞা, দ্বিরাগমন (কুসুম)। তাঁর বিখ্যাত 'রস' গল্পটি এই পর্বেই রচিত হয়েছে (১৩৫৪)। এছাড়া রয়েছে মেয়েদের অর্থ উপার্জনের কথা, অন্নসংকট, বস্ত্রসংকট ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

—

১৩৫১র ভাদ্রে প্রকাশিত হয় 'নেতা' গল্পটি। এ গল্পে রয়েছে ঘটনাচক্রে কথক ভট্টাচার্য নেতা হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাহেবের অকথ্য গালাগালের প্রতিবাদ জানালে এই ভট্টাচার্যকে বরখাস্ত করা হয় কিন্তু সংসারের প্রয়োজনে অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে তাকে সাহেবের শর্তে রাজি হতে হয়। অর্থাৎ নিজস্ব যে মূল্যবোধ তাকে বিসর্জন দিতে হয়। আবার সেই বছরের আঘের গল্প হল 'চোর'। এই গল্পে অমূল্য কিছুটা দারিদ্র্যের কারণে কিছুটা স্বভাবের দোষে ছোটখাট চুরি করে কিন্তু তার স্ত্রী যেদিন সত্যিই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুরি করে সেদিন অমূল্য আচমকা আঘাত পায়। সে তার স্ত্রীকে চুরির জন্য প্ররোচনা দিলেও মনেপ্রাণে কখনোই সে চুরি করুক - এটা অমূল্য চায়নি। নিম্নবিত্ত মানুষ অর্থনৈতিক চাপে কীভাবে তাদের স্বভাবের পরিবর্তন করছে, মূল্যবোধ বিসর্জন দিচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে। 'পুনশ্চ' গল্পেও (১৩৫২) রয়েছে যুদ্ধের প্রসঙ্গ। যুদ্ধের ফলে যখন খাদ্য জোটে না তখন জৈনুদ্দিনের ফতেমার প্রতি ভালোবাসায় ঘাটতি

পড়ে। যে ফতেমাকে বিয়ে করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাকেই অতি সহজে সে তালাক দেয়। যুদ্ধের ফলে কেমন করে অনাহারে বাংলার গৃহগুলি শূন্য হয়ে গেছে, মানুষ কিভাবে শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য আত্মিক মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে তা দেখা যায়। দেহজীবিনী ফতেমার সঙ্গে তারই এক সময়কার স্বামী জৈনুদ্দিন যখন দরাদরি করে তখন বোঝা যায় মানুষের শুভবোধ কীভাবে ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়েছে। মানুষ পরিস্থিতির কাছে কতখানি অসহায়।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে থাকাকালীন সময়ে যে বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধ চালাবার খরচ সংগ্রহ করেছিল তাদের অধীন উপনিবেশগুলিকে শোষন করে। এর ফলে মানুষের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষ বারংবার আঘাত করেছিল এই সব দেশের অর্থনীতিকে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের খাদ্য সংকটের পাশাপাশি ভয়াবহ বস্ত্রসংকট দেখা দিল। কাপড়ের অভাবে তখন দরিদ্র ঘরের মেয়েরা দিবালোকে বের হতো না, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের জন্য অনেক রমণীই দেহ-জীবিনী হয়েছিল। কাপড়ের জন্য লুটতরাজও চলতো। এই সংকট বাংলা ছোটগল্পে রূপায়িত হয়েছে ব্যাপকভাবে যা দেখতে পাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুবোধ ঘোষের গল্প পর্যন্ত। নরেন্দ্রনাথের 'আবরণ'(১৩৫২) গল্পেও রয়েছে এই সংকটের কথা। চাঁপাকে তার স্বামী বংশী কাপড় দিতে পারে না। বংশী পতিতাপল্লীতে গিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে নারীকে দেখে না, দেখে তার পরনের কাপড়টিকে। সুখদার দেহ থেকে কাপড় খুলে নিয়ে যাবার সময় নগ্ন সুখদাকে দেখে নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়, তাই - 'হঠাৎ দুচোখ বুজে সেই কমলা রঙের শাড়ীখানা ছুড়ে দিল সুখদার কুৎসিত দেহটার ওপরে।'[২৮] লেখক এ গল্পে দেখিয়েছেন অভাবের কাছে মানুষের শুভবুদ্ধি হার মানে নি। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য লেখকদের এখানেই পার্থক্য। তিনি কখনোই নির্মম নিষ্ঠুর হননি। যেমন অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের 'বস্ত্র' গল্পে দেখা যায় ছাদেম একটা আস্ত বস্ত্র পায় এবং সে ব্যবহার করে সেটাকে ঠিকই কিন্তু পরনের জন্য নয়, গলায় দড়ি দেবার জন্য, সেই কাপড়ই দ্বিখন্ডিত হয়ে আবার ফিরে আসে তার স্ত্রী এবং পুত্রবধূর পরণে। 'সেই কাপড়ে সসম্মানে তিন অংশ বোধহয় হতে পারতনা। আর আগেই শাশুড়িতে বৌয়ে ভাগ করে নিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে।'[২৯] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতি আরো নিষ্ঠুর ভাবে এঁকেছেন 'দুঃশাসনীয়' গল্পে, 'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবেনা বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতগুলি ইট পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁকে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।' আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে কাপড়ের আড়তদার শুষিকদের হেঁসোগুলো দেখে ভাবে - 'যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন।'[৩০] কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে এ ধরণের প্রতিবাদী সংলাপ দেখা যায় না, কারণ সমাজ পরিস্থিতি ও মানবমনের সম্পর্ক নির্ণয়ের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। সমাজে সংস্কারের কথা প্রকট ভাবে কখনোই তাঁর গল্পে স্থান পায়নি। তাই অন্ন সমস্যা বা বস্ত্রসমস্যাকে একমাত্র অবলম্বন করে তার কোন গল্পেই দেখা হয়নি। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি রূপে এ সব ঘটনা তার গল্পে যথেষ্ট পরিমানে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে নরেন্দ্রনাথের গল্প প্রায় নেই বললেই চলে। একটি মাত্র গল্প 'পতাকা'(১৩৫৩)য় এই সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। বাল্যে এবং কৈশোরে পূর্ববাংলার গ্রামে দরিদ্র মুসলমান সমাজকে তিনি দেখেছিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনেক আগেই। এই সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ছোটবয়স থেকেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাই তাদেরকে 'মুসলমান' হিসেবে ভিন্ন দৃষ্টিতে কখনোই দেখেননি। দেশবিভাগের পর হিন্দুদের ওপর মুসলমানরা যখন অত্যাচার করলো, তখন তাঁর লেখায় তিনি সেই ক্রোধ বা ঘৃণাকে স্থান

দিতে পারলেন না। সাম্প্রদায়িকতার প্রতি লেখকের কোনদিনই সমর্থন ছিল না। পূর্ব সম্পর্কের ভালোবাসার বন্ধন-ই শিল্পীর মনে এনেছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা।

যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। অর্থ-উপার্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের পথে নামতে হয়েছে। যদিও মধ্যবিত্ত পুরুষ সমাজ খুব সহজে এটাকে মেনে নেয়নি। নরেন্দ্রনাথের 'সেতার' গল্পে দেখা (১৩৫২) যায় যক্ষায় অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা এবং সংসার খরচ জোগাবার জন্যই নিলীমা গানের টিউশনি নেয়। কিন্তু সত্যিই নীলিমা যেদিন পেশাগত ভাবে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেল সেদিনই স্বামীর চাহিদাকে তার অধিক মূল্য দিতে হল। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন এমন একটি সময়ের লেখক যে সময় মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটাই স্থান দখল করেছে। কিন্তু তখনও শিক্ষিতা মেয়েদের ওপর তাদের পরিবারের অভিভাবকদের কর্তৃত্ব প্রবলভাবেই ছিল। মেয়ে কাকে বিয়ে করবে, চাকরী গ্রহণ করবে কিনা এ সব বিষয় অভিভাবকদের মতানুসারেই হত। কিন্তু ক্রমশ সেই শাসনের বন্ধন থেকে স্বাধীন ভাবে তারা চলতে চাইল। এর ফলে পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে এই সময় একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নারী প্রজন্ম তৈরী হতে লাগল যারা পরিবারের ইচ্ছা অনিচ্ছার থেকেও নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করলো। সমাজের মধ্যে এই যে একটা পট পরিবর্তন সেটা নরেন্দ্রনাথের 'অবতরনিকা'(১৩৫৬)'বিলম্বিতলয়'(১৩৫১) ইত্যাদি গল্পে দেখা যায়। 'অবতরনিকা'তে রয়েছে পুরোপুরি অর্থনৈতিক সূত্রের দ্বারা সংসারের রূপ পরিবর্তিত হবার কথা। স্বামীর 'সংসার চালাবার জন্যই আরতির অর্থ উপার্জন করতে নাযা। এই স্বামীই তাকে অফিস থেকে দেরিতে আসার কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে চাকরী ছাড়তে বলে। আবার সহকর্মিনীর প্রতি

অন্যায়ের প্রতিবাদে আরতি যখন নিজেই চাকরী ছেড়ে দেয় তখন এই পরিবারের লোকেরাই আবার ক্রুদ্ধ হয় কারণ পরিবারে সংসার খরচ চালাবার মতো আর কোন উপায় নেই। এই গল্পেও দেখা যায় নারীর অর্থ উপার্জনকেও পুরুষ নিয়ন্ত্রন করতে চাচ্ছে।

১৩৫২-৫৪তে নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প প্রেমকে উপজীব্য করে লিখেছেন। তার মধ্যে 'পুনশ্চ চাঁদমিঞা', 'রস' ইত্যাদি গল্পগুলি মুসলমান সমাজ নির্ভর। 'চাঁদমিঞা', তে প্রেমের যে রূপ রয়েছে 'দিবারাগম' অতিক্রম করে 'রস' গল্পে তা অনেক বেশী গভীরতা লাভ করেছে। সেটা গল্পের বিষয় রীতি সমস্ত দিক থেকেই। এমনকি 'রস' গল্পে আগের দুটো গল্প থেকে ভাষা পর্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রেম-মূলক গল্পের ক্ষেত্রে ক্রমশ একটা উত্তরণের দিকে তিনি অগ্রসর হয়েছে। বস্তুতঃ কল্লোলোত্তর নরেন্দ্রনাথের এই 'রস' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে যৌনচেতনা। মোতালেফ ফুলবানুকে চায় তার দেহকে পাবার জন্য, আর এই কারণে যাজু খাতুনের সরলতার সুযোগ নিয়ে তার ভালোবাসাকে পদদলিত করে। 'এক পরিশীলিত মার্জিত ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষা গুণেই এই গল্পের যৌনতা কখনও মাত্রা ছাড়ায় না।'[৩১]

কল্লোলের লেখকেরা যৌনতার ক্ষেত্রে যে আতিশয্য দেখিয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেটা দেখাননি কিন্তু ফ্রয়েড সম্পর্কে তাঁর যে বিশেষ অধিকার ছিল সেটা বোঝা যায় 'চেনাঅহল' 'দেহমন'-এর মতো উপন্যাস থেকেই। 'জন্মদিন' নামে একটি গল্পের মধ্যে ইন্দুভূষণের মুখে শোনা যায় - 'আমাকে দেহবাদী বলে ভুল করবেন না, আমি দেহাত্ম-বাদী, দেহ-ই আত্মা নয় দেহও আত্মা।'[৩২] 'রস' এই দেহকেন্দ্রিক ভালোবাসার আত্মিক উত্তরণের গল্প। মোতালেফ গল্পের শেষে বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রথম যাজু খাতুনের বড় বড় জলভরা কালো চোখ দেখার সময় পেয়েছে তাই কোন ক্ষমা ভিক্ষা করা আর তার হয়ে ওঠে নি। মোতালেফের চোখও জলে আপনি-ই ভেসে যায়। নাদির শেখ তাই যখন বলে - 'আপুন

নিবা গেল কইলকার ?' মোতালেফ উত্তরে বলে - 'না মেঞা ভাই, নেবে নাই' - এই অস্তিম সংলাপটির ঔজ্জ্বল্য সমস্ত গল্পটিকে দ্রুত আলোকিত করে তোলে এবং পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে দেয়। পাঠক হৃদয়ও ব্যথিত হতে হতে অকস্মাৎ-ই থমকে দাঁড়ায় এই আলোর উদ্ভাসনে। আর এখানেই গল্পটির রস পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠক অনুভব করে সমাজ ও সম্প্রদায়ের দন্ডী অতিক্রম করে এক না-নেভা আগুনের আলো দাম্পত্যের 'রস'কে জীবনের রসে কতখানি উত্তীর্ণ করে দিয়ে যায়।

১৩৫৫ থেকে ১৩৬০-এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছেন যেখানে মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করে নিচ্ছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন 'কাঠগোলাপ' (১৩৫৫), 'টিকেট'(১৩৫৬)'টর্চ'(১৩৫৬), 'ফেরিওয়ালা'(১৩৫৬), 'হেডমাস্টার'(১৩৫৬) দ্বিচারিনী (১৩৫৬) পূর্ববঙ্গের পরিবেশ লেখকের বিভিন্ন গল্পের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে এসেছে। শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ-ই নয়, দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের বেদনা, মুখের ভাষাটুকুও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উদ্বাস্তু হয়ে আসা, মানুষেরা শুধু এক দেশ থেকে অন্য দেশেই আসেনি, পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের এতোদিনের সঞ্চিত ধারণা, - মূল্যবোধ, বিশ্বাস সব কিছুকেই পাল্টে নিতে বাধ্য হয়েছে। 'কাফ্কার মেটামরফসিস'-এর মাকড়সায় রূপান্তরিত হয়ে যাবার মতো নরেন্দ্রনাথের গল্পে 'হেডমাস্টার' হয়ে যায় কেরানী, গ্রামের বধূ রূপান্তরিত হয়ে যায় ঝিয়ে। কেউ কেউ অবশ্য পুরনো অভ্যাস, জীবন ভুলতে পারেনি। লেখকের নিজেরও অবচেতন মনে এই পিছনে ফেলে আসা জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল। তার 'হেডমাস্টার' গল্পে পুরনো ছাত্রকে অবলম্বন করে ব্যাংকের চাকরি পেয়েও অফিস ছুটির পর তিনি বেয়ারাদের মাস্টারীই করেছেন। যদিও তিনি বলেছেন - 'কেরানী গিরি থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজি আছি।' বোঝাই যায় উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষেরা বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় কতখানি অসহায়। 'দ্বিচারিনী' গল্পে অসুস্থ স্বামীর

পরিচর্যার জন্য ফরিদপুরের গ্রামের বধূ তরঙ্গকে ঝি-এর কাজ নিতে হয়। কিন্তু সে শহরের আর পাঁচজন ঝি-এর মতো হয়ে উঠতে পারে না। যুদ্ধকালীন নগর জীবন ধরা পড়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণে। যারা বাঁচার জন্য ঘর ছেড়েছে তার সেই সঙ্গে মিথ্যে সম্ভ্রমবোধকেও ছেড়েছে। 'ফেরিওয়ালা' গল্পে দেখি মধ্যবিত্তের মনোভাব বিসর্জন দিয়ে প্রফুল্ল ফেরিওয়ালার কাজ নিয়েছে। আবার 'কাঠগোলাপ' গল্পে দেখা যায় ফেলে আসা গ্রামের জন্য দুঃখ এবং শহরবাসের আনন্দ। স্ত্রী অনিমা পাকিস্থানের জন্য দুঃখ করলেও শহরবাসের আনন্দ তাকে ঢেকে দেয় আবার স্বামী নীরদ বছর দশেক শহরে থাকলেও গ্রামের বাঁশের ঝাড় গাছের ছায়া মনকে ছেয়ে ফেলেছে। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নাগরিক মানসিকতা যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে ছিল সেটা তার এই দ্বিতীয় পর্যায় গল্পগুলি থেকেই বোঝা যায়। কলকাতা ক্রমশ, তার কাছে প্রিয় জায়গায় হয়ে উঠেছিল। 'কাঠগোলাপ' গল্পে হারানো গ্রামজীবনের জন্য দুঃখ আর নগর জীবনের প্রতি ভালোবাসা উভয়ই একত্রে স্থান পেয়েছে। যেটা বিভূতিভূষণের মধ্যে বা তারাশঙ্করের গল্পের মধ্যে ছিল না। তারা কখনোই পুরোপুরি নগর মানসিকতার হয়ে উঠতে পারেননি। নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প রয়েছে যেখানে সামান্য বস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভব বেদনা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। যেমন 'টিকিট'(১৩৫৬) শাল (১৩৫৬) টর্চ (১৩৫৬) পালঙ্ক (১৩৫২) একপো দুধ (১৩৫২) দশটাকার নোট (১৩৫২) জামা (১৩৬০) ইত্যাদি গল্পগুলি। সবগুলি গল্পই যে অসাধারণ হয়েছে তা নয় কিন্তু কিছু গল্পে বস্তু তার বস্তুত্বকে ছাড়িয়ে অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। নরেন্দ্রনাথের বহুগল্পেই কলকাতা তার বিচিত্র রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে যেমন 'টিকেট' গল্পটিতে রয়েছে ট্রাম-যাত্রী এবং টিকেট ফাঁকি দেবার দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে একটি করুণ কাহিনী। শহরের জীবন যাত্রার মধ্যে যে একটা ক্রমিক পরিবর্তন আসছে সেটা বেশ কিছু লেখকের লেখাতেই রূপ পেয়েছে, নরেন্দ্র-নাথ মিত্র ও এই সব লেখকদের মধ্যে অন্যতম।

আবার সামান্য একটি 'শাল' দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে স্মৃতির কাটার মতো জেগে থাকে যাকে কিছুতেই অতিক্রম ও করা যায় না আবার মনে রাখতেও চায় না কেউ। অন্যত্র একটি 'পালঙ্ক'-কে ঘিরে দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে থাকা মানুষের অন্তরের যোগ-ই বড় হয়ে ওঠে। পালঙ্ক গল্পে পালঙ্ককে ঘিরে ধনী রাজমোহনের কাছে দরিদ্র দিনমজুর যকবুলই আপনজন হয়ে ওঠে। এক অসাম্প্রদায়িক মানবতার প্রীতি সম্পর্কের কথা রয়েছে এই গল্পে। এখান থেকে বোঝা যায় নরেন্দ্রনাথ প্রকটভাবে নয় কিন্তু প্রখরভাবে সমাজ সচেতন ছিলেন। দরিদ্রজনিত অসহায়তার কথা রয়েছে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বহু গল্পে তার মধ্যে 'দশটাকার নোট' 'জামা' উল্লেখযোগ্য। 'দশটাকার নোট'(১৩৫১) গল্পটিতে মানুষের দারিদ্র্য জনিত অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'জামা' গল্পটিতে ধনী দরিদ্রের সামাজিক মানসিক এবং অর্থনৈতিক বিভেদ স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিদেশী বিখ্যাত ছোট গল্পকার 'গোগলের' 'ওভারকোট' গল্পেও একটি সামান্য বস্তুকে নিয়েই গল্প রচিত হয়েছে . কিন্তু সেখানে রয়েছে দরিদ্র মানুষটির অভিমানের সঙ্গে প্রতিবাদ করার চেষ্টা। তাই ঘরে গিয়েও সে ধনী মানুষটিকে ছেড়ে দেয় না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এই গল্পে রয়েছে নিম্নবিত্ত মানুষের অভিমান, পরিবেশের কাছে তার নতিস্বীকার এবং পরিচিত ধনী ব্যক্তিদের প্রতি তাদের স্বাভাবিক দ্বিধান্বিত মানসিকতা।

তৃতীয় পর্যায় (১৩৬১-৭০)

তৃতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে নরেন্দ্রনাথ বিষয়ের দিক দিয়ে বেশ বৈচিত্র্য এনেছেন, যা প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে সেভাবে দেখা যায় না। অর্থাৎ তার লেখায় ক্রমশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন এই পর্যায়ের বেশ কিছু গল্পে রয়েছে বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তরুণীর প্রাথমিক শ্রদ্ধা যা ধীরে ধীরে আকর্ষণে পরিণতি লাভ করেছে।

যেমন 'ছাত্রী' (১৩৬১) 'একটি ফুলকে ঘিরে' (১৩৬৮) 'সম্মোহন' (১৩৬৮), 'ছাত্রী' গল্পে প্রৌঢ় অধ্যাপক তরুণী ছাত্রী মীরার প্রতি ঈষৎ আকৃষ্ট হন। প্রৌঢ় অধ্যাপকের অনুকম্পা মিশ্রিত আকর্ষণ এবং ছাত্রী মীরার শ্রদ্ধা ক্রমশ প্রগাঢ় প্রেমে রূপান্তরিত হয়। তার গল্পে এই জাতীয় ভালোবাসার কথা থাকলেও দ্বিধান্বিত একটা দূরত্ববোধ থেকে গেছে। কখনো বিরূপ মানসিকতা থেকেও প্রৌঢ়ের প্রতি তরুণীর আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়েছে। যেমন 'একটি ফুলকে ঘিরে' গল্পে দেখা যায় মায়ের প্রৌঢ় বন্ধুকে অপছন্দ করতো রিনি, তার কাছ থেকে ফুল উপহার পেয়ে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য আবিষ্ট হয়ে গেলেও রিনি কিন্তু পরে ঘৃণায় লজ্জায় নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয় - এ কাকে সে জয় করেছে, এ জয় তো তার কোন গৌরব নেই। নরেন্দ্রনাথ মানব-মানবীর মনের অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্বের দিক তুলে ধরেছেন, কিন্তু এ ধরনের ভালোবাসায় তিনি আস্থা রাখতে পারেন নি। প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রতি নারীর এই আকর্ষণকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথের অনেক পূর্বের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসে এ ধরণের প্রেমকে কখনোই সমর্থন করেন নি, কুন্দকে তাই আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' অথবা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত তে এ ধরণের না-সামাজিক প্রেমের আভাস পাওয়া গেলেও তা অত্যন্ত কোমল মধুর, নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তার ৬০'এর দশকের এই জাতীয় প্রেমের গল্পে কাউকে সমর্থন বা অসমর্থন করেননি।

এই পর্যায়ে বেশ কিছু গল্প তিনি লিখেছেন যৌনবাসনাকে কেন্দ্র করে অথবা যৌন বাসনা কীভাবে বিকারের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয় সে বিষয়ে। যেমন 'ঘাস' (১৩৭০) পার্শ্বচর (১৩৬৭) ইত্যাদি গল্পে তিনি মানুষের অবদমিত যৌন প্রবৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন, অবদমিত আকাঙ্ক্ষার যে সংকট তাকেও তুলে ধরেছেন। 'ঘাস' গল্পটিতে নারীর সন্তান কামনার তীব্রতা এবং স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের জটিল

পরিস্থিতি একসঙ্গে মিলে সুনন্দার মধ্যে এক বিকারগ্রস্থ নারীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু লেখক এমনভাবে তাকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যাতে এই নারীর প্রতি পাঠকের একটা স্বাভাবিক -সহানুভূতি থেকে যায়। নরেন্দ্রনাথ যখন এ ধরণের গল্প লিখেছেন সে সময় বিশ্ব-সাহিত্যেই দেখা যায় মানসিকভারসাম্যহীন চরিত্রকে কথাসাহিত্যে গুরুত্ব দেবার প্রবণতা আসছে। স্বাভাবিকভাবেই নরেন্দ্রনাথের গল্পেও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের চরিত্ররা স্থান পেয়েছে। তবে মনস্তত্ত্বের জটিলতা নিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'সরীসৃপ' বা প্রেমেন্দ্র মিত্র 'হয়তো' ইত্যাদি গল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন সে ধরণের প্রয়াস নরেন্দ্রনাথে দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের পর তিনি অন্যতম লেখক যিনি নারীকে সহানু-ভূতির দৃষ্টিতে উপস্থিত করেছেন তার গল্পে। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত 'আবহমান' পত্রিকায় 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র' সংখ্যায় লেখকের স্ত্রী শোভনা মিত্র বলেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনে নরেন্দ্রনাথ নারী প্রগতিবাদে বিশেষ তৎপর ছিলেন, 'গ্রামের গতানুগতিক পরিবেশে আমার জীবন যেন একঘেয়েমি না আসে ঘর-সংসারের কাজ আর কর্তব্যের মধ্যেই আমি যেন ফুরিয়ে না যাই, সেদিকে আমার স্বামীর সজাগ দৃষ্টি ছিল। সংসারের গন্ডীর মধ্যে আমার চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ না হয়ে পড়ে।" [৩৩] নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারীরা উন্নত চেতনা, চিন্তাশক্তি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছে। তার প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে নারীরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বা চাকরীর ক্ষেত্রে স্বমনোনীত ব্যক্তিকে জীবনে গ্রহন করছে ঠিকই - কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একটা - দ্বিধাকম্পিত পদক্ষেপ দেখা যায় সে সবক্ষেত্রে। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ে এসে এই সব নারীরা অনেক বেশী প্রগতিশীলা বলে মনে হয় অর্থাৎ যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হল নরেন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের নারীরা নিজ বিশ্বাসের স্বপক্ষে থেকে জীবনে লড়াই করছে। পরিবারে অভিভাবকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে বলিষ্ঠ ভাবেই। অর্থাৎ সমাজের নারীর অবস্থার যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে সেটা নরেন্দ্রনাথের লেখার পরিবর্তনের মধ্যেও ধরা পড়েছে। 'বিকল্প'

(১৩৬২) গল্পে কুমারী সুধা আত্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে প্রেমিক ইন্দভূষণ-এর মৃত্যুর পর বৈধব্য অবলম্বন করেছে। অথবা 'স্বাধিকার'(১৩৬২) গল্পে বীথিকা পিতামাতার অমতে নিজের পছন্দের পাত্রকে অসবর্ণ-বিবাহ করছে। 'পুরাতনী' গল্পে (১৩৬৩) চিত্রা নিজ বিশ্বাসে অচল থেকে বাড়ীর - চাকর অভয়কে বিয়ে করলো। সমাজ মানসের সামগ্রিক যে পরিবর্তন ঘটছে সেটা অনেক স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে 'ললাটের রঙ'(১৩৬১) গল্পে বিধবা অঞ্জলীর সহকর্মীরা সবাই চায় অবিবাহিত সুরেন তাকে বিয়ে করুক। অথবা 'সুদ'(১৩৬৭) গল্পে দেখি - "সেদিন আর নেই মশাই। দেওর ভাসুর বিধবা ভাই বউকে পুষবে, ... আজেকাল মেয়েরা যে নিজের পায়ে দাড়াবার চেষ্টা করে,খুব ভালো মশাই।" [৩৪] - এটা নরেন্দ্রনাথেরও মনেরই ভাষা। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 'আহ্লাদিনী' (১৩৭০) গল্পে বীথিকা আপন ব্যক্তিত্বের জোরে ভালোবাসাকে জয় করেছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের চিন্তা, ভাবনা, তার চরিত্র ভাবনার জগৎ আচরণ, ব্যক্তিত্বকে যে ক্রমশ বদলে দিচ্ছে সেটা নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই ফুটে উঠেছে। তার গল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিবর্তনের ধারাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

চতুর্থ পর্যায় বা শেষ পর্যায় (১৩৭০-৮২)

শেষ জীবনে গ্রামাঞ্চল থেকে দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তার গল্পগুলিতে গ্রামজীবন অপেক্ষা নাগরিক জীবনের কথাই অধিক পরিমাণে উঠে এসেছে। তার গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নরনারীর সম্পর্কের নানাদিক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল বাঙালী নিম্নবিত্ত এবং পরে মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লিখেছেন বলে বিষয়বস্তুতে খানিকটা পৌনঃপুনিকতা এসেছে তার গল্পে। যেমন 'জয়ন্তী'(১৩৭৩) 'পুনরাবৃত্তি'(১৩৭৬)'কোন দেবতাকে'(১৩৮২) ইত্যাদি গল্পে পূর্বের কিছু গল্পে ব্যবহৃত সেই বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তরুণীর আকর্ষণ সংক্রান্ত গল্প লিখেছেন। আবার 'ভালোবাসা'(১৩৭৩) গল্পে সুধা পর পুরুষের সঙ্গে একদিন চলে যায়। কিছু

বছর পরে লেখা 'ফিরে দেখা'(১৩৮১) গল্পেও সর্বানী পরপুরুষের সঙ্গে চলে যায় স্বামীকে পরিত্যাগ করে। 'আরোগ্য'(১৩৭৩) গল্পে ক্যানসার থেকে সেরে ওঠে পরিমল, কিন্তু স্বাভাবিক চেহারা সে পায় না তাই বিকৃত চেহারা নিয়ে প্রেমিকাকে সে অধিকার করতে চায়না। 'খুঁৎ'(১৩৮০) গল্পেও নন্দিতা জন্মের মতো একটানা অকেজো নিয়ে প্রেমিক দিব্যেন্দুর সঙ্গে মিলতে চায় না।

নরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যায়ের কিছু গল্পে নৈরাশ্য, সুগভীর নিঃসঙ্গতাকে নিয়ে এসেছেন যেমন 'নিরুদ্দেশ'(১৩৭৪) 'ফিরে দেখা'(১৩৮১) ইত্যাদি গল্পে। 'নিরুদ্দেশ' গল্পের প্রনবেশ জীবনবীমা অফিসে নিযুক্ত ছিল, এলোমেলো নানারকম আত্মিক জল্পনা-কল্পনার ফলে এক ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাড়িত হতে হতে একধরণের উন্মাদ হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। 'ফিরে দেখা' গল্পেও কেন্দ্রীয় চরিত্র একধরণের একাকীত্বে ভোগে, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। অনেকের মতে নরেন্দ্রনাথ - "আর একটু দীর্ঘায়ু হলে তিনি বোধ হয় আরো বেশি নিঃসঙ্গতার গল্প লিখতেন।" [৩৫] আত্ম পরিচয় মানুষ যে ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে সে প্রসঙ্গ রয়েছে তাঁর 'মুখোশ'(১৩৭৮) গল্পে। এ গল্পে দেখা যায় শ্রীমন্তবাবু হঠাৎই অনুভব করলেন, তিনি তার পরিচিত জগৎ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছেন, পরিচিতদের কাছে তিনি অপরিচিত হয়ে উঠছেন, এবং একটা সময়ে অনুভব করলেন "আমি আমার আইডেনটিটি হারিয়ে ফেললাম নাকি ?" - যুদ্ধোত্তরকালীন সমাজে মানুষ প্রকৃতপক্ষেই আত্মপরিচয় হারিয়ে মুখোসের আড়াল নিয়ে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্পের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নিঃসঙ্গতা, সেই নিঃসঙ্গতা এই 'মুখোস' গল্পেও পাঠক দেখতে পায়। এ গল্পেও একটি মানুষ তার আত্ম পরিচয় হারিয়ে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে। এই নিঃসঙ্গতা এবং প্রত্যাশের ব্যবধান দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের 'বিকালের আলো'(১৩৮২) গল্পে। এ গল্পে দুটি নর-নারী পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের শেষ বেলায় এসে নিজেদের নিঃসঙ্গতাকে অনুভব

করে। সেই সঙ্গে অনুভব করে নতুন কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাও তাদের পক্ষে কঠিন কাজ, তাই মনোরমা বলে " সবচেয়ে বড় কথা বনিবনা হচ্ছেনা নতুন কালের সঙ্গে। আমরা এখন সেকেলে হয়ে গেছি। " নতুন যুগে, নতুন সমাজে এই প্রজন্মের ব্যবধান যে ক্রমশই বৃহৎ হয়ে উঠছে সেটা নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, যার প্রভাব তাঁর রচনার ক্ষেত্রেও পড়েছে।

৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা বৈশিষ্ট্য :

নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলো অধিকাংশই গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনের ওঠানামা, পরিবর্তন, পাওয়া-না-পাওয়ার কথাকে অবলম্বন করে। গল্পের চরিত্ররা তাই স্বাভাবিক ভাবেই অসাধারণ কেউ নয়। এই সব চরিত্রের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথের ভাষা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সহজ ও সরল। প্রয়োজনে তিনি আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে। তার গল্পগুলিতে 'ঘটনায় চমক নেই। আছে তাৎপর্য। ... অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য নরেন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি রচনাকেই দিয়েছে বিদ্যুৎচমকের দীপ্তি।'[৩৬] তার বেশ কিছু গল্পেই এক ধরণের অতীতচারণা (নস্টালজিয়া) দেখা যায়। তার গল্পবলার ভঙ্গীটি নিরুদ্বেজ, 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করেননি তিনি।'[৩৭] বরং প্রাত্যহিক জীবনের চলা ফেরাতে মানুষের যে বিচিত্র অনুভব, তাকেই তিনি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন পাঠকের মনের অতলে।

নরেন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গল্পই উত্তমপুরুষে বলা হয়েছে। তার বলে যাওয়ার ধরণ আত্মকথনের মতো। যেমন তার অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'হেডমাস্টার'-এ শুরু হয়েছে - "টাইপ করা কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্রে নাম স্বাক্ষর করছিলাম।" [৩৮] অথবা 'নাম' গল্পে - "স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম ...।"[৩৯]

নরেন্দ্রনাথের ভাষা সম্পর্কে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন - 'ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রেও নরেন্দ্রনাথের গদ্য আকর্ষণীয়, ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগে স্বল্প ভাষায় তিনি পাঠকমনকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন।'[৪০] নরেন্দ্রনাথের গল্পে বাস্তবিকই দীর্ঘ সংলাপ খুবই কম। ছোট ছোট বাক্যের মধ্যেই তিনি - নর-নারীর জীবনের গভীর দুঃখবেদনা, আনন্দের অনুভূতিকে বিদ্যুৎছটায় উদ্ভাসিত করেছেন। নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন -

> নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আঙ্গিক আর ভাষার বিন্যাস যেমন সূক্ষ্ম কারুকার্য -মণ্ডিত তেমনি তার গল্প বলার ধরণটিও অতি মনোরম। তাঁর গল্পে উপজীব্য চিত্র ও চরিত্রে সমাজ বাস্তবতা তথা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার কারুকার্য যেমন নেই, তবু সব জড়িয়ে তাঁর গল্পের আবেদন স্নিগ্ধ আর ওইখানেই তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।[৪১]

প্রয়োজনে তিনি গল্পের চরিত্রের মুখে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছে, সেটা হয়তো মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বোঝাতেই ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের কাব্যপঙ্‌ক্তি বা বাক্য অনায়াসে তিনি গল্পে ব্যবহার করেছেন - যেমন 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো।' রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকে নরেন্দ্রনাথ মনের গভীরে স্থাপন করেছিলেন, সেকারণেই তার গল্পের মধ্যে রবীন্দ্র কাব্যপঙ্‌ক্তির খুব সহজভাবেই চলে এসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যঞ্জনা গভীর প্রতীকী ভাষা ব্যবহার নরেন্দ্রনাথ মিত্র করেননি। বরং ভাবে এবং ভাষায় তিনি অনেকটাই শরৎচন্দ্রের অনুসারী। গল্পের শুরু বা সমাপ্তিতে তিনি পাঠককে চমক দেবার চেষ্টা করেননি। গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের খুব তুচ্ছ বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করেই তার গল্প। এই তুচ্ছ বস্তু বা বিষয়ই তার গল্পের শিরোনাম হয়েছে, যেমন 'রস', টর্চ', 'শাল' - ইত্যাদি। এই নামের মধ্যেই তিনি গল্পরসকে ঘন-সংঘবদ্ধ করেছেন।

বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন উত্তেজনাহীন নিরন্তরঙ্গ প্রবাহ যেন তার গল্পের রচনারীতিতে সাকার হয়ে উঠেছে। তার অনেক গল্পের পরিসমাপ্তিতে অনুভূতির একটি সূক্ষ্ম যোচড় পাঠক উপলব্ধি করে। যেমন 'স্রোতস্বতী' 'পার্শ্বচর', 'মহাশ্বেতা' ইত্যাদি গল্পে লেখকের অনুচ্ছসিত, নিরুত্তাপ বর্ণনাভঙ্গি দেখা যায়। জীবন সম্পর্কে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভর গল্পগুলোতে আমরা পেয়ে যাই। 'বাঙালী নিম্নবিত্তের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, হতাশা ও ব্যর্থতার সফল রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র। - তার গল্পের রচনারীতিতে দেখা যায় " গল্পের শেষ হয়ে যাওয়া আর অকথিত অন্তিম অর্থটি হঠাৎ ঝলকিত হয়ে ওঠা, দুই-ই যেখানে একসঙ্গে ঘটে.- সংশয় নেই, প্রশ্ন নেই ব্যাখ্যা নেই, বাক্য নেই, এই আর্টে নরেন্দ্রনাথের সিদ্ধি অবি-সংবাদিত।" [৪২] যেমন 'অনধিকারিনী' গল্পের শেষে গানের আসরে ব্যর্থ হয়ে আসরের বাইরে দাঁড়িয়ে সুলতা তার সঙ্গীত শিক্ষককে ধীরকণ্ঠে বলে - 'ভিতরে আর যেতে পারলাম কই।' - এই উক্তি লেখক অত্যন্ত সংযত শান্ত ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। অথবা 'রস' গল্পে হুঁকোতে মুখ দিয়ে নিরীহভাবে মোতালেফ বলল 'না, যেঞাভাই, নেবে নাই'। আবার এই নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ ভঙ্গীতেই 'জামা' গল্পে লেখক আত্মধিক্কারে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া হতদরিদ্র বস্তিবাসী মুদি-দোকানের কর্মচারী যতীনের মর্মবেদনাকে লেখক তুলে ধরেছেন। আপাতশান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনের এমন সার্থক গল্পকার বাংলাসাহিত্যে খুব কমই এসেছেন।

তথ্যপঞ্জী

১. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আত্মকথা' - আবহমান ভাঙাঁ, সম্পাদক-সাদকামালী, পঙ্কজ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ৪১

২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'অন্যমা', নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয়, ১৩৮৭, পৃ·৫৮৯

৩. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ·২

৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - 'নিঃশব্দ প্রবেশ নিঃশব্দ প্রস্থান : কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র' শিল্প সাহিত্য দেশকাল, ১৯৮১, পৃ·১৭৩

৫. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'অন্য মা', নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, ১৩৮৭, পৃ· ৫৮৯

৬. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আমাদের কথা', ১৯৫১

৭. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আত্মকথা, আবহমান ভাঙাঁ, সম্পাদক সাদকামালী, পঙ্কজ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃ·

৮. তদেব, পৃ·৫৩

৯. তদেব, পৃ·৫৩

১০. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - নিঃশব্দ প্রবেশ : নিঃশব্দ প্রস্থান - কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র - শিল্পসাহিত্য দেশকাল, ১৯৮১, পৃ·১৮৪

১১. তদেব, পৃ·১৭৪

১২. হরপ্রসাদ মিত্র - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প - সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সম্পাদক - সঞ্জীবকুমার বসু - ১৪০০, পৃ·১৩৬

১৩. রণজিৎকুমার সেন - প্রসঙ্গঁ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ সংখ্যা, ৯ম ও ১০ম, ১৯৯৪, পৃ·৪০৭

১৪. শোভনা মিত্র - আমার স্বামী নরেন্দ্রনাথ - আবহমান ভাঙাঁ, পঙ্কজ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৯, সম্পাদক - সাদ কামালী, পৃ·৫৮

১৫. তদেব, পৃ.৬১

১৬. সমরেশ বসু - মৃত্যুহীন বিয়োগ, দেশ ১১ই অক্টোবর, সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, ১৯৭৫, পৃ.৮৪০

১৭. বীরেন্দ্রনাথ মিত্র - পায়ে পায়ে যার গল্প, মাসিক বাংলা দেশ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম ও ১০ম, ১৯৯৪, পৃ.৪৬১

১৮. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য - নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ.১০

১৯. মিহির আচার্য - তিনশূন্য - মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ - ১ম ও ১০ম সংখ্যা, পৃ.৪২০

২০. সমীর মুখোপাধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ১ম ও ১০ম, পৃ.৪১০

২১. সরকার আমিন - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প - আবহমান ভাঙা, সম্পাদক - সাদকামালী, পঞ্চম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯১, পৃ.১৬

২২. আকিমুন রহমান - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দ্বীপপুঞ্জ, আবহমান ভাঙা, সম্পাদক - সাদ কামালী, পঞ্চম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৯১, পৃ.২

২৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - নিঃশব্দ প্রবেশ : নিঃশব্দ প্রস্থান, শিল্প সাহিত্য দেশকাল ১৯৮১ পৃ.১৭১

২৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'আবরণ' - নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা ৩, ১৯৯২, পৃ.৩৩

২৫. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় - দুঃশাসনীয়, আজকাল পরশুর গল্প, মাণিক গ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খন্ড, ১৯৮২, পৃ.২৭১

২৬. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - কুমারী শুক্লা, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা, ৪র্থ খন্ড ১৯৯৪, পৃ.২৬

২৭. সমীর ঘোষ - পঞ্চাশের মন্বন্তর শিল্পে সাহিত্যে, ১৯৯৪, পৃ.৪২

২৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - আবরণ - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ৩য় খন্ড, ১৯৯২, পৃ.৩৩

২৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - বস্ত্র, কাঠ, খড় - কেরোসিন, পৃষ্ঠা ২৩৯, বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা, ১৩৬৩

৩০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - দুঃশাসন - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ.৬০

৩১. কবিতা চন্দ - রস: একটি অনির্বাপিত গল্প - সাহিত্য সংস্কৃতি, শ্রাবণ পৌষ ১৪০০, নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি সংখ্যা, সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু, পৃ.১৭৭

৩২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'জন্মদিন' - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১ম খন্ড, ১৯৮৬, পৃ.৪১৯

৩৩. শোভনা মিত্র - আমার স্বামী নরেন্দ্রনাথ, আবহমান ভাঙা, পঙ্কয় সংখ্যা, ১৩৯৯, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদক - সাদ কামালী, পৃ.৬৮

৩৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'সুদ', সুরসন্ধি, আরতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৭, পৃ.৬৬

৩৫. হরপ্রসাদ মিত্র - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প - সাহিত্য সংস্কৃতি, দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ.১৩৮

৩৬. দিব্যেন্দু পালিত - দেহ মনের বৈতালিক, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃ.২৬৭

৩৭. সুরাবাণ বসু রায় - 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্প' - ভাঙা কাচের শিল্প, সম্পাদক - অর্জুন রায়, পৃ.১৩৩

৩৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'হেডমাষ্টার - গল্পমালা ১ম খন্ড, ১৯৮৬, পৃ.১৪৩

৩৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র - 'নাম', গল্পমালা - ১ম খন্ড, ১৯৮৬, পৃ.৫২

৪০. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত - নরেন্দ্রনাথ মিত্র : আনুষঙ্গিক ভাবনা, মাসিক বাংলাদেশ ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ৯ম ও ১০ম, পৃ.৪০৩

৪১. নারায়ণ চৌধুরী - ছোটগল্প - কথাসাহিত্য, ভাদ্র ১৩৭০, পৃ.৩৬

৪২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, ১৯৯৫, পৃ.৩৮৬

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গ্রন্থপঞ্জি

গল্প সংকলন ও সূচী :

১। অসমতল : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৫২, ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশার্স)
নেতা, চোর, লালবাবু, মদন ভস্ম, রসাভাস, স্পর্শ, আবরণ, সত্যাসত্য, রূপান্তর, পুনশ্চ, চোরাবালি, ফেরিওয়ালা।

২। হলদে বাড়ি : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৫২, অগ্রণী বুক ক্লাব)
যৌথ, শম্বুক, যযাতি, সুখাত, রোগ, মহাশ্বেতা, কুমারী শুক্লা, পুনরুক্তি, হাসপাতাল, সিঁদুর, হলদে বাড়ি, প্রতিদ্বন্দ্বী, মালঞ্চ।

৩। উল্টোরথ : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৩, মিত্র ও ঘোষ)
উল্টো রথ, প্রথম বসন্ত, চাঁদ মিঞা, সংক্রামক, যথাস্থান, পাথরের চোখ, স্ফুলিঙ্গ, সৌরভ, দুর্জয়, সেতার, পটক্ষেপ।

৪। পতাকা : (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৪, পূর্ব্বাশা লিমিটেড)
ক্রৌঞ্চ মিথুন, পদক, নাম, কুলপী বরফ, ঘুষ, পতাকা।

৫। চড়াই-উৎরাই : (তারিখ উল্লেখ নাই, মিত্রালয়)
রস, অবতরণিকা, জৈব, হেডমাস্টার, হেডমিস্ট্রেস, চড়াই-উৎরাই।

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৯, মিত্র ও ঘোষ)
সেতার, দ্বিচারিনী, অনধিকারিনী (বড়গল্প), চোর, যৌথ, মহাশ্বেতা, পুনশ্চ, চাঁদমিঞা, কুলপী বরফ, রস, নাম, হেডমাস্টার, দাম্পত্য।

৭। কাঠগোলাপ : (প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬০, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ)
বেহালা, পালঙ্ক, ডুবন ডাক্তার, টর্চ, কাঠগোলাপ, শুক, ছায়া, এক পো দুধ।

৮। অসবর্ণা : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬১, এম·সি·সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড)
অসবর্ণা (বড়গল্প), পুনর্ভবা (বড় গল্প), দয়িতা (বড়গল্প)

৯। মলাটের রং : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬২, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড)
কন্যা, রানু যদি না হতো, চিঠি, লেখিকা, একস্-রে, পুনশ্চ, আকিঞ্চন, ছাত্রী, মলাটের রং।

১০। দীপান্বিতা : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩, ক্যালকাটা পাবলিশার্স)
স্বাধিকার, সুতপা, ঋণ, জামা, হার, সুহাসিনী তরল আলতা, ঘর, দীপান্বিতা।

১১। রুপালী রেখা : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩, আভেনির)
টেপরেকর্ড, দর্শক, অদ্বিতীয়া, সুপুরুষ, বিভ্রম, টিকেট, প্রতিভু, এপার-ওপার, সন্ধান, চাঁদা, ছবি, ঘড়ি, স্মৃতিগন্ধ, কেরামত।

১২। একুল ওকুল : (প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৬৩, প্রচারিকা)
রাজধানী, সুদর্শন চৌধুরী, সম্ভ্রম, ভক্ত, গহনা, অপঘাত, রাজপুরুষ, একুল ওকুল।

১৩। ওপাশের দরজা : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৩, লিটল পাবলিশার্স)
নতুন প্রেম, দশ টাকার নোট, আলপিন, আবিষ্কার, মিশ্র রাগ, ছোট দিদিমণি, ক্যালেন্ডার, পেশা।

১৪। বসন্ত পঙ্কজ : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, নাভানা)
বসন্ত পঙ্কজ, চিহ্ন, মহড়া, জামাই, গোঁড়ার, যবনিকা।

১৫। উত্তরণ : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৫, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স)
সংস্কারক, সহদেব, মৃত্যু, পণ্ডিতমশাই, পুরোন বাসা, জাল, বাসনা বিপুল, উত্তরণ।

১৬। পূর্বতনী : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৫, গ্রন্থপীঠ)
পূর্বতনী, মর্যাদা, সন্ধান, প্রিয়তম, অপছন্দ, সিগারেট, যৎসামান্য, রত্নাবাঈ।

১৭। অঙ্গীকার : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, রবীন্দ্র লাইব্রেরী)
জয়ন্তী, বিকল্প, অঙ্গীকার, চেক।

১৮। রূপসজ্জা : প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬, নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
রূপসজ্জা, দ্বৈত, দুই লেখক, পাত্রী, পুরাতনী।

১৯। সভাপর্ব : (প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৬৭, ডি·হাজরা এন্ড কোং)
সভাপর্ব, পরিচয় পত্র, দাম্পত্য, একটি চিত্র কাহিনী, পার্শ্বচর, পলাতক, আগামীকাল।

২০। সুরসন্ধি : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৭, আরতি প্রকাশনী)
সুরসন্ধি, রেখা, উপনয়ন, সেই মুখ, দূত, সুদ, গ্রন্থি, যযাতি, ক্যামেরা।

২১। ময়ূরী : (প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
ময়ূরী (বড়গল্প), চিত্রশালা, বাসি বকুল, শাল, বন্দিনী, মালা, অনাহূত, দ্বিরাগমন, কুশাঙ্কুর ঝড়।

২২। বিদ্যুৎলতা : (প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৬৮, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস)
বিদ্যুৎলতা (বড় গল্প), জমি, পরীক্ষা, মরুদ্যান, অভিসার

২৩। পত্রবিলাস : (প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৮, সুরলি প্রকাশনী)
শ্বেতময়ূর(বড়গল্প), দোলা, সহযাত্রিণী, শুভার্থী, সোহাগিনী, পত্রবিলাস (বড় গল্প), জন্মদিন।

২৪। একটি ফুলকে ঘিরে : (প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৯, কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
একটি ফুলকে ঘিরে, খুঁৎ, সম্মোহন, একটি মৃত্যু ও আমি, দুর্গ, সন্ধান।

২৫। যাত্রাপথ : (প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯, মিত্র ও ঘোষ)
যাত্রাপথ (বড় গল্প), যাত্রাশেষ (বড় গল্প)।

২৬। সুধা হালদার ও সম্প্রদায় : (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৯ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স) সুধা হালদার ও সম্প্রদায়, বিলম্বিত লয়, বন্ধুসঙ্গ, ঝরের পরে।

২৭। রূপ লাগি : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭০, ইন্ডিয়ান প্রোগেসিভ পাবলিশিং কোং) রূপলাগি, বন্ধন, বিবেক, পূর্বরাগ, দাতা, অন্য গল্প, ছাতা, মৎসরাজ, পেশা, মালা।

২৮। চিনে কোঠা : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৭১, নূতন সাহিত্য)
চিনে কোঠা, ফিরে লেখা, বোধন, বঞ্চনা, দুর্বল মুহূর্ত, প্রজাপতি, মর্মর মূর্তি।

২৯। প্রজাপতির রং : (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭২ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড)
প্রজাপতির রং (বড় গল্প), মুক্তি-পণ, শিখরে সুখ।

৩০। অন্য নয়ন : (প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭২, এম·সি·সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড)
অন্য নয়ন, অন্য জীবন, অনন্যা।

৩১। বিবাহ বাসর : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড)
বিবাহবাসর (বড় গল্প), জ্বালা, নতুন ভূমিকা।

৩২। চন্দ্রমল্লিকা : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, রবীন্দ্র লাইব্রেরী)
চন্দ্রমল্লিকা, আরোগ্য, ভালোবাসা।

৩৩। সন্ধ্যারাগ : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)
সন্ধ্যারাগ, প্রবাস, হলাদিনী, রূপ, অনুচ্চ, মাঝদরিয়া একটি প্রেমের উপাখ্যান, ভগ্নাংশ, বন্ধ দরজা।

৩৪। সেই পথটুকু : (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭৬, ডি·এম·লাইব্রেরী)
সেই পথটুকু (বড় গল্প), নতুন ভুবন (বড়গল্প)।

৩৫। অনাগত : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড)
অনাগত, অন্যস্বাদ, পুনরাবৃত্তি, অভিসার, দ্বিতীয় অধ্যায়, নিরুদ্দেশ, দুই যোদ্ধা।

৩৬। পালঙ্ক : (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২, জ্যোতি প্রকাশন)
পালঙ্ক, স্রোতস্বতী (বড় গল্প)।

৩৭। উদ্যোগ পর্ব : (প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড)
কোন দেবতাকে, অভিন্ন হৃদয়, হাসি, গণ্ডী, মৃত্যু, আকাঙ্ক্ষা, তৈলচিত্র, অপরাধিনী, বীতশোক, ফিরে দেখা, গৃহকাতর, মাধবীমঞ্জরী(বড়গল্প), উদ্যোগ পর্ব (বড় গল্প)।

৩৮। বর্ণবহ্নি : (প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৮৪, ঈশান)
ঘায়, নাবিক, বর্ণবহ্নি, ভেনাস, বিস্বাদযোগ, মুখোশ, শোক, বীজ, যিনিবাস।

৩৯। মিসেস গ্রীন : (তারিখ উল্লেখ নেই, সিটি বুক এজেন্সী)
মিসেস গ্রীন, অভিনেত্রী, ঠিকানা, অশ্রুকণা, রূপলাগি, প্রতিদান, মুক্তা, অধিকন্তু, সাম্রাজ্য, সীমানার বাইরে।

৪০। মিশ্ররাগ : (দ্বিতীয় মুদ্রণ : তারিখ নেই, মিত্র ও ঘোষ)
সুপ্তকমল, শুভদৃষ্টি, হকার, বন্যা, স্রোতপত্র, পাণ্ডুলিপি, গোঁফ, পরীক্ষা, শেলি।

৪১। বিকালের আলো : (প্রথম প্রকাশ : ১৩৯০, শোভনা মিত্র)
লোকশিল্পী, শিকড়, ফটো, ফলশয্যা, ছদ্মবেশ, বাসিফুলের মালা, শোক, বিষাদযোগ, বন্ধন, মুখোস, ঘটক, বিকালের আলো।

৪২। কিশোর গল্পসমগ্র : (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)

শোক, অনাথের কীর্তিকলাপ, গুপ্তচর, ময়ূরশঙ্খী, নষ্টচন্দ্র, কুশল, হারান মাস্টার, পলায়ন পর্ব, বাটি চালান, হাল খাতা, কানা বসিরের ঘোড়া, ঘড়ি, মধুচক্র, নাম, পাশা, কুমির থিয়েটার, মোহন বাঁশি, তিলকুচরিত, প্রথম প্রবাস, মনু-কারিনী, বিয়ে বাড়ি।

যে সব গল্প পত্র পত্রিকায় পাওয়া গেছে

(কিছু কিছু গল্প গ্রন্থে সংকলিত এবং কিছু অগ্রন্থিত)

১. মৃত্যু ও জীবন : দেশ, ২০শে ভাদ্র ১৩৪৩
২. লক্ষ্মী : প্রবাসী, ১৩৪৪
৩. রসিক দাস : পরিচয়, ১৩৪৫
৪. পরীক্ষা : প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬
৫. সংসার : আনন্দ বাজার, ১৩৪৬
৬. অসুখ : আনন্দ বাজার, ১৩৪৬
৭. অতীত : দেশ, ১৩৪৬
৮. প্রতিষ্ঠা : দেশ, ১৩৪৭
৯. জটিল : আনন্দবাজার, ১৩৪৭
১০. শম্বুক(হলদেবাড়ি) : আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা ১৩৪৯
১১. কুমারসম্ভব : দেশ, ১৩৪৯
১২. পরাজয় : নবযুগ, ১৩৪৯
১৩. কুমারী শুক্লা (হলদে বাড়ি) : দেশ, পূজাসংখ্যা ১৩৪৯
১৪. যৌথ (হলদে বাড়ি) : আনন্দ বাজার, ২৯ পৌষ ১৩৪৯
১৫. দারাপুত্র : দেশ, ১৩৫০
১৬. সীমানা : যুগান্তর, ১৩৫০
১৭. রোগ (হলদে বাড়ি) : আনন্দ বাজার, ১৮ বৈশাখ ১৩৫০
১৮. হাসপাতাল : ভৈরব, ভাদ্র ১৩৫০
১৯. পুনশ্চ (অসমতল) : অরণি, পূজা সংখ্যা ১৩৫০
২০. হলদে বাড়ি (হলদে বাড়ি) — : যুগান্তর, পূজা সংখ্যা ১৩৫০
২১. সৌরভ (উলটো রথ) : অভিযোগ, পূজা সংখ্যা ১৩৫০
২২. প্রতিদ্বন্দ্বী (হলদে বাড়ি) : বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৫০

২৩. মহাশ্বেতা (হলদে বাড়ি) : অলকা, মাঘ ১৩৫০
২৪. দুর্জয় (উলটো রথ) : অলকা, শ্রাবণ ১৩৫১
২৫. নেতা (অসমতল) : অরণি, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫১
২৬. রূপান্তর (অসমতল) : বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৫১
২৭. লালবানু (অসমতল) : কৃষক, ঈদসংখ্যা ১৩৫১
২৮. পুনরুক্তি (হলদে বাড়ি) : ছোটগল্প, অগ্রহায়ণ ১৩৫১
২৯. সত্যাসত্য (অসমতল) : দেশ, পৌষ ১৩৫১
৩০. সুখাত (হলদে বাড়ি) : অলকা, পৌষ ১৩৫১
৩১. চোর (অসমতল) : বসুমতী, মাঘ ১৩৫১
৩২. রসাভাস । বিষম্বর(অসমতল) : বসুমতী, নববর্ষ সংখ্যা ১৩৫২
৩৩. স্পর্শ (অসমতল) : সোনার বাংলা, আষাঢ় ১৩৫২
৩৪. আবরণ (অসমতল) : অরণি, আষাঢ় ১৩৫২
৩৫. সেতার (উল্টো রথ) : বসুমতী, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫২
৩৬. উল্টো রথ (উল্টো রথ) : বসুমতী, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫২
৩৭. প্রথম বসন্ত (উল্টো রথ) : অরণি, পূজা সংখ্যা, ১৩৫২
৩৮. সংক্রামক (উল্টো রথ) : অলকা, ভাদ্র ১৩৫২
৩৯. যথাস্থান (উল্টো রথ) : পরিচয়, আশ্বিন ১৩৫২
৪০. পাথরের চোখ (উল্টো রথ) : নতুন জীবন, পূজা সংখ্যা, ১৩৫২
৪১. স্ফুলিঙ্গ (উল্টো রথ) : আবাহন, আশ্বিন ১৩৫২
৪২. পটক্ষেপ (উল্টো রথ) : আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা ১৩৫২
৪৩. চাঁদ মিঞা (উল্টো রথ) : দিগন্ত বৈশাখ, ১৩৫৩
৪৪. নাম (পতাকা) : দীপায়ন, শ্রাবণ ১৩৫৩
৪৫. মালঞ্চ (হলদে বাড়ি) : সম্ভবত 'হাসপাতাল' নামে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ১৩৫৩

৪৬. কুলপী বরফ (পত্যকা) : লেখন, ১৩৫৩
৪৭. ত্রৈকথিথুন (পত্যকা) : অলকা, বৈশাখ ১৩৫৪
৪৮. ঘুষ(পত্যকা) : পূর্বাশা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪
৪৯. রস (চড়াই-উৎরাই) : চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৫৪
৫০. পদক (পত্যকা) : স্বরাজ, ১৩৫৪
৫১. ত্রৈব (চড়াই-উৎরাই) : চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৫৫
৫২. ফেরিওয়ালা (অসমতল) : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৬
৫৩. বিদ্যুৎলতা বিজয়িনী (বিদ্যুৎলতা) : ইদানীং, পূজা সংখ্যা ১৩৫৬
৫৪. দ্বিচারিনী (নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প) : সত্যযুগ, পূজাসংখ্যা ১৩৫৬
৫৫. অবতরণিকা (চড়াই-উৎরাই) : আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা ১৩৫৬
৫৬. হেডমাস্টার (চড়াই-উৎরাই) : দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৬
৫৭. শূক(কাঠগোলাপ) : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৭
৫৮. হেডমিস্ট্রেস (চড়াই-উৎরাই) : দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৭
৫৯. জমি(বিদ্যুৎলতা) : চতুষ্কোণ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৮
৬০. অনধিকারিনী (নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প) : আনন্দবাজার, দোল সংখ্যা, ১৩৫৮
৬১. দুঃখের বই : কথাসাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩৫৮
৬২. পালঙক (পালঙক) : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৫৯
৬৩. চিঠি (মলাটের রং) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬০
৬৪. কন্যা (মলাটের রং) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬১
৬৫. সাম্রাজ্য (মিসেস গ্রীন) : গল্প ভারতী, শারদীয়া ১৩৬৩
৬৬. সমব্যথী : : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৩
৬৭. হরিচরণ : পরিচয়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৪
৬৮. মোহাগিনী তুফানী (পত্র বিলাস) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৪
৬৯. মরুদ্যান (ওয়েসিস) : ভারতবর্ষ, ১৩৬৪

৭০. শুভার্থী (পত্রবিলাস) : দেশ, সাপ্তাহিক ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

৭১. দোলা (পত্রবিলাস) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৫

৭২. পত্রবিলাস (পত্রবিলাস) : আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৬৫

৭৩. বনভোজন : দেশ, সাপ্তাহিক ১৩৬৬
(১১ই এপ্রিল, ১৯৫৯)

৭৪. ময়ূরী (ময়ূরী) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৬

৭৫. পরীক্ষা : মানসী, ১৩৬৭

৭৬. বন্দিনী (ময়ূরী) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৭

৭৭. শ্বেতময়ূর (পত্রবিলাস) : আনন্দবাজার, পূজাসংখ্যা ১৩৬৭

৭৮. মিসেস গ্রীন (মিসেস গ্রীন) : পরিচয়, শারদীয়া ১৩৬৭

৭৯. অভিসার : বসুধারা, ১৩৬৭

৮০. সহযাত্রিণী (পত্রবিলাস) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৮

৮১. বিবেক (রূপলাগি) : দেশ, সাপ্তাহিক ২ই অগ্রহায়ন ১৩৬৮

৮২. বোধন (চিলেকোঠা) : দেশ, শারদীয়া ১৩৬৯

৮৩. দুর্বল মুহূর্ত (চিলে কোঠা) : দিগন্ত বৈশাখ ১৩৭০

৮৪. চিলে কোঠা (চিলে কোঠা) : আনন্দবাজার, দোল সংখ্যা ১৩৭০

৮৫. হলাদিনী (সন্ধ্যারাগ) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭০

৮৬. একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান : আনন্দবাজার, দোলসংখ্যা ১৩৭১
(একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান)

৮৭. দীপশিখা : দেশ, শারদীয়া ১৩৭১

৮৮. নায়িক (বর্ণবহ্নি) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭২

৮৯. ভালোবাসা (চন্দ্রমল্লিকা) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭৩

৯০. আরোগ্য (চন্দ্রমল্লিকা) : দেশ, শারদীয়া ১৩৭৩

৯১ . সন্ধ্যারাগ (সন্ধ্যারাগ)	: দেশ, ভাদ্র ১৩৭৪
৯২ . ভেনাস (বর্ণবহ্নি)	: আনন্দবাজার, রবিবাসরীয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫
৯৩ . অপঘাত (একূল-ওকূল)	: আনন্দবাজার, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৫
৯৪ . পুষ্পবিলাস	: কথাসাহিত্য, শারদীয়া কার্তিক ১৩৭৫
৯৫ . অভিসার (অনাগত)	: দেশ, শারদীয়া ১৩৭৬
৯৬ . দ্বন্দ্ব :	: বসুমতী সাপ্তাহিক, শারদীয়া ১৩৭৭
৯৭ . দ্বিতীয় অধ্যায় (অনাগত)	: আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৭৭
৯৮ . কাঁটাতার	: দেশ, সাপ্তাহিক ১৩ই চৈত্র ১৩৭৭
৯৯ . বন্ধন	: আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৭৮
১০০ . একাদশী	: কথাসাহিত্য, প্রথম সংখ্যা কার্তিক ১৩৭৮
১০১ . শোক (বর্ণবহ্নি)	: দেশ, সাপ্তাহিক ৬ই ফাল্গুন ১৩৭৮
১০২ . স্মারক	: আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৭৯
১০৩ . একটি প্রেমের গল্প	: দেশ, শারদীয়া ১৩৭৯
১০৪ . আকাঙক্ষা	: দেশ, শারদীয়া ১৩৮০
১০৫ . বীতশোক (উদ্যোগ পর্ব)	: দেশ, সাপ্তাহিক ২৮শে আষাঢ় ১৩৮১
১০৬ . ফিরে দেখা	: আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৮১
১০৭ . কোন দেবতাকে (উদ্যোগ পর্ব)	: দেশ, শারদীয়া ১৩৮২
১০৮ . অভিন্ন হৃদয় (উদ্যোগ পর্ব)	: আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৮২
১০৯ . ইন্দ্রধনু	: উল্টোরথ, নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা বৈশাখ ১৮৮৯

উপন্যাস ও বড়গল্প -

১. দ্বীপপুঞ্জ (হরিবংশ) : (দেশ, কার্তিক - ফাল্গুন ১৩৪১)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৩, পুস্তকালয়

২. রূপমঞ্জরী (বহুবচন) : (দেশ, আষাঢ় ১৩৫৩-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭, সাহিত্য প্রকাশন

৩. অক্ষরে অক্ষরে : (সোনার তরী, আশ্বিন ১৩৫৫)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬, দিগন্ত পাবলিশার্স

৪. দূরভাষিণী (অকথিতা) : (গণবার্তা, ১৩৫৭-৫৮)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড

৫. গোধূলি : (সত্যযুগ, শ্রাবণ ১৩৫৭)
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬০, বেঙ্গল পাবলিশার্স

৬. চেনামহল : (দেশ, ১৩৫৭-৫৮)
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬০, ক্যালকাটা বুক ক্লাব

৭. সঙ্গিনী : (দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৮)
প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬০ বেঙ্গল পাবলিশার্স

৮. দেহমন : প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫৯, বেঙ্গল-পাবলিশার্স

৯. অনুরাগিনী : (জনসেবক, পূজাসংখ্যা ১৩৬২)
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৩, প্রকাশনীর উল্লেখ নেই

১০. সহৃদয়া : প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৩, ডি.এম.লাইব্রেরী

১১. শুক্লপক্ষ : প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৪, ডি.এম.লাইব্রেরী

১২. সুখ দুঃখের ঢেউ : প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৩. কথা কও : প্রথম প্রকাশ : ১লা আষাঢ় ১৩৬৬, বিংশশতাব্দী প্রকাশনী

১৪. উত্তর পুরুষ : প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, ডি.এম.লাইব্রেরী

১৫. একটি নায়িকার উপাখ্যান : প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭, ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১৬. উপনগর : প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৮, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৭. পরম্পরা : প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৯, গ্রন্থ প্রকাশ

১৮. তমস্বিনী (চিত্রলেখা) : (শারদীয়া কোন একটি সাময়িক পত্র ১৩৭০) প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৭১, সুরভি প্রকাশনী

১৯. পতনে উত্থানে : প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭১, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

২০. সেতুবন্ধন : প্রথম প্রকাশ : ১৩৭১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২১. দ্বৈতসঙ্গীত : প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১, মিত্র ও ঘোষ

২২. কন্যাকুমারী : প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৭২, বীরেন নাগ।

২৩. সূর্যসাক্ষী : (দেশ, ১৩৭১-৭২) প্রথম প্রকাশ : ১৩৭২ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

২৪. উপচ্ছায়া : প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭৩, মিত্র ও ঘোষ

২৫. দ্বন্দ্ব : শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৩৭৭

২৬. সুরের বাঁধনে : প্রথম প্রকাশ : ৩০শে শ্রাবণ ১৩৭৮, মিত্র ও ঘোষ

২৭. জল মাটির গন্ধ : প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

২৮. মহানগর : প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১, গ্রন্থ প্রকাশ

২৯. জলপ্রপাত : প্রথম প্রকাশ : ৭ই ফাল্গুন ১৩৮১, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৩০. দ্বিধা : উল্টোরথ, মাঘ ১৮৮১

৩১. হারানো মণি হারানো মন : তারিখ উল্লেখ নেই, কারেন্ট বুক সপ

৩২. তিনদিন তিনরাত্রি : দ্বিতীয় সংস্করণ : তারিখ উল্লেখ নেই, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩. অনমিতা : তারিখ উল্লেখ নেই, মিত্র ও ঘোষ

৩৪. মুখ প্রহর : দ্বিতীয় মুদ্রণ : তারিখ উল্লেখ নেই, গ্রন্থ প্রকাশ

৩৫. তৃষ্ণা : প্রথম প্রকাশ : ৭ই শ্রাবণ ১৩৯০, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৩৬. চোরাবালি : প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৯৩, অন্বেষা

অন্যান্য রচনা -

১. আত্মকথা : (দেশ, ১৩৮২) নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খন্ড, বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

২. গল্প লেখার গল্প : (বেতার জগত) নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ১ম খন্ড, বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ন ১৩৮৭, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৩. পিছে ফিরে দেখা : নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খন্ড
বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭,
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪. অন্য যা : ঐ

৫. বাবা : ঐ

৬. চাকলাদার : নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী ২য় খন্ড
বিশেষ সংস্করণ : ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৭. স্মৃতি : পরিচয় ২৬ বর্ষ ।। পৌষ ১৩৬৩ ।। ৪র্থ সংখ্যা

৮. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : কার্তিক, ১৮৭৯, ১৩৬৪, ৩রা ডিসেম্বর পরিচয়
-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'মাণিক স্মৃতি বর্ষ'
সভায় পঠিত।

কবিতা -

১. মুক : দেশ, ১৯৩৬ ১৬ই শ্রাবণ (১৩৪৩) প্রথম কবিতা

২. জোনাকি : (কানে কানে, প্রিয়া প্রশস্তি, স্মরণ, বিকাল,
বরষা, প্রশ্ন, আনমনা, ভাষা) প্রথম প্রকাশ :
চৈত্র ১৩৪৫, শ্রী সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এবং
শ্রী পরেশ মুখোপাধ্যায়

৩. নিরিবিলি : প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩, ক্যালকাটা বুক ক্লাব

পঞ্চম অধ্যায়

তিনশিল্পীর তুলনা : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভূমিকা :

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অভিনব শাখা ছোট গল্পেরও ক্রমশ পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সমাজের দ্রুত পরিবর্তন। শিল্পীদের জীবন দর্শন ও উপলব্ধির ভিন্নতা এবং রচনা কৌশলের নতুন-নতুন পরীক্ষা। এরই ভিত্তিতে আলোচ্য সমকালীন তিন শিল্পীর ছোট গল্পগুলির তুলনা করা যেতে পারে। এই তুলনা করা যায় - তিন শিল্পীর জীবন সম্পর্কে, গল্পের বিষয়গত দিক থেকে, ভাষাগত দিকে এবং আঙ্গিকগত দিকে।

তুলনা : (১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্মের তারিখ হিসেব করলে দেখা যায়, এরা তিনজনেই প্রায় কাছাকাছি সময়ের মানুষ। এই তিন গল্পকারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, তাঁর জন্ম ১৯১২ সালে। কমলকুমারের ১৯১৪ সালে এবং নরেন্দ্র-নাথের ১৯১৭ সালে জন্ম। এই গল্পকারেরা একটি বিশেষ সময়ের মানুষ, যে সময়ে সমাজ জীবন চরম অর্থনৈতিক সংকটে, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপর্যস্ত। কাজেই এদের গল্পে সমাজের এই সমস্যার কথা পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত হয়েছে। তিন গল্পকারই স্বভাবের দিক থেকে ছিলেন কবি। জ্যোতিরিন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে। তাই এই দুই শিল্পীর গল্পে প্রকৃতি তার অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবন গ্রামাঞ্চলে কাটিয়ে পরবর্তী সময়ে বা যৌবনে এসেছেন কলকাতায়। এই শহরের জীবনে দুই শিল্পীই প্রথমে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য খুব একটা পাননি। এবং একই কাজে জীবিকার ক্ষেত্রে কখনোই স্থির থাকেননি। জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে জীবিকার জন্য কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা অনেক বেশি ছিল নরেন্দ্রনাথের থেকেও। কর্মক্ষেত্রে এই অস্থিরতা কমলকুমারের মধ্যেও ছিল। কমলকুমারের পিতার একটি বাড়ি ছিল সাঁওতাল পরগণার রিখিয়ায়, যেখানে অবসর সময় কাটাতে তারা আসতেন। তাছাড়া কলকাতাতে রাসবিহারী

এ্যাভিনিউয়ে বাড়ি ছিল। কিন্তু গ্রামের প্রতি তার আকর্ষণ প্রবল ছিল, সেটা বোঝা যায় একটি ঘটনায়, বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়া কলকাতায় 'দি রিভার' ছবি করার কাজে এলে কমলকুমার তাঁকে বলেছিলেন রিষিয়ায় যাবার কথা, কারণ সেখানে রয়েছে "Plenty of sun, plenty of rain and innumerable silence'[১]. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বভাবের দিক থেকে উভয়েই ছিলেন একচোরা ধরনের মানুষ, বলা যায় লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু কমলকুমার খুব সহজেই যে কোন পরিবেশে আড্ডা জমিয়ে নিতে পারতেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দুজনেই পূর্ববাংলায় কৈশোর কাটিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পে বারে বারেই পূর্ববাংলার স্মৃতি, সেই গ্রামের পথ-ঘাট, মানুষ তাদের মুখের ভাষাকে নিয়ে উঠে এসেছে। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা পিছন ফিরে দেখার প্রবণতা ছিল। পুরনো ঐতিহ্য ও ধারার ভাঙনে একটা বেদনাবোধ তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যে এই পিছন ফিরে দেখার প্রবণতা একেবারে নেই বললেই চলে। পারিবারিক জীবনে কমলকুমার খুব একটা সুস্থির মধ্যে ছিলেন না। দাম্পত্য জীবনের এই দ্বিধার কথা তিনি তার ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে নরেন্দ্র-নাথ দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন বলা চলে। স্ত্রীর প্রতি তিনি যে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন তার পরিচয় মেলে স্ত্রীর প্রতি বিভিন্ন 'প্রণয় পত্রাবলী'[২] থেকে। এই সব পত্রে স্ত্রী শোভনা দেবীকে তিনি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করেছেন। নরেন্দ্রনাথের জীবনকে ঘিরে ছিল এক শান্ত স্নিগ্ধ বাতাবরণ। কমলকুমারের জীবনে ছিল দ্বিধা দ্বন্দ্ব, আর তার ফলেই তিনি সমগ্র জীবন একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকেছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিতেই এক ধরণের স্নিগ্ধতাকে উপলব্ধি করা যায়, যেটা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আহরিত ছিল। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও কোন পেশায় নির্দিষ্ট ভাবে নিযুক্ত থাকতে পারেননি। মূলতঃ সাহিত্য রচনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ অস্থিরতা তার ভেতরে কাজ করতো। এক অস্থির সময়ের মানুষ তিনজন। উনিশ শতকের স্থিতিশীলতা ভেঙে গেছে, জমির নিস্বত্বভোগ, চাকরির নিশ্চিন্ততা নেই, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক অস্থিরতা অপরদিকে মধ্যবিত্তকে বিপর্যস্ত করছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র - এই তিন শিল্পীই জীবনের কিছু সময় গ্রামে এবং জীবনের শেষ সময়ে শহরে অর্থাৎ কলকাতায় কাটিয়েছেন। তাই তিনজনের গল্পেই গ্রাম এবং শহরের চিত্র পাওয়া যায়। যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নদী ও নারী' গল্পে গ্রামের চিত্র রয়েছে - "সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ। পরিষ্কার স্বচ্ছ শঙ্খপটের মাঝখানদিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ গেছে যাবার। এখানে ওখানে দুটি একটি নারকেল গাছ।" 'বনের রাজা' গল্পেও এরকম গ্রাম্য চিত্র পাই। আবার শহরের চিত্র রয়েছে বিভিন্ন গল্পে যেমন 'সামনে চামেলি' গল্পে - "পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে আর তখুনি রাস্তায় বাড়িতে নিওন ফ্লোরেসেন্ট আলো দপদপ জ্বলে ওঠে। যেজন্য হঠাৎ কেমন কিম্ভূতকিমাকার মনে হতে থাকে শহরটা। কিন্তু সেদিনকার রাস্তাটা ভারি সুন্দর ছিল। ধুঁটির মাথায় মাথায় নীলাভ রুপালি আলো, গাছে গাছে অজস্র ফুল তার ওপর গাঢ় নির্জনতা। অথচ দুপাশে সারি সারি বাড়ি। গ্রীল দেওয়া চমৎকার সব ব্যালকনি। কিন্তু কেমন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকার মতন অবস্থা।" [৪] আবার কমলকুমারের 'জল' গল্পে - 'তারা দুজন ভেড়ির উপরে উঠল, হরগজার গাছের ঝোপের মধ্যে নন্দর ছোট জেলে নৌকো খানা বাঁধা ছিল, কাদা ভেঙে তারা উঠল।' [৫] - এই গ্রাম্যচিত্র রয়েছে, কমলকুমারের গল্পে গ্রাম্যচিত্র রাঢ় অঞ্চল অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আবার শহরের চিত্র রয়েছে যেমন 'মল্লিকাবাহার' গল্পে - "অ্যাবহার্স্ট স্ট্রীটের রাস্তা, ছোট পার্কটা অনেক ভীড়, কাঠে কোঁদা ছবি এযত।" [৬] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ও কমলকুমারের শহরের চিত্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শহরের মধ্যেও প্রকৃতির রঙ, গন্ধের, আস্বাদ পেতে চেয়েছেন। শহরের ইট, কাঠ পাথরের ভীড়ে কুয়োতলার একটুখানি সবুজ নরম ঘাসের স্পর্শ তিনি অনুভব করেছেন। কিন্তু কমলকুমার শহরকে শহরের মতো করেই দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পে গ্রামের চিত্র এসেছে পূর্ববঙ্গকে নির্ভর করে - "সন্ধ্যার একটু আগে কালু ধলাকর্তার

কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে গেল। পাশের গায়ে মোল্লাদের বাড়িতে শখের থিয়েটার হবে। পালার নাম 'মীরকাশেম'। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোক আসবে। ... রাত বাড়তে লাগল, অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল, সমস্ত গ্রাম নিঝুম হয়ে এল।" [৭]

আর শহরের ছবি কলকাতাকে ঘিরেই রয়েছে, যেমন 'ফেরিওয়ালা' গল্পে "সদর রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালা শহরতলীর সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুই দিকে সারে সারে বাড়ি। ছাদে, রেলিঙে নানা রঙের শাড়ি শুকাচ্ছে, স্তব্ধ দুপুর।" [৮] শৈশবে চিত্রশিল্পের সঙ্গে এই তিন শিল্পীরই পরিচয় ঘটে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং নরেন্দ্রনাথ উভয়েই সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটালেও এই শিল্পকে জীবনের অন্য কোন কাজে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু কমলকুমার দীর্ঘদিন যাবৎ চিত্রকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন এর প্রভাব পড়েছে, তেমনি অন্যান্য কাজেও এই শিল্পের তিনি চর্চা করে গেছেন। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে এই চিত্রময়তা লক্ষ্য করা যায়। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'ঘরে বাইরে'র চলচিত্র রূপায়নের কথা ছিল, এই সময় কমলকুমার অনেক স্কেচ করেছিলেন যেগুলির[৯] একটাও সত্যজিৎ রায়ের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও দেখতে পাননি। এছাড়াও এক সময় কমল-কুমার উড্‌কাটিং-এর প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ দলের সঙ্গে কিছু দিন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং জেলে বন্দী হন। কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পাবার পর পরবর্তী জীবনে রাজনীতির সঙ্গে কোন রকম সংযোগ রাখেননি। নরেন্দ্রনাথ জীবনের কোন সময়েই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, এবং এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তাও করেননি। কমলকুমার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতা এবং মন্বন্তরের যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তিনি জীবনে ভুলতে পারেন নি। কমল-কুমার জীবনের একটা সময়ে অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটান, আবার জীবনের শেষ প্রান্তে অর্থকষ্টের মধ্যেও কাটিয়েছেন, জীবনের দুটো চরম দিকেই তার অভিজ্ঞতা ছিল গভীর। যেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছিল না।

(২)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র খুব কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহন করেছিলেন। এই তিনজনেই একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এই সময় হল যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই এই তিন শিল্পীর রচনায় যেমন বিষয়গত মিল দেখা যায়। আবার বৈসাদৃশ্যও প্রত্যক্ষ করা যায়। শিল্পীদের রচনার গুনে গল্পগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের সংকটময় জীবনের কথা রয়েছে। যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'তারিনীর বাড়ি বদল' গল্পে দেখা যায় জীবনের শেষ শ্বাসটুকুকেও অবলম্বন করে তারিনী বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা সে পারল না। জীবন সংগ্রামে ভাঙাচোরা সামগ্রী নিয়ে সে অসহায় ভাবেই ফুরিয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথের 'দশটাকার নোট' বা 'টিকেট' গল্পেও রয়েছে মানুষের দারিদ্রজনিত অসহায়তার কথা। কমলকুমারের গল্পে মধ্যবিত্তের সংকট সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। নরেন্দ্রনাথের গল্পে যুদ্ধ একটা বড় স্থান জুড়ে রয়েছে কিন্তু সরাসরি পটভূমি রচনা করেছে খুব কম গল্পে। যেমন 'পালঙ্ক', 'পুনশ্চ', 'রসাভাস' ইত্যাদি গল্পে এই আবহাওয়াকে উপলব্ধি করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যুদ্ধের প্রসঙ্গ সেভাবে নেই। নরেন্দ্রনাথের 'কাঠগোলাপ' গল্পে যেমন রয়েছে - "আজই না হয় পাকিস্তান, আজই না হয় কপাল পুড়েছে পোড়া দেশের।' অথবা - অনিমা প্রায়ই বলে "ভাগ্যে পাকিস্তানের হাঙ্গামা হ'ল দেশে হিড়িক লাগল গ্রাম ছাড়বার ..." কমলকুমারের 'নিমঅন্নপূর্ণা' এবং 'খেলার প্রতিভা'-এ দুটো গল্পেই যুদ্ধের ফলস্বরূপ যে ভয়াবহ মন্বন্তর ঘটেছিল, তার প্রসঙ্গ রয়েছে। যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে যে অর্থনৈতিক চাপ পড়েছিল এবং তার ফলে মানুষের চিন্তা ভাবনা, মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটছে তা এই তিন শিল্পীর গল্পেই লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'রাক্ষসী' গল্পে নিমকি নামের

মেয়েটি অর্থউপার্জনের তাগিদে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে রাক্ষসী হয়ে যায়। সেভাবে এই টাকা কীভাবে সে উপার্জন করল পরিবারের কেউ তা জিজ্ঞেস করলনা। 'টাকা পেয়ে খুশি হয়ে বাবা আর পিসি কি তাকে সত্যিকারের একটা রাক্ষসী বানিয়ে দিচ্ছে না। চিন্তা করে নিমকি অসহায় চোখে অন্ধকার শিলিংটা দেখতে লাগল।'[১০] অথবা 'বন্ধুপত্নী' গল্পে সুবিনয়ের দারিদ্রক্লিষ্ট সংসার চালাতে অরুণা সুধাংশুকে রাতের অন্ধকারেপ্রশ্রয় দেয় এবং ধীর ঠান্ডা গলায় বলে 'এ মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করতে হবে ...'[১১] এই অসহায়তা নরেন্দ্রনাথের গল্পে রয়েছে ভিন্ন ভাবে। যেমন 'চোরাবালি' গল্পে কন্যা রাণুর প্রতি গৌরাঙ্গের অশ্লীল ব্যবহার দেখেও পিতা অনাদি তা মেনে নেয়। নরেন্দ্রনাথ এই সমাজকেই দেখে-ছিলেন সবচেয়ে বেশী।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবন যখন শুরু করেছিলেন তখন থেকেই সমাজে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা বা নারীদের অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা - এই সমস্যা মধ্যবিত্ত পরিবারে দেখা দিয়েছিল, এর প্রভাব নরেন্দ্রনাথের গল্পে পড়েছে, এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষেরা যে নারীর এই প্রচেষ্টাকে খুব সহজে মেনে নেয়নি সে প্রসঙ্গও তার গল্পগুলিতে রয়েছে - যেমন 'সেতার', 'অবতরনিকা' ইত্যাদি গল্পে সংসারের প্রয়োজনেই মেয়েরা নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরীর চেষ্টা করে, কিন্তু পরিবারের পুরুষেরা এটা সহজে মেনে নেয়না। 'অবতরণিকা' গল্পে সুব্রত রূঢ় কণ্ঠে আরতিকে বলে -

> ... আগে জবাব দাও আমার কথার। আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন অফিসে গেলে, আজ ? ... যে অফিসের কাজে রাত আটটা অবধি তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, বাড়ির কারো সুবিধা -অসুবিধা অসুখ বিসুখ পর্যন্ত দেখা চলে না, তেমন অফিস তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না আমি।[১২]

এই ধরনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমার তাদের গল্প রচনা করেন নি - যদিও এই সমস্যাটি তাদের চারপাশে বাস করা মানুষদেরই একটি প্রধান সমস্যা হয়ে তখন দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও সুমনোনীত পাত্রকে বিবাহ করা বা বিধবা বিবাহ করা, যেভাবে নরেন্দ্রনাথের গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমারের গল্পে সেটা দেখা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খাদক' গল্পে স্ত্রীর চাকরী করার বাসনা কোনভাবেই প্রশ্রয় না দেবার সামান্য উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু গল্পে এ বিষয়টিই প্রধান হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ নরেন্দ্র নাথের গল্পে সমাজ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবিম্বিত। অন্য দুজনের কাছে শিল্পই প্রধান, সমাজ না এলে নয়, তাই ব্যবহৃত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে নরনারীর প্রেম ভালোবাসা। কমলকুমারের গল্পে নির্মল প্রেমের কাহিনী নেই বললেই চলে। প্রেম সেখানে ভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন রূপে এসেছে। নরেন্দ্রনাথের নর-নারীর প্রেম যেহেতু মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে, তাই প্রেমের ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত মানসিকতা অর্থাৎ দ্বিধা, সংশয়, ভয় ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রেমের চেয়ে প্রেমহীনতার গল্পই অধিক রচনা করেছেন। তার গল্পে নর-নারীর প্রেম সর্বদাই যৌন আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে যার পরিণামও হয়েছে ভয়ংকর যেমন 'পতঙ্গ' গল্পে পলাশ এই শারীরিক প্রেমের তীব্র আকর্ষণে অবশেষে হত্যাকারী হয়ে ওঠে। অথবা 'সমুদ্র' গল্পেও স্বামী স্ত্রীর ভালবাসায় হত্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। কমলকুমারের 'গোলাপসুন্দরী' গল্পে অবশ্য বিলাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ভালবাসাকে অবলম্বন করে কিন্তু কমলকুমারের এ গল্পে ভালোবাসার চেয়েও মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক ভাবনাই বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম গল্প 'লালজুতো'তে কিশোর প্রেমের প্রসঙ্গ থাকলেও বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে বিচিত্র মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে দেখাতে চেয়েছেন।

এই তিন গল্পকারের গল্পে যৌনচেতনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এসেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌন চেতনা নিছক যৌনতা হিসেবে নেই, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যেমন 'পিরপিটি' গল্পে মায়া আর বৃদ্ধভূবনের মধ্যে যে আকর্ষণ অথবা 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে বৃদ্ধ কুলদারঞ্জনের সঙ্গে প্রতিবেশিনীর সম্পর্ক। কমলকুমারের গল্পে এই যৌনতা এসেছে অভিনব ভাবে। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'মল্লিকাবাহার' - এ দেখা যায় জীবনে প্রত্যাখ্যাত দুই নারী পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করে নারী পুরুষের মতো, এখানে তিনি স্পষ্টত'ই নারীতে নারীতে সমকামীতার ছবি এঁকেছেন - 'না', দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধ হয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি —'
'বউ'
শুনে শোভনা আবেগে চুম্বন করলে। শোভনার মুখসৃত লালা মল্লিকার গালে লাগল।"[১৩]

- এ ছবি শুধু অভিনবই নয় দুঃসাহসিক পদক্ষেপও বলা যায়। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কিছুটা আভাস রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সোনার চাঁদ' গল্পে। কমলকুমারের পূর্বে এভাবে বাংলা সাহিত্যে যৌন বিষয়ে কেউ বলেন নি। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌনতা বিষাদে আবৃত হয়ে গেছে। তাঁর রচনায় যৌনতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কিন্তু কখনোই তা বাঁধ ভাঙা পরিণতি লাভ করেনি। নরেন্দ্রনাথের মধ্যবিত্ত রুচিবোধ ও সীমাবদ্ধতা এই সব বিষয়কে চিন্তার বৃত্তে আনতেই দেয়নি। নরেন্দ্রনাথের কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে কিশোরী বা তরুণীর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ পুরুষের আকর্ষণের কথা যেমন [illegible], 'ছাত্রী' ইত্যাদি। কিন্তু কখনোই নরেন্দ্রনাথ এই ধরনের সম্পর্ককে সমর্থন করেন নি। রচনাভঙ্গি থেকেই তাঁর অসমর্থন স্পষ্ট হয়ে যায়। কমল কুমারের গল্পে অবশ্য এ ধরনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। এই ধরনের আকর্ষনের উল্লেখ রয়েছে আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মঙ্গলগ্রহ' বা 'পিরপিটি' ইত্যাদি গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমারের রচনায় নারী-পুরুষের

সম্পর্কের মধ্যে জৈবিকতার দিকটি স্পষ্ট। উচিত-অনুচিতের কথা নয়, কী হয় তার কথা-ই এঁরা বলতে চেয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পে রূপ সচেতনতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষার ছাপ আছে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমারের তুলনায় তাঁর লেখায় সেই সম্পর্কের মানসিকতার দিকটি অনেক বেশী। শুধু মাত্র শারিরীকতায় তিনি কোন সম্পর্ককে আবদ্ধ রাখেন না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনায় এবং কমলকুমারের রচনায় নর-নারীর যে সম্পর্ক তা আমাদের আঘাত করে। এঁদের লেখায় সমাজের অবক্ষয়ের রূঢ়তা স্পষ্ট, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে সমাজ চেতনার দিকটি আরো সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌনতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে নির্ভর করে বা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এসেছে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পে মুসলমান সমাজ, পরিবার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সমাজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রকৃতির নর-নারী তাদের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে উঠে এসেছে। যেমন 'চাঁদমিঞা', 'রস', 'দ্বিরাগমন' বা 'পালঙ্ক' ইত্যাদি গল্পে এই সমাজকে এমনভাবে অঙ্কন করেছেন যার দ্বারা বোঝা যায় নরেন্দ্রনাথ এই সমাজকে খুব কাছ থেকেই দেখেছিলেন। তবে 'রস' গল্পে বিষয়ের প্রসঙ্গে সে টাকার উল্লেখ তিনি করেছেন, সে সম্পর্কে লেখক আনিসুজ্জামান বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন -

> ... বাংলা দেশে কোথাও যে বিয়ে করতে গিয়ে মুসলমান পুরুষ টাকা দেয় মেয়ের বাপকে তা আমার জানা ছিলনা, এখনও নেই। [১৪]

কিন্তু কবিতাচন্দের কথাকে সমর্থন করে বলা যায় -

> অভিযোগটি মেনে নিলে সমগ্র গল্পটি দাঁড়ায় একটি অবান্তর পটভূমির উপর। কারণ বিয়ে উপলক্ষে টাকা রোজগারের উপায়েই এই গল্পের মূল সমস্যা লুকিয়ে আছে। [১৫]

দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তথা হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের দ্বারা আক্রমন এসেছিল তার ফলে লেখকের মনে কখনোই ঘৃনা বা বিদ্বেষ জন্ম নেয়নি। কারণ শৈশব থেকেই এই সমাজের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। কমলকুমারের গল্পেও মুসলমান চরিত্র কিছু দেখা যায়, এ বিষয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক মানসিকতারই ছিলেন। যেমন 'জল' বা 'তেইশ' গল্পে ফজল বা আলম ইত্যাদি চরিত্র রয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মুসলমান সমাজ বা মানুষ একেবারে নেই বললেই চলে। অথচ পূর্ববঙ্গে তিনি জীবনের অনেকটা সময়-ই কাটিয়েছেন। কমলকুমারের গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, যা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে নেই।

নরেন্দ্রনাথের গল্পে কলকাতার আসেপাশে গজিয়ে ওঠা কলোনী, এবং তাদের বাসিন্দারা চরিত্র হয়ে উঠেছে। যেমন 'কাঠগোলাপ', 'ফেরিওয়ালা' - ইত্যাদি গল্পে এই সব মানুষেরা রয়েছে। এই কলোনী গুলো কলকাতায় গড়ে উঠেছিল বিশেষ একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। অর্থাৎ দেশভাগ হয়ে যাবার পর দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দ্বারাই এই সব কলোনী গড়ে উঠেছিল। এই কলোনী জীবনেই গ্রামের গৃহস্থ ঘরের বধূ শহরে হয়ে উঠেছে কাজের ঝি (দ্বিচারিনী)। গ্রামের এক সময়কার বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার হয়ে উঠেছেন অফিসের পিওন (হেডমাস্টার)। শুধুমাত্র কলোনীর জীবনের চিত্রই নয়, কীভাবে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষ জীবনধারনের জন্য নিজেকে পরিবর্তিত করে নিতে বাধ্য হচ্ছে, সে চিত্র নরেন্দ্রনাথ নিপুনভাবে এঁকেছেন। এই কলোনী জীবনযাত্রা, উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের কথা খুব পরিস্কার ভাবে চিত্রিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারোঘর এক উঠান' উপন্যাসে। এছাড়া 'তারিনীর বাড়ি বদল', 'বুটকি ছুটকি' ইত্যাদি গল্পে রয়েছে। কমলকুমারের গল্পে এই উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের কলোনী জীবন সেভাবে দেখা যায় না। অর্থাৎ এদের অনেক গল্পেই দেখা যায় মানুষের মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে। ঐতিহ্যগত ধারনা ভেঙে পরছে।

কমলকুমারের কিছু গল্পে সমাজের কৃষি নির্ভর মানুষ, তাদের বঞ্চিত হবার কাহিনী পাওয়া যায়। যেমন 'তেইশ' গল্পে আলম ছিল এক প্রান্তিক চাষী, কিন্তু জমিদারের অত্যাচারে সে হয়ে পড়ে ভূমিহীন এবং ভিক্ষাবৃত্তি সে গ্রহণ করে জীবনধারণের জন্য। জমিদারদের অত্যাচারের ছবি রয়েছে তাঁর 'কয়েদ' খানা গল্পে। এই দরিদ্রক্লিষ্ট সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষদের মধ্যে কিছু জন 'বাবু' বা জমিদার শ্রেণীর ভালোমানুষীর আড়ালে যে প্রতারনা রয়েছে তা ধরতে পারে না। তারা তাদের এই দারিদ্র্যকে নিজেদের ভাগ্য বলে মেনে নেয়। 'কেননা খোদা সবাইয়ের উপর দয়া রাখেন'[১৬] কিন্তু আলম বা শাহাদাজের মতো মানুষেরা জমিদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠতে চায়, তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথের গল্পে কৃষক আন্দোলন বা এ ধরনের কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার বা বঞ্চনার কথা পাওয়া যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও কৃষক শ্রেণীর এই আন্দোলন মুখী হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ নেই। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চাঁদমিঞা' গল্পে অবশ্য জমিদারী অত্যাচারের কাহিনী রয়েছে, কিন্তু প্রেম-ই সেখানে প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

কমলকুমার তার গল্পে যুদ্ধোত্তরকালীন সমাজে যে ধনী দরিদ্রের বিভেদ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা উল্লেখ করেছেন 'লুপ্তপূজা বিধি' গল্পে। এখানে একটি প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে কমলকুমার দেখাতে চেয়েছে গোটা ভারতবর্ষ কীভাবে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যে বিভক্ত। সমাজে এই শ্রেণী বিভাগের চিত্র পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'হিমির সাইকেল শেখা' বা 'বাদামতলার প্রতিভা' গল্পে। প্রথম গল্পটিতে দেখা যায় -

> "জগদীশ হাসে। - বস্তির পাশে আমার তেতলা বিল্ডিং
> যানিয়েছে ভাল।[১৭]

আর 'বাদাম তলার প্রতিভা' গল্পে কিশোর বাবলা বলে -

... ওই সি আই টি এসে তো মাঝেরকটা বাড়ি ভেঙে
দিল - আর তাই ফুটুনি ঝাড়া হচ্ছে এটা বস্তিপাড়া ওটা
আরিস্টকসী পাড়া - কেমন ? [১৮]

নরেন্দ্রনাথের গল্পে এ ধরনের স্পষ্ট শ্রেণী বিভাগের চিত্র দেখা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আবার দেখি পরিবর্তিত সমাজে - মানুষ কীভাবে দূষিত হচ্ছে। এই চিত্র রয়েছে 'ওয়াং ও খেলা ঘরে আমরা' গল্পে। এখানে ওয়াং-এর প্রেতাত্মা লেখককে জানিয়ে দেয় -

আমি রক্ত চাই না। ... পৃথিবীর সব রক্ত খারাপ হয়ে গেছে।
... দিস ইস এ উইকেড্ ওয়ার্ল্ড অল ম্যান করাপটেড্। [১৯]

এই করপসন বা দুর্নিতি গ্রস্থ মানুষের কথাও নরেন্দ্রনাথের গল্পের বিষয় হয়ে ওঠেনি, বরং এই দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের-ই মানুষের প্রেম ভালবাসা, পাওয়া না পাওয়ার কাহিনীই প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্যিত এই সমাজে কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় শিশুরাও যে একটা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, সেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। যেমন 'বিকেলের খেলা' গল্পে রাজনীতি শিশুদের কী ভয়ানক পরিণতিতে নিয়ে গেছে, যেখানে দেখতে পাই দুটি শিশু নিজেকে পরস্পরকে আঘাত করে মৃত্যুর মুখে চলে পড়েছে 'বাবলু পার্টি' আর 'পিন্টু পার্টি' তকমা জামায় এঁটে। শিশুরা আরো ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রয়েছে 'ইস্টিকুটুম' গল্পে, সেখানে গনেশ তমকের ডাককেও তত ভয় পায় না যত ভয় পায় যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে, তাকে। কমলকুমারের গল্পেও শিশুরা অসহায় অবস্থায় রয়েছে, এ চিত্র পাওয়া যায় 'স্বাতি নক্ষত্রের জল' গল্পে। অভিভাবকদের পদমর্যাদা আর উচ্চাকাঙ্খা শিশুমনকে কীভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে, সে প্রসঙ্গ এ গল্পে পাই। কিন্তু শিশুদের এই অসহায়তার কথা নরেন্দ্রনাথের গল্পে সেভাবে পাওয়া যায় না।

কমলকুমারের গল্পে পরিবর্তিত সমাজে মানুষ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে হতে 'র' বাবু 'মিঃ' অথবা 'মিসেস' ইত্যাদিতে চিহ্নিত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ আত্মপরিচয় (Identity) মানুষের হারিয়ে যাচ্ছে। এই আত্মপরিচয় হারিয়ে যাবার কথা নরেন্দ্রনাথের গল্পে ও রয়েছে। কিন্তু কমলকুমারের 'দ্বাদশমৃত্তিকা' বা 'স্বাতিনক্ষত্রের জল' গল্পে যারা আত্ম পরিচয় হারাচ্ছে তারা উচ্চবিত্ত মানুষ, সমাজের উচ্চকোটিতে তাদের বসবাস। আর নরেন্দ্রনাথের গল্পের মানুষেরা একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে 'সমাজের পরিবর্তনে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে আত্মপরিচয় হারিয়ে গ্রামের বধূ থেকে 'ঝি'তে অথবা 'হেডমাস্টার' পিওনে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের এই আত্মপরিচয় হারানোর প্রসঙ্গ রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মুখোস' গল্পে। সেখানে দেখি- মানুষ আর মানুষের চেহারায় থাকছে না, তারা - পশু, কীট, পতঙ্গের মুখের আড়ালে পরিবর্তিত হচ্ছে। কমলকুমার এই উচ্চবিত্তের সমাজে নিজে এক সময় ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত ছিলেন। তাই খুব সহজেই এই পরিবর্তন তাকে ভাবিয়েছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে মধ্যবিত্ত জীবনের মানুষ, এবং এ জীবনকেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন তাই তার গল্পে স্থান করে নিয়েছে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষেরা। যারা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের পরিবর্তন করে নিচ্ছে। তবে মানুষের আত্ম পরিচয় হারাবার চিত্র অন্যভাবে রয়েছে কমলকুমারের 'বাগান কেয়ারি' গল্পে। সেখানে একজন শ্রমিক যে বেঁচে থেকেও নামগোত্রহীন হয়ে শ্রমজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সেটুকু পরিচয় হারিয়েও সে পরিচিত হয় 'ক্রিমিন্যাল' হিসেবে। জীবনের এমন অপচয়ের ছবি কমলকুমার ছাড়া খুব কম শিল্পই অঙ্কন করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু গল্প প্রকৃতিকে নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে - যেমন - 'বনের রাজা', 'গাছ', 'সামনে চামেলী', 'আমকাঠালের ছুটি' অথবা 'বৃষ্টির পরে' ইত্যাদি। 'বনের রাজা' গল্পে বৃদ্ধ সারদা যখন পুকুর থেকে স্নান করে

ওঠে তখন নাবালক মতির কাছে মনে হয় - 'দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের শ্যাওলা।'[২০] আর তার শরীর থেকে যে গন্ধ আসছিল তা 'মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, শীরের গন্ধনা, জাম-জামরুলের গন্ধনা। জলের গন্ধ ? শ্যাওলার গন্ধ ? তা-ও না, মতি বুঝল কোমল মিষ্টি ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা।'[২১] এ গল্পের শুরুতেই সারদা বলে 'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলে' অথবা নাতির প্রশ্নের উত্তরে সে বলে 'আছে বৈ কি। জিব আছে, কান আছে। নাক আছে, চোখ আছে। ...' আমাদের মতো ওরাও সব কিছু দেখতে পায়।'[২২] 'গাছ' গল্পে গাছেরই অনুভূতির কথা প্রাধান্য পেয়েছে। গাছ-ই এখানে প্রধান চরিত্র। যেমন - 'গাছ শুনে দুঃখ পেল, আবার মনে মনে হাসল, যেন পুবের জানালার মানুষটিকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে হল ...'[২৩] অথবা 'গাছের মনে গাছ দাড়িয়ে রইল।'[২৪] নরেন্দ্রনাথের গল্পে, প্রকৃতি কাহিনীর পশ্চাদপট হিসেবেই এসেছে। 'প্রকৃতিই গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেনি। কমলকুমারের গল্পেও প্রকৃতি কাহিনীর পশ্চাদপট হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, চরিত্র হয়ে ওঠে নি।

নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের খুব তুচ্ছ বস্তু গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে যেমন 'শাল', 'টিকেট', 'এ পো দুধ', 'জামা' 'পালঙক, 'পদক', 'ক্যালেন্ডার' 'বেহালা', 'সিগারেট', 'জমি', 'দশটাকার নোট' ইত্যাদি। এই তুচ্ছ সামান্য বস্তু গুলোই মানুষের জীবনের কত হাসি কান্না মিশ্রিত ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে, তা নরেন্দ্রনাথ তার গল্পে দেখিয়েছেন। যেমন 'শাল' গল্পে বিথীকা তার মৃত স্বামীর স্মৃতি হিসাবে যে শালকে অতি অবস্থায় রেখেছিল, সে শালটিকে যখন অনিমেষের সিগেরেটের স্ফুলিঙ্গে ফুটো হয়ে যায় তখন বিথীকা এই সামান্য ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারে না। 'শত ছিদ্র স্মৃতির ভান্ডারে তার এখনো একি স্বর্ণরেণু, সঞ্চয়ের সাধ।'[২৫] সামান্য একটি শাল তাদের মধ্যে স্মৃতি হয়ে কাঁটার মতো বিঁধে আছে, কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারছে না।

'পালঙ্ক' গল্পে দুটি অসমশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংঘাত নয়, বরং হৃদয়ে মেল-বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। আবার 'জামা' গল্পে রয়েছে ধনী দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগের স্পষ্ট চিত্র। একটি 'জামা'কে কেন্দ্র করে একটি দরিদ্র মানুষের মনের অভিমানই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'বেহালা' গল্পে এই নিষ্প্রাণ যন্ত্রটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার, নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্পে যুদ্ধোত্তর কালীন সময়ে যে কালো বাজারি শুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ এসেছে যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনন্দীর 'মাছ' গল্পে তারিনী তার প্রতিবেশী বিত্তবান পলাশবাবুর অর্থ উপার্জন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে -

> আমার তো মনে হয় কেবল ওকালতি না, পলাশ নন্দী সিমেন্ট হোক চাল হোক - কিছু একটার ব্ল্যাক মার্কেটিং চালাচ্ছে - তাই না এমন গাড়ি বাড়ির জৌলুশ। [২৬]

আবার একই ভাবে নরেন্দ্রনাথের 'টিকিট' গল্পে শীতাংশু ট্রামে টিকিট না কেটে ট্রামের কন্ডাকটারকে ফাঁকি দিয়ে নেমে পড়ায় এক ধরনের উল্লাস বোধ করে। তার এই উল্লাসকে লেখক তুলনা করেছেন - যে 'কালোবাজারে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করেও কোন লাখপতি বোধ হয় এমন উন্মাদনার স্বাদ পায় না।'[২৭] কমলকুমারের 'দ্বাদশ মৃত্তিকা' গল্পেও দেখা যায় লেখক বলছেন -

> এই খানকার উচ্চকিত শ্বাসেতে সমস্ত কফটিতে বৈকল্য প্রভবিয়াছে, পাখাটির গতিশীলতা হ্রাস হইতে আছে, ব্ল্যাক আউট ঠোঙা দেওয়া আলো কম - এই দল যে কেমনভাবে সময় অতিবাহিত করিবে তাহা ঠাহর বহির্গত সম্ভবিল। [২৮]

(৩)

রবীন্দ্রনাথের হাতেই যে 'ছোটগল্প' একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে উঠেছিল, তার অন্যতম কারণ হল তার অপূর্ব ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা। 'রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা ভাষায় শুধু যে ছোট গল্পের আদর্শ ছিল না, তাই নয়, গল্পের ভাষাও তাকে গড়তে হয়েছে।[২৯] এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন -

> গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কি দশা হত জানি নে।[৩০]

কাজেই গল্প রচনার ক্ষেত্রে ভাষার যে একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তাকে স্বীকার করতে হবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার গ্রাম এবং শহর কেন্দ্রীক উভয়ক্ষেত্রের গল্পেই একই রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছিলেন -

> ... আসলে আমি কিছু সুন্দর শব্দ নিয়ে, কথা নিয়ে গল্প তৈরি করব - ... গল্প যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন শব্দগুলিই তাকে তৈরি করে।[৩১]

এই সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেছেন -

> ... এই যে শিল্পসম্মত, বুদ্ধিগ্রাহ্য শব্দ চয়ন করে জীবনানন্দ কবিতা রচনা করতেন, আমারও ইচ্ছা হত ঠিক ঐরকম শব্দ সাজিয়ে একটি করে গল্প লিখি।[৩২]

এর থেকে বোঝাই যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। সুমিতা চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে যেকথা বলেছেন তাকে মেনে নিয়ে বলা যায় - তার 'ভাষা অন্যের পক্ষে অননুকরণীয়। প্রতিটি শব্দের সুচিন্তিত

নির্বাচন, সব ধরনের দেশি ও বিদেশি শব্দ, শব্দের অভিনব বিন্যাস ...।" [৩৩]
- এ সবই তার গল্প ভাষার উদাহরণ থেকে অনুধাবন করা সম্ভব - বিশেষণে ভূষিত করে তার সৌন্দর্য বোঝা যাবে না।' তার গল্পে উপমা, শ্লেষ ইত্যাদির অপূর্ব প্রয়োগ দেখা যায়। উপমা ব্যবহারে তিনি অনেকটাই কবি জীবনানন্দের অনুসারী। যেমন 'চমৎকার চওড়া খাট জুড়ে এমন ফুরফুরে-ঠাণ্ডা হাওয়ায় মশারিটা মরা হাতির পেটের মতন ফুলে উঠছে, অবিশ্বাস্য রকম মিষ্টি হেনায় গন্ধ সেখানে'(আরশোলা)। এখানে সম্পর্কের পচনকে 'মরাহাতির পেটের'-এর সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। আবার কিছু গল্পে বাক্যের টুকরো টুকরো গড়নে, কয়েকটি বাক্যগুচ্ছের অনবরত আবর্তনে শ্লেষ ঘনীভূত হয়েছে - যেমন 'বিকেলের খেলা' গল্পে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বা 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে 'গরিবি হটাও গরিবি হঠাও' - ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী উপমা, চিত্রকল্পে বা বর্ণনায় পশু, কীট, পাখি, সরীসৃপ, মাছের ব্যবহার করেছেন। যেমন 'ইন্টিকুটুম' গল্পে বর্ণনার ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার - 'পাখিটা আর একবার মিঠে বুলিটা শুনিয়ে দিয়ে আচমকা উড়ে গেল। ... ফড়িং প্রজাপতি নীরবে নড়াচড়া করে। - পাকা নিমফলের গন্ধে এক ঝাঁক বোলতা কোথা থেকে ছুটে এসে ... বোঁবোঁ করে ঘুরছে নাচছে।" [৩৪] অথবা উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাখির তুলনা রয়েছে - 'এবার গণেশ ঘাড় সোজা করে বসল। পাখির খাঁচার মত শীর্ণ পাঁজরের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড ধড়াস করে উঠছে।'[৩৫] অথবা 'মঙ্গল' গ্রহ গল্পে 'ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে মনে হল মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিনী কোনো বাঘিনী।'[৩৬] নরেন্দ্র নাথের গল্পে উপমার ক্ষেত্রে এধরণে পশু পাখি, কীট, পতঙ্গের ব্যবহার করেন নি। নরেন্দ্রনাথ তার গল্পগুলিতে ভাষার ক্ষেত্রে বিবৃতি মূলক ও বিশ্লেষণীমূলক পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তার ভাষার বড় বৈশিষ্ট্যই হলো, তা অত্যন্ত সরল এবং নিরাভরণ। এই সরল, নিরভিরণ বাক্যের মধ্যে দিয়েই গল্পের মূল

অনুভূতিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতেন। বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার পরিমিতিবোধ লক্ষ্যনীয়। তার গল্পের অনেক ক্ষেত্রেই এমন কিছু বাক্যের ব্যবহার দেখা যায় যা পৃথক-ভাবে অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু সেই বাক্যই গল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। যেমন 'রস' গল্পের শেষে মোতালেফের জন্য যাজু খাতুনের মনের কোনে কোথায় যেন একটু মমতা রয়ে গেছে তারই আভাস দেয় মোতালেফের উক্তি- 'না মেক্রাভাই নেবে নাই'। এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও দেখা যায় যেমন 'বাদাম তলার প্রতিভা' গল্পে বাবলার বন্ধুরা তার কান্নারই অংশীদার হয়ে চুল টেনে তাকে প্রশ্ন করে অরুণকে কামড়ানোর প্রসঙ্গে - 'মিষ্টি লাগল রক্তটা'? - এই সব হত দরিদ্র-শিশুদের মনের মধ্যে চেপে রাখা অভিমান এই একটি বাক্যেই পরিস্ফুট হয়। কমলকুমারের কিছু গল্পেও খুব সাধারণ বাক্য অসাধারণত্ব লাভ করেছে যেমন 'তাহাদের কথা' গল্পের সমাপ্তিতে শিবনাথ লৌহ শৃঙ্খলের শৈত্য নিজ গালে অনুভব করার সময় বলে 'খুব ঠান্ডারে খুব ঠান্ডা'। এই সাধারণ একটি বাক্যই - স্বাধীনতা-উত্তর কালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে মানুষের মনের ঠান্ডা অনুভবকেই বুঝিয়ে দেয়।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাষায় কাব্যধর্ম উপলব্ধি করা যায় যেমন 'রস' গল্পে - 'আমের গাছ বোলে ভরে উঠল গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, যাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু, ফুলের মতই মুখ। ফলের গন্ধ তার নিশ্বাসে।'[৩৭] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের ভাষাতেও এই কাব্যধর্ম রয়েছে, যা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। যেমন 'গাছ' গল্পে -'বর্ষায় পাতাগুলি বড় হয় পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত-সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়।'[৩৮] অথবা

'গিরগিটি' গল্পে 'খোঁপায় মালা জড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে যায়া বাইরের উঠান দেখে। জলে জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলো চিক চিক করছে। হাওয়ায় নড়ছে। পেয়ারা পাতা থেকে টুপটাপ রুপালি জল ঝরছে।" [৩১] কমলকুমারের গল্পে উপমা ব্যবহার হয়েছে আরো আশ্চর্যভাবে -'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্পে 'মেয়েটির নিশ্বাস আসে ও যায়, সকালে নদীর উপরে হাওয়া যেমন'। - আবার ভাষায় কাব্যময়তা রয়েছে যেমন 'তাহাদের কথা' গল্পে - 'ভোর হয়, গাছের পাতা অযথা কালো, পাখীর উড়ায় শূন্যতা উদ্‌ব্যস্ত।" অথবা এ গল্পেই দেখা যায় 'একটি নীল স্পন্দন। মনের কিছু ভাগ, বনের কিছু ভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি।'

নরেন্দ্রনাথ ও কমলকুমারের অনেক গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। যেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে দেখা যায় না। কমলকুমারের 'তাহাদের কথা' গল্পে বিপিন গুপ্ত বলে 'কে বটে জ্যোতি লয় ?' জ্যোতির প্যান্ট প্রসঙ্গে উত্তর - 'জানি না, একজনা দিইছে বটে।' - এ ভাষা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের মানুষের ভাষা। এ অঞ্চলের একেবারে নিম্নবর্গে বাস করা মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে কমলকুমার - সংলাপের ক্ষেত্রে সে ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন তাদের চরিত্রের বাস্তবায়নে যেমন 'মতিলাল পাদরী' গল্পে - 'যদু বলে '... ওগো বলি, শোন মাগী বড় সুবিধের লয়, লাৎসোঁয়ারি' অথবা 'কয়েদখানা' গল্পে শাজাদ বেয়াড়া-তাড়ানো গলায় হেহে করে বলে উঠল, 'খায় শালা পাখ্‌থুরে হারামী শালা 'হুজুর হুজুর' বলি হুজুরের বুকজোড়া ব্যাঙ্গলী রাঢ়।

নরেন্দ্রনাথের গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়েছে কিন্তু সেখানেও তার মধ্যবিত্ত রুচিশীল মন কাজ করেছে যেমন 'রস' গল্পে যাদু খাতুন মোতালেফের কাছ

থেকে বিবাহের প্রস্তাবে আশ্চর্য হয়ে বলে -

রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি ! ক্যান্ কাঁচা
বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে
তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।

- এ ভাষা পূর্ববঙ্গের, হয়তো বা ফরিদপুরেরই লেখকের অতি পরিচিত ভাষা। লক্ষ্য করার বিষয় নরেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সংযত থেকেছেন। এমন প্রসঙ্গ বা এমন ভাষা তিনি কখনোই গল্পে ব্যবহার করতেন না যা তার রুচিকে বাধা দিত। যদিও একজন সাহিত্যিকের কাছে এটা প্রত্যাশিত নয়। তিনি শিল্প রচনার ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়কেই উদার মনে গ্রহণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে সংলাপের ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার হয়েছে তা সম্ভবতঃ কলকাতার চলতি কথ্যভাষা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথের গল্পে তৎসম, তদ্ভব এবং ইংরেজী শব্দের ব্যবহার সম ভাবেই ঘটেছে। কমলকুমারের, 'বাগান পরিধি' গল্পে - 'প্লেন লিডিং হাই থিঙ্কিং অদৃশ্য হইয়াছে।' ... জি-বি-স যথার্থ বলিয়াছে। - এখানে একই সঙ্গে ইংরেজি কথ্য ও তৎসম শব্দ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু কমলকুমারের গল্পে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার দেখা যায় - যেমন 'কালই আততায়ী' গল্পে - 'যথা প্রদীপ্ত, জ্বলনং পতঙ্গাঃ।' - ইত্যাদি। সংস্কৃত শ্লোকের এরকম ব্যবহার জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে সেভাবে পাওয়া যায় না। নরেন্দ্রনাথের গল্প মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক তাই ইংরেজি শব্দ ও বাক্য ব্যবহার ঘটেছে অনায়াসে যেমন 'শাল' গল্পে apprentice 'Exprienced hand' ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পেও ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায় - 'সমুদ্র' গল্পে - 'কেন, হোটেলের বোর্ডার-টোর্ডার যোগাড় করে দেয় তো শুনি।' ...'যেন একটা বেলার মধ্যেই আমি হেনার মতো 'বোরিং' বলে সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব।"

নরেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সর্বদাই ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন কিন্তু কমলকুমার দীর্ঘবাক্য ব্যবহার করেছেন কিন্তু সংলাপ ব্যবহার একেবারেই নতুন ধরনের। কখনো পূর্ণবাক্য প্রয়োগই করেন নি অথবা কয়েকটি শব্দ-ই সব বুঝিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। - যেমন - 'দ্বাদশমৃত্তিকা' গল্পের সংলাপ এরকম -

'লেডী - আপনার বই দেওয়ার প্রয়োজন নাই ··· এখানেও অনেক ···
আমি সাপ্তাহিক মাসিক ছাড়া ···
ড - না না এই ছোট ছবি, কিন্তু তোমার সহিত কি মিল ···
তুমি আছ ···

আবার বিবরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ করেছেন যেমন 'রুক্মিনীকুমার' গল্পে -

অধুনা কান্নার শব্দ ও সুরম্য হরিধ্বনি ও গঙ্গার রমণীয়
বায়ু সংমিশ্রণ তাহাকে মুহূর্তের মধ্যেই ব্রণবিরহিত করে, সে
স্থির যে পুরুত মশাইকে কোন কথা প্রশ্ন করিবে না এবং সে
ঘাট পরিত্যাগ নিমিত্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, গ্যাসের
আলোর দেওয়ালে পতিত অনেক ধর্ম্মকথা শ্রবণ ব্যাপৃতদের কম্পমান
ছায়ার অন্ধকার পার হইতেই, শুনে সেই মহতী ঘোষণা যে, হে
প্লবঙ্গ, আমি তোমার হৃদয়ের শুভাশুভ সব জানি ··· হৃদিস্থং
সর্বভূতানামাত্মা বেদ্ শুভাশুভম্।'(পৃ·১৮৫)

তার ভাষায় কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। 'ছিল'র বদলে 'আছিল' অথবা 'নেহারিল' 'মন্তব্যিল' ইত্যাদি শব্দ অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বিবরণের ক্ষেত্রে এরকম দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার দেখা যায় না। কমলকুমারের ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহারও হয়েছে অপ্রচলিত প্রথায়। তিনি ইংরেজি is বা are -এর অনুরূপ 'হয়' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, যেমন 'সে হয় কানাই, সে না হয় যজল' (জল, পৃ·১৫)।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে এ ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার নেই। যেমন 'কাঠগোলাপ' গল্পে অনিমা শুনে মন্তব্য করল - 'ভদ্রলোক তো ভারি অভদ্র' - বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতিটিই এখানে বজায় রয়েছে। কিন্তু এই বাক্যটির ইংরেজী করলে is -এর ব্যবহার হত এবং কমলকুমারের রীতি অনুসারে হতো 'ভদ্রলোক তো হয় ভারি অভদ্র'। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কমলকুমারের ভাষা ব্যবহারে এখানে বৃহৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও এ ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায় না। কমলকুমারের রচনার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে তিনি চলিত গদ্য বা ভাষা ব্যবহার করেছেন যেমন 'জল' গল্পে। "তবু এবার একবার সে চেষ্টা করল, ছোট টিনের ল্যাম্পের মধ্যে তেল ছিল বা। ছোট একটু আলো হল, তখন সে ছোট ঘরটার চারিদিকে চাইল', অন্ধকার নেই, আবছায়া হয়েছিল ...'(পৃ.৩২)। অথবা 'মল্লিকাবাহার' গল্পে - 'শোভনার চোখে অন্য এক আলো এসে পড়েছে, তার চোখে মুখে দেখা যাবে পুরুষালি দীপ্তি, ...' কিন্তু 'রুক্মিনীকুমার' থেকেই তিনি সাধু ভাষায় রচনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ক্রমশ ভাষার জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংলাপের ক্ষেত্রেও ক্রমশ তিনি সাধুগদ্যের ব্যবহার শুরু করেন। যেমন 'রুক্মিনীকুমার' গল্পে - 'লবঙ্গলতা চোখ তুলিয়াছিল, দেখিয়াছিল অসহায় রুক্মিনীকুমার' আবার সংলাপেও সাধু ভাষায় প্রয়োগ ঘটেছে এই গল্পেই দেখা যায় - 'রুক্মিনীকুমার উত্তর দিয়াছিল 'আমার আপনাকে বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।' অথবা -- 'না ... আমি সবই শুনিয়াছি ... দেখিয়াছি'। (পৃ.১৮৮) নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে সাধু ভাষা ব্যবহারের কোনরকম প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। এবং কমলকুমারের গল্পের ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায় নরেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গল্পে সে ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। 'ছন্দ স্পন্দ সৃষ্টির প্রয়োজনেই, কমলকুমার

অনেক সময় বাক্য মধ্যে সর্বনাম, বিশেষণ বা অব্যয়ের বিন্যাসক্রমে, মাঝে মাঝেই এক ধরনের বাধাপ্রাপ্ত অনুয় জটিলতা আনেন যা একমাত্র বাক্যান্তর্গত ছন্দস্পন্দের যতি অনুসারী পথে, একই সঙ্গে অর্থ ও রচনা সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য রূপ, কিন্তু ছন্দস্পন্দকে উপেক্ষা করার ফলে, গদ্যের এহেন আপাত-বিষম বিন্যাসই, আবার বাচ্যার্থ-অনুধাবনের প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে।'[৪০] যেমন - 'প্রায়ই দীঘল ঘোমটা রমনীগণের ছিন্নবস্ত্র হেতু যাহাদের, তাই হয় কেশরাশি, হয় একটি কান, ...। কমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত ও চরিত্রসংগঠনে ভাষার অপূর্ব প্রয়োগে অভিনবত্ব, সৃষ্টি করেছেন, যেমন - নিম-অন্নপূর্ণা গল্পে ক্ষুধার্ত বালিকার 'জল গিলে গিলে' খাওয়া। অনুষঙ্গ সদৃশতা আর ভাষায় ভাবগত-রূপগত সামঞ্জস্য বিধান ... তাঁর বাক্য গঠনের বহু মাত্রিক বৈভবই তো প্রতিষ্ঠিত করে।'[৪১] ভাষা ব্যবহারের কৌশলে বিষয় বা বস্তুকে দৃশ্যগোচর এবং শ্রুতিগোচর করে তোলা কমলকুমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নরেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে ভাষার এই বৈশিষ্ট্য তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রের ভাষায় অবশ্য স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের অনুভূতি প্রধান হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানের বা কবিতার পংক্তি অনায়াশেই ব্যবহার করেছেন, যেমন 'পত্র বিলাস' গল্পে মিনু আবৃত্তি করে -

যা কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবন হারা।
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমারের গল্পে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বা গানের পংক্তির এরকম ব্যবহার দেখা যায় না।

(৪)

ছোট্ট গল্প রচনার ক্ষেত্রে 'ছোটগল্পের বর্ণনা হবে ব্যঞ্জনা প্রধান ও গল্পের পক্ষে অপরিহার্য।'[৪২] তবে বর্ণনাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সংলাপের দ্বারাও গল্প রচিত হতে পারে। আলোচ্য তিন শিল্পী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার, ও নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সংলাপকে অবলম্বন করে কোন গল্পই রচিত হয়নি। ছোটগল্পের শিল্পীরা গল্পের প্রয়োজনে কখনো বর্ণনা দীর্ঘতর করে থাকেন। সেটা প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় গোষ্ঠীর শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গল্পের আড়ম্ভও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে হতে পারে। দীর্ঘ বর্ণনা প্রয়োগের চেষ্টা কমলকুমারের গল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন তার 'মল্লিকাবাহার' গল্পের শুরু হয়েছে দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে -

'আয়না এখন, আঁচল দিয়েই মুছে, এবার যথাযথ প্রতিফলিত, এবং অতীব স্পষ্ট। যদিও যে ছোট আয়না, তৎসত্ত্বেও আবক্ষ দেখা যায়, যখনই যেখানেই ঈষৎ ফাঁক সেখানে সেখানে দীন ঘরের, স্যাঁতসেঁতে ঘরের এটা-সেটা। ... এই পুরুষোচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এ সকল যে ম্রিয়মান, নিষ্ক্রিয়।'[৪৩] আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'জ্বালা' গল্পের শুরু হয়েছে মধ্যাহ্নের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের পরিবেশকে ভয়ংকর করে তোলা হয়েছে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গল্পের এক নিষ্ঠুর ভয়ংকর মানুষের উপস্থিতি যেন পাঠক মনে আগাম পৌঁছে দিতে চান লেখক। যেমন -

> এত বড় ... বস্তুত গরমটা যত বাড়ছে, চার দিকের শব্দ-টব্দগুলো যেন তত কমে আসছে। ... মানুষ হাঁটছে না, বাইরে রাস্তায় গাড়ি, ঘোড়া চলছে না, কোনো বাড়ির শিশু কাঁদছে না রেডিও খুলছে না কেউ। ভয়ে ? প্রচণ্ড গ্রীষ্ম রক্ত চক্ষু মেলে সব কিছু থামিয়ে দিয়েছে সবাইকে শাসাচ্ছে চুপ, চুপচুপ। আমার প্রতাপ দেখ, আমার প্রতাপ দেখ। আমি কেমন নিষ্ঠুর, কত ভয়ংকর হতে পারি তোমরা টের পাও। ...[৪৪]

ছোট গল্প রচনার নানা প্রণালীর মধ্যে সবচেয়ে যে পদ্ধতি লেখকেরা অবলম্বন করেছেন সেটা হলো 'Direct Method' এই পদ্ধতিতে গল্পে গল্পলেখকই সর্বজ্ঞ। গল্পের কার্যকারণ, চরিত্রের মনের কথা সবই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। এছাড়া রয়েছে আত্মজীবনীমূলক পদ্ধতি (Autobiographical) এই পদ্ধতিতে গল্পের কোন চরিত্রের জবানীতেই সমগ্র ঘটনা বর্ণিত হয়। আমাদের আলোচ্য তিন শিল্পীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের গল্পে এই দুটো পদ্ধতিরই ব্যবহার দেখা যায়। যেমন বিখ্যাত 'রস' গল্পে প্রত্যক্ষরীতির (Direct Method) ব্যবহার দেখা যায়। লেখকই এখানে সর্বজ্ঞ, গল্পের শুরু করেছেন লেখক এই ভাবে -

> কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে
> শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না
> যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার
> বিধবা স্ত্রী মাজু খাতুনকে।[৪৫]

চরিত্রের মনের কথাও লেখকই বলেছেন পাঠককে -

> ... চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের।
> বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের
> খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খুবসুরৎ
> চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই
> চেষ্টাই সে করে এসেছে।[৪৬]

কমলকুমারের গল্পেও এই প্রত্যক্ষ রীতির ব্যবহার দেখা যায় যেমন 'তাহাদের কথা' গল্পে -

> আতা গাছটির পাশেই জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল। এখন পড়ন্তবেলা ...
> এতে করে তার মনের অধৈর্য্য আরও যেন বেশী করে প্রকাশ
> পায়। সে ক্ষুৎপিপাসা কাতর, না অন্য কোন যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু
> সে নিজেই জানে না। সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তা, জ্যোতি তাকাল।[৪৭]

আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে অনেক সময় আকস্মিক চমক সৃষ্টি এবং নাটকীয়তা প্রয়োগ করতে দেখা যায়। ঘটনা উপস্থাপনায় নরেন্দ্র নাথ আকস্মিকতাকে প্রশ্রয় তেমনভাবে দেননি। কিন্তু নাটকীয়তা সৃষ্টিতে দুই শিল্পীই উপযুক্ত সমভাবে। উত্তেজনাময় পরিস্থিতি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে দেখা যায়, যেটা নরেন্দ্রনাথের গল্পে দেখা যায় না। নরেন্দ্রনাথের গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজ, সরল শান্ত সুরটিকেই উপলব্ধি করা যায়। কমলকুমারের 'কয়েদখানা' গল্পে একটা ভয়ংকর পরিণামের প্রস্তুতি দেখান - এই ভাবে -

> আর একজনের উষ্ণ নিশ্বাসে অন্যে ভীত, এ কারণে যে আসন্ন দাঙ্গার উৎসাহে সকলেই কিয়ৎ পরিমানে দুর্বল। এ ওকে ধাক্কা দেয়, অথচ পাতা ঝরার শব্দে, অথবা মহুয়া যখন বিচ্যুত তখন, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিম্নে এবং গাছে যেখানে চন্দ্রালোক পুঞ্জিত সেখানে চকিত হয়। এ দৃষ্টি সন্দেহবাচক। কেহ আর ভীত।—[৪৮]

উত্তেজনাময় পরিস্থিতি রয়েছে কমলকুমারের 'জল', 'তাহাদের কথা' ইত্যাদি গল্পে। নাটকীয় চমক রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পতঙ্গ' গল্পের শেষে। অথবা 'গিরগিটি', 'নদী ও পরী' - ইত্যাদি গল্পে। নরেন্দ্রনাথের গল্পে এক একটি বাক্য ইঙ্গিতগর্ভ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। সেভাবেই কমল কুমারের 'তাহাদের কথা' গল্পে শিবনাথের উক্তি 'খুব ঠান্ডারে, খুব ঠান্ডা' - অথবা 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে - প্রীতিলতা বলেছিল তার সন্তানদের 'নে খা-না তোরা'। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পতঙ্গ' গল্পে 'বৌদি মুর্গী খাবে, একটা মুর্গী কেটে দিয়ে এলাম' - পলাশের এই উক্তি, অথবা 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে 'গরিবি হটাও গরিবি হঠাও' ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ তার অনেক গল্পেই পত্ররীতির ব্যবহার করেছেন। যেমন 'ধূপকাঠি' গল্পের শুরু করেছেন চিঠির মাধ্যমে - 'মান্যবরেষু, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। বিনা পরিচয়ে

আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি ...।" [৪৯] গল্পের শেষও করেছেন চিঠির আকারেই - 'অনধিকার চর্চার জন্য আর একবার মার্জনা চাইছি - ইতি - বিনীতা মাধুরী সেনগুপ্ত।' [৫০] পত্রের মধ্যে দিয়েই মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে কাহিনীর আকারে লেখক পরিবেশন করেছেন। এ ধরনের পত্রের ব্যবহার কমলকুমারের বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে দেখা যায় না।

ছোট গল্পের সার্থকতা অনেকখানিই নির্ভর করে এর নামকরণের ক্ষেত্রে। যদিও গল্পের গঠনের সঙ্গে নামকরণের যোগসূত্র অঙ্গাঙ্গীন নয়, কিন্তু নামকরণের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। নামকরণের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ তিনজনই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। নরেন্দ্র-নাথ কখনো কোন তুচ্ছ বস্তুকেই অবলম্বন করে নামকরণ করেছেন যেমন 'টর্চ', 'টিকেট', 'শাল' 'দশ টাকার নোট' ইত্যাদি। আবার ব্যক্তির নামেও নামকরণ করেছেন - যেমন রত্নাবাঈ, চাঁদমিঞা - ইত্যাদি। আবার ব্যঞ্জনা ধর্মী নামের প্রতি তাঁর ঝোঁক অধিক পরিমানে সেটা লক্ষ্য করা যায় - যেমন 'বিকল্প', অবতরনিকা' ইত্যাদি। ব্যঞ্জনাধর্মী নামপ্রয়োগের প্রবণতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমারের মধ্যেও দেখা যায়। ব্যক্তির নামে নামকরণ কমল কুমার করেছেন - 'মতিলাল পাদরী', 'রুক্মিনী কুমার' ইত্যাদি গল্পে।

—

কমলকুমারের গল্পে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। বিদেশে ম্যাজিক রিয়েলিজম্ নামে একটি কথা চালু হয়েছে তার ইঙ্গিত কমল-কুমারের 'মতিলাল পাদ্রী', 'তাহাদের কথা' গল্পে পাওয়া যায়। এই সব গল্পে চরিত্রও পটভূমির বাস্তব, নিছক চাক্ষুষ বাস্তব নয়। চরিত্রগুলির মাথার পেছনে সময়ের পরি-প্রেক্ষিত বদলে বদলে যায়। তার গল্পে ব্যষ্টি সমষ্টিতে মিলে যায়, সমষ্টি জীবন মানেই জীবনের এক সামাজিক সত্য। কমলকুমারের আঙ্গিকের মৌলিক নিজস্বতা তার বিষয়ের এই

সামাজিকতার সঙ্গে যুক্ত। তার গল্পে ঘটনাপ্রবাহ নেই, সংঘাতজনিত গতিময়তা নেই, নাটকীয়তা নেই, যেটা দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা নরেন্দ্রনাথের গল্পে। কমল কুমারের অনেক গল্পেই সারাংশ বলে কিছু হয় না। যেমন 'বাগান' সিরিজের গল্প গুলিতে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সব গল্পেরই মধ্যে একটা কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায়, ব্যতিক্রমী গল্প 'গাছ' - এ গল্প অনেকটাই কবিতার মতো।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের শুরু তুচ্ছতার পটভূমিতে পরিণতিতে তা বৃহত্তর সত্যে উদ্ভাসিত, ঘটনা অপেক্ষা বড় হয়ে উঠেছে মানুষের মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া - যেমন 'রস' গল্পটিতে দেখা যায় পুরো এক বছরের কাহিনী লেখক বর্ণনা করেছেন। গল্পের শুরু হয়েছে তুচ্ছ রসের গাছির বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে, কিন্তু গল্প রস গাঢ় হয়ে গভীরতর হয়েছে গল্পের সমাপ্তিতে। এই 'রস' গল্পটি stair-step plot বা সোপানধর্মী প্লটের অর্ন্তভুক্ত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নদী ও নারী', 'পতঙ্গ' ইত্যাদি গল্পেও এই সোপানধর্মী প্লটের ব্যবহার দেখা যায়। নরেন্দ্রনাথের এই 'রস' গল্পের মতো বেশ কিছু গল্পেই গল্পরস ঘনীভূত হয়েছে গল্পের একেবারে শেষে, মোপাসাঁর বেশীর ভাগ গল্প এই জাতীয়। কমলকুমারের গল্পগুলি আবার বহুতল ক্রিস্টালের মতো নানা মোচড়ে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। কিন্তু মানুষের মনের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার গল্পে বড় হয়ে ওঠে নি। নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই আগে পরে ঘটনাবিন্যাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এর ফলে পাঠক চিত্ত শেষ পর্যন্ত কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে। তার কিছু গল্পের মধ্যে একটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায় সেটা হল গল্পের মধ্যে গল্প বলা যেমন চাঁদ-রূপচাঁদ তার অতীত জীবনের কাহিনীকে তুলে ধরেছেন গল্পের আকারে। এই পথটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমারের মধ্যে দেখা যায়না। তাদের অধিকাংশ

গল্পেই লেখক বলে যান সর্বজ্ঞ হিসেবে। 'ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্যতম পদ্ধতি হল গল্পের কথক 'আমি'। এই 'আমি'র বিশেষত্ব আছে। 'গল্পের সঙ্গে সেই 'আমি'র সংযোগ নিবিড় নয় - তিনি গল্পের একজন চরিত্র হতে পারেন আবার না-ও হতে পারেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের কিছু গল্পে দেখা যায় শ্রোতা 'আমি' আর বক্তা অন্য কেউ। যেমন 'পুরাতনী' গল্পের শ্রোতা 'আমি' কিন্তু বক্তা রীনা। গল্পটি রীনার নয়, তার বান্ধবী চিত্রাঙ্গদার জীবনের। এই পদ্ধতি দ্বারা তিনি গল্পে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কমলকুমারের গল্পে এ ধরনের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় না।

এই তিন শিল্পীই - শৈশবে চিত্র-কলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কমল কুমার দীর্ঘ-সময় পর্যন্ত সেই চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। এই তিন শিল্পীর গল্পেই - সেই চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু চিত্ররূপময়তা অধিক পরিমানে লক্ষ্য করা যায় কমলকুমারের গল্পে। কারণ জীবনের পরিণত বয়সে এই চিত্রের জগতেও তিনি মনো-নিবেশ করেছিলেন, যার ফলে এই শিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তার জন্মে ছিল যার প্রভাব গল্পগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিভিন্ন গল্পে জলরঙে আঁকা এক একটি পূর্ণ, ছবি আমরা পেয়ে যাই। "ছোট গোল রূপালী জলাময় - যার কিনারে হলদেটে সবুজ ত্রস্তাগত খাড়া খাড়া জলজ-ঘাস, সেখানেই জলের উপর দিয়ে তার পিঙ্গল ছায়াটা জোর করে চলে যায় ...। ঘোড়ার পিছনে উত্তরে বহুদূরে অনেক পাহাড় এবং তাল গাছের জোটের মধ্যে দিয়ে দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ের রেখা উত্থিত।'[৫১] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও একসময় ছবি আঁকতেন। তাঁর 'গাছ' গল্পে 'বর্ণপ্রতীকের জীবন্ত চলিষ্ণুতা'[৫২] লক্ষ করার মতো, গল্পে দেখা যায় 'লালের স্পর্শ পেয়েই ঈর্ষার সবুজ এখানে প্রেমের আর প্রাণের সবুজে রূপান্তরিত হয়েছে।'[৫৩] আর নরেন্দ্রনাথের গল্পে পূর্ব-বাংলার ছবি

যেখানে এঁকেছেন তা সবুজ রঙে সজীব হয়ে উঠেছে -

> মাঠ তো নয় সমুদ্র। এবার কার্তিকের শুরুতেই
> লক্ষ্মীদীঘা ধান পেকেছে। কিন্তু মাঠের জল এখনো
> তেমনি দাঁড়িয়ে।[৫৪]

অথবা 'রস' গল্পে 'আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা।'[৫৫] কমলকুমার কাঠখোদাই-এর কাজে জীবনের একটা সময়ে মনোনীবেশ করেছিলেন। তাঁর 'কয়েদখানা' গল্পের শাজাদাকে সেই 'উড্‌কাটিং' মনে হয় -

> লোকটি ঢ্যাঙা, পুরুষাকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের
> তলে অল্পহিংসেবী তীরেলাদাড়ি। ... সব থেকে সুন্দর তার
> পদদুয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা, কড়া হাঁটু - তার
> পাশেই আঁটলি মাংসপেশী।[৫৬]

- এ ধরনের নিখুঁত কাঠ খোদাই-এর ভাস্কর্যের সন্ধান নরেন্দ্রনাথের বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে পাওয়া যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে নির্দিষ্ট কোন সময়কে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে এবং কমলকুমারের কিছু গল্পে বিশেষ সময়কে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্পে দেশ বিভাগ, দাঙ্গা ধৃষ্ট যে সময় তাকে পাঠক অনুভব করে। যেমন - 'পালঙ্ক', 'কাঠগোলাপ' ইত্যাদি গল্পে। এছাড়া যুদ্ধের সময় যে খাদ্য সংকটের পাশাপাশি বস্ত্র সংকট দেখা দিয়েছিল ভয়াবহভাবে সেই সময়কে অনুভব করা যায় নরেন্দ্রনাথের 'আবরণ' গল্পে। যুদ্ধের ফলে যে মন্বন্তর বাঙালীর জীবনকে বিধ্বস্ত করেছিল সেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা সময়কে পাওয়া যায় 'মদনভস্ম', 'পুনশ্চ' ইত্যাদি গল্পে। 'পুনশ্চ' গল্পে দেখা যায় -

যুদ্ধের দরুণ গৃহস্থালীর খরচা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর আর খোনা হল না ...

অথবা এই গল্পেই দেখা যায় -

তারপর এল সেই দেশ জোড়া দুর্ভিক্ষ। হাটে বাজারে ধার মিলে না, ... বাড়িতে হাড়ি চড়ে না।

'জৈব' গল্পে রয়েছে - 'দাঙ্গার সময়কার ঘটনা। ... দাঙ্গাহাঙ্গামার জের তখনও চলবে ...' ইত্যাদি প্রসঙ্গ। কমলকুমারের 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে সেই যুদ্ধকালীন সময় এবং যে পরিস্থিতিতে মানুষ লঙ্গরখানায় দাঁড়িয়েছিল সেই সময়কে পাঠক অনুভব করতে পারে। এ গল্পেই কমলকুমার যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অতি সংক্ষেপে দেখিয়েছেন -

... এ সময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্মভেদী শব্দে ঐক্য ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলে মানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনের ভঙ্গীমাত্র ছিল। ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কি অছবি লা। (পৃ.১২৯)

অথবা -

আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই ... খাই ... কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন ...

এছাড়া ব্রজ 'ভাবছিল নয়ত পাচ্ছিল - ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃন্য কদর্য্য গন্ধ অনেক মৃতদেহের গন্ধ - মানুষেরা কি আদতে মাছ - অভুক্ত তথা বুভুক্ষ-জীবিতদের শবের গন্ধ নিশ্চয়ই এরূপই হয় ...।" বস্তুতঃ কমলকুমার ব্যক্তিগত জীবনে এই ভয়ংকর সময়ের পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, যার থেকে তিনি

এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। লোঙ্গরখানার প্রসঙ্গ এ গল্পেই রয়েছে, বুড়ো বলে -'আজ এক ...' এক ভদ্রলোক লোঙ্গর খানায়'। অথচ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একই সময়ের লেখক হলেও তার গল্পে এই যুদ্ধকালীন সময় বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত সময় প্রসঙ্গ-ক্রমে এলেও প্রধান হয়ে ওঠে নি। যার ফলে নির্দিষ্ট করে সেই সময়কে তার গল্পে আমরা পাই না। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গল্পে দৃষ্টিভঙ্গির একমুখিনতা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে ক্ষেত্রে দৃষ্টি-ভঙ্গির একমুখিনতা সার্থকভাবে প্রয়োগ ঘটেছে নরেন্দ্রনাথের গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিখ্যাত গল্প গুলির মধ্যে যেমন গিরগিটি, 'বনের রাজা' - ইত্যাদিতে এই একমুখিনতা লক্ষ্য করা যায়। আবার কমলকুমারের যে রচনায় গল্পরস রয়েছে যেমন 'জল', 'তাহাদের কথা', 'নিম্নঅন্নপূর্ণা' ইত্যাদি গল্পে এই একমুখিনতার প্রয়োগ ঘটেছে। নরেন্দ্রনাথের বেশির ভাগ গল্পেই গল্পরস জমাট বেঁধেছে, সেক্ষেত্রে লেখকও গল্পের একমুখিনতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন যেমন 'রস', 'পালঙ্ক', 'টিকিট', 'জায়া', 'বিকল্প' ইত্যাদি গল্প।

ছোটগল্পের সমাপ্তি বা পরিণতির মোপাসাঁ এবং চেকভ দুটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। 'মোপাসাঁর' গল্পের পরিণতিকে বলা হয় Whip-crack ending অর্থাৎ চাবুকমারা আকস্মিক পরিণতি, আর চেকভ-এর গল্পের পরিণতিকে বলা হয় Logical conclusion অর্থাৎ-সত্বর অনিবার্য-যুক্তিযুক্ত পরিণতি।'[৫৭] নরেন্দ্রনাথের গল্পে এই অনিবার্য যুক্তিযুক্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। গল্পের পরিণতিতে আকস্মিক চমক সৃষ্টিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন, মানুষের জীবনের ব্যর্থতা তার গল্পে অনুত্তেজিত ভঙ্গিতেই রূপায়িত হয়েছে, শান্ত স্বাভাবিক পরিণামে তার গল্প শেষ হয়।

নির্মম ব্যঙ্গ তার গল্পে নেই বরং রয়েছে মানুষের জন্য সমবেদনা। নরেন্দ্রনাথের 'হেডমাস্টার' গল্পটির পরিণতিতে রয়েছে open endedness যে উন্মুক্ত - পথ ধরে বাস্তবতার বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি রাখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের পরিণতিতে অনেক সময়ই আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায় যেমন 'বন্ধুপত্নী' গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় অরুণা শারিরীক সান্নিধ্যের বিনিময়ে স্বামীর বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে সংসার স্বামী নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। এ গল্পে রয়েছে সমাজের প্রতি এক ধরনের বিদ্রুপ। অথবা 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পেও রয়েছে আকস্মিক পরিণতি যেখানে কুন্দ বলে -

... পায়ের কাটা ঘা কদিন থাকে, ঘা শুকোয়
না মনের।

এ ধরনের শেষ মুহূর্তের অপ্রত্যাশিত চমক তার গল্পকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। কমলকুমারের কিছু গল্পের পরিণতিতে চাবুকমারা আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায় সেখানে তিনি উচ্চবিত্ত, তথাকথিত সম্ভ্রান্ত সমাজের ভন্ডামীকে উদ্‌ঘাটিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যেমন - 'নৃত পূজাবিধি'তে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের ফাঁপা মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। এ গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় শিক্ষক - 'হুইসিল বাজাইলেন, লাইন কর, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও মৃত শিশুকে ... তুরা কর।'(পৃ.১১৮) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'রাক্ষসী' গল্পের পরিণতিতে রয়েছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন (pointing Finger) তার রাক্ষসী হয়ে ওঠাতে দায়ী কে ? - এই জিজ্ঞাসায় গল্পের সমাপ্তি।

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সময়ের অন্যতম গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোট গল্পের প্রতীক ধর্মিতার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ এবং কমলকুমারের গল্পে এই প্রতীকধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' গল্পে তুচ্ছ পেঁপে চারা চুরিকে কেন্দ্র করে যে একটি শিশুর হৃদয়ও তার মা'র কাছ থেকে

তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছিল সেটাই লেখক দেখাতে চেয়েছেন। অথবা 'চন্দ্রমল্লিকা' গল্পে বিভিন্ন ফুলের স্থায়ীত্ব দিয়ে পরস্পরের সম্পর্কের স্থায়ীত্বকে লেখক বুঝিয়েছেন যেমন নটা-বারোটা ফুল সম্পর্কে বিনতার মানসিকতা হল - এই ফুল সুন্দায়ু কিন্তু - 'তাতে কি, যতক্ষন বাঁচল সুন্দর হয়ে বাঁচল'।[৫৮] এখানে বোঝাই যায় বিনতার স্বামী অপরেশও সুন্দায়ু ছিল কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিল বিনতার কাছে সে সুন্দর ছিল।

কমলকুমারের 'তাহাদের কথা' গল্পে প্রদীপ জালানোর প্রসঙ্গ রয়েছে। এ গল্পে দেখা যায় হেমাঙ্গিনী তার মেয়ে অন্নপূর্ণা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনকে সমর্থন করে এবং প্রথম উপার্জিত টাকা নিয়ে বাড়িতে এলে মা তাকে বলে - 'উঁহু আমি প্রদীপটা জ্বেলে দি আগে ঠাকুর প্রণাম কর, প্রথম মাইনে।[৫৯] কিন্তু অন্নপূর্ণা তার এভাবে অর্থ উপার্জনকে মনে প্রানে সমর্থন করে না তাই সেভাবে 'ঘরের সুন্দান্ধকারে এই পালা শেষ হলে ভাল হত।'[৬০] তার পরেই লেখক খুব ছোট একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন - 'আলো জ্বলল'।[৬১] কিন্তু এই আলো জ্বলার মধ্যে দিয়েই শিবনাথের জীবনে অন্ধকার নেমে আসা প্রতীকায়িত হয়। এ আলো সত্যতাকে নির্ভর করে জ্বলে না, এ আলো মানুষকে কোন শুভ পথ দেখায় না। কারণ গল্প অগ্রসর হলেই দেখা যায় - 'সহসা প্রদীপের চচ্চড় শব্দে হেমাঙ্গিনীর গলা স্তিমিত হল, প্রদীপে বোধ করি জল ছিল।'[৬২]

নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্পেও প্রতীকধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'টিকিট' গল্পে শীতাংশু ট্রামে টিকিট ফাঁকি দিতে পারাকে পৌরুষের কাজ বলে মনে করে, সেভাবে 'সেও অদূর ভবিষ্যতে পৌরুষের পরিচয় দিতে পারবে একদিন' - কিন্তু সে যে কতখানি কাপুরুষতার কাজ করল, নিজের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সেটা গল্পের শেষ বোঝা যায়।

অথবা 'রস' গল্পে খেজুর গাছ কাটার কৌশল সম্পর্কে বলেছেন যে - 'কাটতেও হবে আবার হাত বুলাতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের।' এই বিশেষ কৌশল মোতালেফ শুধু গাছের ক্ষেত্রেই না - মাজু খাতুনের মনের ওপরেও প্রয়োগ করে।

এই তিন শিল্পী একই সময়ের মানুষ হলেও তাদের শিল্প ভাবনা বা শিল্প সৃষ্টি ছিল ভিন্নপথগামী তিনটি পৃথক নদীর স্রোতের মতো। নরেন্দ্রনাথ তার সময়ে ছিলেন জনপ্রিয় লেখক আবার সমান ভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমার পাঠক মহলে ছিলেন সমালোচনার দ্বারা সমৃর্ধিত। পরবর্তী সময়ের কষ্টি পাথরে এই দুজনের রচনা যাচাই হয়ে খাঁটি সোনার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১. কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরানো কথা - রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শব্দ পত্র, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

২. প্রণয় পত্রাবলী - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - সংকলন ও সম্পাদনা - প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শারদীয় দেশ, ১৪০৩

৩. নদী ও নারী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পৃ.১

৪. সামনে চামেলি - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পৃ.২৮৫

৫. জল - গল্প সংগ্রহ - কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পৃ.৪১

৬. মল্লিকাবাহার - তদেব, পৃ.৬৬

৭. পালঙ্ক - গল্পমালা - ১ম - নরেন্দ্রনাথ মিত্র পৃ.২৪১

৮. ফেরিওয়ালা - তদেব পৃ.

৯. কমলবাবু - সত্যজিৎ রায় - কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি - সম্পাদনা সুব্রত রুদ্র, পৃ.১৪৬, ১৯৮২

১০. রাক্ষসী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী,

১১. বন্ধুপত্নী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক - নিতাই বসু পৃ.৮৫

১২. অবতরণিকা - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - গল্পমালা পৃ.১২২

১৩. মল্লিকাবাহার - কমলকুমার, গল্পসমগ্র - সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৬৬

১৪. রস : আনিস্ জামান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদক সাদ কামালী, আবহমান ভাষা, পঞ্চম সংখ্যা ১৩৯৯, পৃ.৩১

১৫. রস : একটি অনির্বাপিত আগুনের গল্প - কবিতা চক্র, সাহিত্য সংস্কৃতি। সম্পাদক - সঞ্জীবকুমার বসু, পৃ.১৭৯

১৬. জল - কমলকুমার মজুমদার, গল্পসংগ্রহ, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৪৩

১৭. হিমির সাইকেল শেখা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাছাই গল্প, পৃ.৫২

১৮. বাদামতলার প্রতিভা - তদেব, পৃ.১৪৫

১৯. ওয়াং ও ও খেলা ঘরে আমরা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দেশপত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮০

২০. বনের রাজা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক - নিতাই বসু, পৃ.৭৬

২১. তদেব, পৃ.৭৭

২২. তদেব

২৩. গাছ - তদেব, পৃ.৫৯

২৪. তদেব

২৫. শাল - নরেন্দ্রনাথ মিত্র

২৬. মাছ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাছাই গল্প, সম্পাদক - সুব্রতরুদ্র - অজয় দাশগুপ্ত

২৭. টিকিট - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ১ম, পৃ.১১৯

২৮. দ্বাদশমূর্তিকা - কমলকুমার মজুমদার, গল্পসমগ্র - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

২৯. ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৫৯, পৃ.১৪

৩০. শ্রীপুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের তথ্যপঞ্জী পৃ.৪১

৩১. সাক্ষাৎকার লোথার লুৎসে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প - সম্পাদনা - সুব্রত রাহা, অজয় দাস

৩২. তদেব

৩৩. গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সুমিতা চক্রবর্তী - কলেজ স্ট্রীট, ১৯৯৪, পৃ.৫৩

৩৪. ইন্টিকুটুম - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাছাই গল্প, সম্পাদক - সুব্রত রাহা, অজয় দাশগুপ্ত

৩৫. তদেব

৩৬. মঙ্গলগ্রহ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক নিতাই বসু
পৃ.১৮২

৩৭. রস - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ১ম

৩৮. গাছ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক নিতাই বসু, পৃ.১৯৯

৩৯. গিরগিটি - তদেব, পৃ.১০৪

৪০. কাব্য বীজ ও কমলকুমার মজুমদার - বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ১৯৮৫

৪১. কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার - বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত - ১৯৮৫, পৃ.২৫৮-৫৯

৪২. ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায় - পৃ.১২৮

৪৩. মল্লিকাবাহার - গল্প সমগ্র - কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ.৫৭-৫৮

৪৪. জ্বালা - নির্বাচিত গল্প - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সম্পাদক - নিতাই বসু, পৃ.২৭৬-৭৮

৪৫. রস - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ১ম, পৃ.৩৬

৪৬. তদেব

৪৭. তাহাদের কথা গল্প সমগ্র - কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ.৮৩

৪৮. কয়েদখানা - তদেব, পৃ.১৬৯

৪৯. ধূপকাঠি - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪র্থ পৃ.৩১৫

৫০. তদেব, পৃ.৩২০

৫১. কয়েদখানা, গল্পসমগ্র, কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
পৃ.

৫২. তদেব

৫৩. সবুজ মানুষের জন্ম - তপোব্রত ঘোষ, ভাঙা কাঁচের শিল্প, পৃ.১২৮
সম্পাদক - অর্জুন রায়।

৫৪. সোহাগিনী - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ৩য়, পৃ.৩১০

৫৫. রস - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ১ম, পৃ.৭১

৫৬. কয়েদখানা, গল্পসমগ্র - কমলকুমার মজুমদার, সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৫৭. কালের পুতুলিকা - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ.১২

৫৮. চন্দ্রমল্লিকা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পৃ.২৩১

৫৯. তাদের কথা - গল্প সমগ্র কমলকুমার মজুমদার, সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ.১৮

৬০. তদেব

৬১. তদেব

৬২. তদেব

গ্রন্থপঞ্জী

ক. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - কল্লোল যুগ, ১৩৭২, এম.সি সরকার এ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - কল্লোল যুগ, ৩য় সং ১৯৫৩, কলকাতা

৩. অচ্যুত গোস্বামী - বাংলা উপন্যাসের ধারা, ভাদ্র ১৩৬৪ নতুন সাহিত্য ভবন কলকাতা

৪. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য - নরেন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৪, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

৫. আদিত্য মুখোপাধ্যায় - তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ, ১৯৯৩, পাণ্ডুলিপি, ১৬ শ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

৬. অমলেন্দু সেনগুপ্ত - উত্তাল চল্লিশ - অসমাপ্ত বিপ্লব, ১৯৮৯, পাল পাবলিশার্স কলিকাতা - ৭০০০০৬

৭. অম্লান দত্ত : শতাব্দীর প্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক বিকাশ, কলকাতা ১৯৮৮

৮. অমিয়ভূষণ মজুমদার - শ্রেষ্ঠ গল্প ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩

৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় - কালের প্রতিমা, ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় - কালের পুতুলিকা, ১৯৯৫, দে'জ পাবলিসিং কলিকাতা

১১. অশুকুমার সিকদার - আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ১৯৯৩, অরুণা প্রকাশনী কলকাতা

১২. অসিত সিংহ - বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার পরিবর্তন, ১৯৮৩, গ্রন্থমেলা কলকাতা

১৩. কমলকুমার মজুমদার - গোলাপসুন্দরী, ১৩৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯

১৪. কমলকুমার মজুমদার - সুহাসিনী পয়েটম, ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯

১৫. কো. আন্তোনভা, গ্রি.বোন্‌গার্দ - লেভিন, গ্রি.কতোভ্‌স্কি - ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৯৮৮, প্রগতি প্রকাশন - মস্কো

১৬. ক্ষেত্র গুপ্ত - রবীন্দ্র গল্প অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, ২য় সং ১৯৯১

১৭. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী - দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, ১৯৮৬, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

১৮. জীবনানন্দ দাস - জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৫৬, নাভানা

১৯. জীবনানন্দ দাস - জীবনানন্দ দাশের কাব্য গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড

২০. জগদীশ ভট্টাচার্য - আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ১৯৯৪, ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট কলকাতা - ৭৩

২১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - আজ কোথায় যাবেন ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স

২২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - গল্প পঞ্চাশৎ, ১৯৬৩, মুকুন্দ পাবলিশার্স, ৮৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৪

২৩. দেবাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় - রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও চারজন বিদেশী ছোটগল্প লেখক, অনন্য প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রিট, কলি : ৭৩

২৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - বাংলা গল্প, বিচিত্রা, কলকাতা ১৯৫৭

২৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - সাহিত্যে ছোটগল্প, কলকাতা ৩য় সং, ১৯৬২

২৬. নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় - ছোটগল্পের সীমারেখা, ফাল্গুন ১৩৭৬ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

২৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - রচনাবলী ১১ দশ খণ্ড, ১৩৯৪, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

২৮. নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বাংলা ছোটগল্প, কলকাতা, ১৯৫০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

২৯. নিতাই বসু (সম্পাদনা) - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩

৩০. নিতাই বসু - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প ১৯৯১, প্রত্যয় প্রকাশনী

৩১. প্রেমেন্দ্র মিত্র - নির্বাচিতা ১৩৯৫, এম.সি.সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমি: ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

৩২. প্রমথনাথ বিশী - রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, কলিকাতা ১৯৫৪

৩৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় - অন্তর্বয়ন, কথাসাহিত্য, একুশে ১৯৯০

৩৪. প্রলয় সেন (ভাষান্তর) - কাফকার শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৯৯৫, নাথ ব্রাদার্স। ৯ শ্যামাচরণ দে স্টীট। কলকাতা ৭০০০৭৩

৩৫. বিষ্ণু দে - বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৫৫, নাভানা-৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

৩৬. বীরেন্দ্র দত্ত - বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, শ্রাবণ ১৩৯২, রত্নাবলী

৩৭. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত - কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার, নবার্ক, ১৯৮৫ ডি.সি. ৯।৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৫৯

৩৮. বেলাল চৌধুরী (সম্পাদনা) - লঙ্গরখানা, ১৯৯৪, পুনশ্চ, ৯ এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

৩৯. ভাস্বতী লাহিড়ী - সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোট গল্প, ১৩৯৮, শরৎ পাবলিশিং, হাউস ৯।৪, টেমার লেন, কলি: ৭০০০০৯

৪০. ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ১৯৮৯, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী-স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

৪১. মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত - স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য - নবযুগ প্রকাশ, ১৯৮৯

৪২. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - ভেদবিভেদ (সম্পাদনা), ১৯৯২, দে'জ পাবলিসিং, কলকাতা ৭০০০৭৩

৪৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - সুনির্বাচিত গল্প, ১৯৯২, জ্ঞানোদয়, ১০।২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি: ৭০০০০৯

৪৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ, ১৯৮৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৪৫. রফিক কায়সার - কমল পুরাণ, প্যাপিরাস প্রেস, ঢাকা, ১৯৮০

৪৬. রমাপদ চৌধুরী - গল্প সমগ্র, ১৯৯০, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা ৯

৪৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - রূপকথা, বাংলা সাহিত্যের কথা, ১৯৪৬

৪৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা, ১লা আষাঢ় ১৩৬৩, উল্লেখ নেই

৪৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৯২, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩

৫০. শিশিরকুমার দাস - বাংলা ছোট গল্প ১৯৮৩, দে'জ পাবলিশিং

৫১. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - দাঙ্গার ইতিহাস, ১৪০১, মিত্রঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি : ৭০০০৭৩

৫২. শ্যামলী গুপ্ত ও কান্তি বিশ্বাস - নারী ও সমতা, ১৯৯৩, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

৫৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, আষাঢ়, ১৩৮৭
দে'জ পাবলিশিং

৫৪. সুধরঞ্জন রায় : ছোটগল্প, ১৯৩৫

৫৫. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদনা) - একশ বছরের সেরা গল্প, ১৪০১, মিত্র ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি : ৭৩

৫৬. সমীর ঘোষ - পঞ্চাশের মন্বন্তর, শিল্পে সাহিত্যে, ১৯৯৪, প্রতিক্ষণ,
পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

৫৭. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদনা) - জগদীশ গুপ্ত জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩,
পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ ৭০০০০৯

৫৮. সুব্রত রুদ্র (সম্পাদনা) - কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি, ১৯৮২, নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি : ৭০০০৭৩

৫৯. সুবোধ ঘোষ - সুবোধ ঘোষের গল্প সমগ্র ১, ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৬০. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - শিল্প সাহিত্য দেশকাল, ১৯৮১, দে'জ পাবলিশিং

৬১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমার মজুমদার গল্প সমগ্র, ১৯৯২, আনন্দ
পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯

৬২. সুব্রত রাহা, জয় দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প
১৯৯৩, বিবেকভারতী ১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৬৩. সম্পাদক : সুবীর রায়চৌধুরী - জগদীশ গুপ্তর গল্প, ১৯৯১, দে'জ
পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩

৬৪. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদক) - দেশ, সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সংকলন, ১৯৮৭
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯

৬৫. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদনা) - দেশ, শারদীয় গল্প সংকলন, ১৯৯০, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা-৯

৬৬. সমরেশ বসু - সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৩৯৫, মডেল পাবলিশিং, হাউস ২- , শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

৬৭. সুব্রত রুদ্র - যমপুরীতে কবিতা, ১৩৯২, অরুণা প্রকাশনী - কলকাতা-৭০০০০৬

খ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ :

1. Bates, HE : The Modern Short Story, London, 1941.

2. Bates HE : The Modern Short Story, December 1941, Thomas Nelson and Sons Ltd.

3. Candy, H S : The Short Story in English, London, 1909.

4. Collins, A S : English Literature of the Twentieth Century; 'The short story'.

5. Forster, E M : Aspects of the Novel, May 1941, Edward Arnolds & Co. London.

গ. সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. অমল দাশগুপ্ত - প্রেমের গল্প ও মেজাজের গল্প, পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৬৭

২. অমরেন্দ্র চক্রবর্তী - কমলকুমারের মৃত্যু, যুগান্তর পত্রিকা ১০.২.৭১

৩. আলোক সরকার - কমলকুমারের মানুষ ও ভাষা, সমতট ১৯৭১

৪. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার - বাংলা ছোট গল্পের শতবর্ষ, 'দেশ'- ১৯৯১

৫. কবিতা চন্দ - রস : একটি অনির্বাপিত-গল্প - 'সাহিত্য সংস্কৃতি', ১৪০০

৬. কমলকুমার মজুমদার - লেখা বিষয়ক, জার্নাল সওয়, শারদ সংখ্যা ১৯৭৬

৭. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত -- নরেন্দ্রনাথ মিত্র : আনুসঙ্গিক ভাবনা, মাসিক, বাংলাশে, ৪র্থ বর্ষ সংখ্যা ১ম ও ১ম

৮. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - আমার সময় এবং আমার লেখালেখি, 'নতুন সময়', ১৯৮১

৯. দেবেশ রায় - তেইশ বছর আগে পরে, শব্দপত্র

১০. দিব্যেন্দু পালিত - দেহমনের বৈতালিক, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬

১১. ধীমান দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আদিক, সবজি, ১৯৮২

১২. নবনীতা দেবসনে - পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং অথবা সিদ্ধান্ত তান্ত্রিকের সাধনা, চতুরঙ্গ, ১৩৮৪

১৩. প্রশান্ত মাজী - 'চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিবিম্ব ১৯৭৯

১৪. ভগীরথ মিশ্র - ভাষার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্র হল ব্যথা, 'দ্যোতনা' ১৪০২

১৫. মিহির আচার্য - তিনশূন্য, মাসিক বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ১ম ও ১০ম

১৬. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত - কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরোন কথা - 'শব্দপত্র' - সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

১৭. শচীন দাস - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, - 'প্রমা' চতুর্থ বর্ষ

১৮. শোভনা মিত্র - আমার স্বামী নরেন্দ্রনাথ, আবহমান ভাজা, ১৩৯৯

১৯. সাবিত্রী নন্দ - বিশিষ্ট প্রকৃতি চেতনা : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'স্মারকপত্র' -বিশ্বভারতী, ১৯৯৩

২০. সমীর মুখোপাধ্যায় - নরেন্দ্র মিত্র, মাসিক বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ সংখ্যা ৯ম ও ১০ম

২১. সুব্রত চক্রবর্তী - শ্রীকমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২

২২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - বাংলা ছোট গল্প : তিন শিল্পী, 'দেশ'-১৯৯২

২৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় - গল্প নিয়ে 'দেশ' - ১৯৮৯

২৪. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - নীল রাত্রি ও বনের রাজা 'দেশ'-সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬

২৫. সুমিতা চক্রবর্তী - গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - কলেজ স্ট্রিট, নববর্ষ, রবীন্দ্র সংখ্যা ১৯৯৪

২৬. সুমিতা চক্রবর্তী - সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প, দেশ পত্রিকা ১৯৯৫

২৭. সুব্রত রুদ্র - দয়াময়ীর স্মৃতিতে কমলকুমার 'আজকাল', ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫

২৮. সত্যজিৎ রায় - 'কমলবাবু', সমতট, জুলাই - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

২৯. সন্তোষকুমার ঘোষ - যৌথ যাওয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা - ১০.২.৭৯

৩০. হরপ্রসাদ মিত্র - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প - 'সাহিত্য সংস্কৃতি' ১৪০০

North B... University
...y
Raja R... ...hanpur